বিল্‌স প্রেস ক্লিপিংস

বর্ষ-২৩ সংখ্যা-০৪ এপ্রিল ২০২০

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

বাড়ি- ২০ (চতুর্থ তলা), রোড- ১১(নতুন) ৩২ (পুরাতন), ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯

টেলিফোন: ৮৮-০২-৯১৪৩২৩৬, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৫৮১৫২৮১০, ই-মেইল:bils@citech.net, www.bilsbd.org

সূচী :	পৃষ্ঠাঃ
কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা	০৩ - ০৪
কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন	০৫ - ০৬
আন্দোলন ও ধর্মঘট	০৭ - ৩০
শোভন কাজ	৩১ - ১৬৬
শ্রম বাজার	১৬৭- ২৮৭

প্রথম আলো
আপডেট: ০৮ এপ্রিল ২০২০,

থামতে বলতেই চালকের উল্টো টান, নারী পোশাককর্মী নিহত

ঢাকার সাভারে ব্যাটারি চালিত রিকশা করে আরও দুই সহকর্মীর সঙ্গে কারখানার দিকে যাচ্ছিলেন এক নারী পোশাককর্মী। পথে চালককে সাদা পোশাকের তিন ব্যক্তি থামতে সংকেত দেন। পরিবহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা থাকায় ভয়ে চালক না থেমে দ্রুত টান দিলে রিকশা থেকে সড়কে পড়ে যান ওই নারী কর্মী। সঙ্গে সঙ্গেই পেছনে থাকা একটি কাভার্ডভ্যানের চাপায় নিহত হন।আজ বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে গেন্ডা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।নিহত নারীর নাম মরিয়ম)৩৫(। তিনি স্থানীয় একটি পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন।সাভার থানার পুলিশ জানায়, একটি ব্যাটারিচালিত রিকশা করে তিন যাত্রী উলাইল এলাকায় একটি পোশাক কারখানায় যাচ্ছিলেন। রিকশাটি গেন্ডা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় সাভার উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ের সামনে পৌঁছনোর পর উল্টে যায়। এ সময় ঢাকার দিক থেকে আসা একটি কাভার্ডভ্যানের চাকায় পিষ্ট হয়ে মরিয়ম মারা যান। আহত হন আনিছুর রহমান নামে অপর এক যাত্রী এবং রিকশার চালক।ঘটনার বর্ণনা দিয়ে আনিছুর রহমান বলেন, রিকশাটিতে তাঁরা তিন যাত্রী ছিলেন। সবাই উলাইল এলাকার আল-মুসলিম গ্রুপে চাকরি করেন। বিকাশ অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য তাঁরা কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন। তাঁদের বহনকারী রিকশাটি গেন্ডা বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছালে সাদা পোশাকে তিন ব্যক্তি থামানোর জন্য সংকেত দেন। তাঁদের হাতে লাঠি ছিল। ভয়ে চালক রিকশা নিয়ে রাস্তার অপর পাশে যাওয়ার চেষ্টা করলে বাহনটি উল্টে যায়। এ সময় মরিয়ম সড়কের ওপর পড়ে গেলে পেছন থেকে আসা কাভার্ডভ্যানটি তাঁকে চাপা দিয়ে চলে যায়।ঘটনাস্থলে কর্তব্যরত সাভার থানার উপ-পরিদর্শক) এসআই (পাভেল মোল্লা বলেন, কাভার্ডভ্যানের চাকায় পিষ্ট হয়ে মরিয়ম ঘটনাস্থলেই মারা যান। রিকশাচালক গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

NEWAGE

Apr 21,2020

Lorry driver killed, three injured in Tangail road accident

Our Correspondent . Tangail | A lorry driver was killed and three others were injured in a road accident in Gulla area on Dhaka-Tangail-Bangabandhu Highway in Tangail early Tuesday.The deceased was Md Hossain Ali, 32, of Thakurgaon.Md Shafiqul Islam, senior station officer of Tangail Fire Service and Civil Defence, said that the accident took place when the Thakurgaon-bound goods-laden lorry collided with another stationary lorry in the area leaving the driver of one lorry dead on the spot and three others injured.Injured are — the driver's assistant Faruk, one Faruk Hossain and Jannatul. They were admitted to 250-bedded Tangail General Hospital while the body was kept at the morgue, he said.

দৈনিক ইত্তেফাক

২৪ এপ্রিল ২০২০

বঙ্গবন্ধু সেতুর ওপর বিকল ট্রাক সরাতে গিয়ে উদ্ধারকর্মী নিহত

ভূঞাপুর (টাঙ্গাইল) সংবাদদাতা : বঙ্গবন্ধু সেতুর ওপর একটি বিকল ট্রাক সরাতে গিয়ে অপর ট্রাকের ধাক্কায় সেতুর উদ্ধারকর্মী নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে সেতুর ৩০ নং পিলারের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আব্দুল কাদের (৩৫) ভূঞাপুর উপজেলার গাবসারা ইউনিয়নের চন্ডিপুর গ্রামের আইয়ুব আলীর ছেলে। তিনি বঙ্গবন্ধু সেতুর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান চায়না কমিউনিকেশন এন্ড কন্ট্রাকশন কোম্পানির (সিসিসিসি) পেট্রোল ও রেকার গাড়ির উদ্ধারকর্মী হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ বঙ্গবন্ধু সেতুর সাইট অফিসের সহকারি প্রকৌশলী এহসানুল কবির পাভেল বলেন, রাত দেড়টার দিকে সেতুর ওপর বিকল হওয়া ট্রাকটি সরাতে গিয়ে অপর একটি মিনি ট্রাকের ধাক্কায় তিনি গুরতর আহত হন। পরে দ্রুত উদ্ধার করে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। ঘটনাটি রাতে হওয়ায় ট্রাকটি আটক করা যায়নি। তবে ট্রাকটি শনাক্তের চেষ্টা করা হচ্ছে।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন
২২ এপ্রিল, ২০২০

বগুড়ায় গৃহকর্মী ফরিদপুরে শ্রমিক ধর্ষণের শিকার

প্রতিদিন ডেস্ক : বগুড়ায় গৃহকর্মী এবং ফরিদপুরে এক পোশাক শ্রমিক ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধির খবর- বগুড়ার আদমদীঘিতে গৃহকর্মীকে ধর্ষণের অভিযোগে বাড়ির মালিক আনছার আলী গ্রেফতার হয়েছেন। সোমবার রাতে নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ জানায়, বগুড়ার জামিলনগরের আনছার আলীর বাসায় ৩৫ বছর বয়সী এক নারী তিন মাস ধরে কাজ করতেন। গত ১৬ এপ্রিল ওই নারী বাসায় কাজ করতে এলে বাসায় স্ত্রী না থাকার সুযোগে তাকে ধর্ষণ করেন আনছার। এ ঘটনায় গত সোমবার বিকালে ভুক্তভোগী আদমদীঘি থানায় মামলা করেন। আদমদীঘি থানার ওসি জানান, ভিকটিমকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে এবং আসামিকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। এদিকে গোপালগঞ্জে গার্মেন্ট কর্মী ধর্ষণের শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় খায়রুল ইসলাম নামে এক ইজিবাইক চালককে আটক করেছে পুলিশ। জানা যায়, ওই গার্মেন্ট কর্মী গাজীপুর থেকে খুলনা যাওয়ার পথে সোমবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে গোপালগঞ্জ পুলিশ লাইনসের কাছে পৌঁছান। রাত হয়ে যাওয়ায় যানবাহন না থাকায় তিনি একা সেখানে বসে থাকেন। তখন খায়রুল তাকে সকালে ইজিবাইকে খুলনায় পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে রাতে তার বাড়িতে মা-বোনের কাছে থাকার প্রস্তাব দেয়। মেয়েটি ইজিবাইক চালকের সঙ্গে রওনা হন। পথে ফাঁকা জায়গায় তাকে ধর্ষণ করে।

প্রথম আলো
২১ এপ্রিল ২০২০

‘হাসপাতালের ডিউটি ছাড়ো, নইলে এলাকা’

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে কর্মরত এক নার্সকে দায়িত্ব পালনের জন্য হাসপাতালে যেতে বাধা দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ওই নার্সের প্রতিবেশীরা বাড়ির ফটকে ধাক্কাধাক্কি করে ও উচ্চ স্বরে কথা বলে শাসিয়ে গেছেন।

এ ঘটনায় আতঙ্কিত ওই নার্স বিষয়টি হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) তাপস কুমার সরকারকে জানিয়েছেন। এই কর্মকর্তা প্রথম আলোকে বলেন, অভিযোগের বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে।

ভুক্তভোগী কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের সিনিয়র স্টাফ নার্স। তাঁর বাবার বাড়ি কুষ্টিয়া শহরের বটতৈল এলাকায়। স্বামীর বাড়ি মেহেরপুরে। তাঁর এক বছরের সন্তান আছে। স্বামী চাকরির কারণে অন্য জেলায় থাকায় তিনি বাবার বাড়িতে থেকেই হাসপাতালে কাজ করেন।

ওই নার্সের ভাষ্য, গতকাল সোমবার বেলা দুইটার দিকে প্রতিবেশী বেশ কয়েকজন নারী-পুরুষ বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে শাসিয়ে যান। এ সময় তাঁরা ফটকে ধাক্কা দেন। তাঁরা বলতে থাকেন, ‘করোনার সময়ে হাসপাতালে যাওয়া যাবে না। হাসপাতালে গেলে এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হবে। এলাকায় থাকতে হলে হাসপাতালে যাওয়া যাবে না।’ হাসপাতালে ডিউটি করলে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারেন—এমন ধারণায় তাঁরা তাঁকে এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বলেন বলে ওই নার্স অভিযোগ করেন।

ওই নার্স বলেন, প্রতিবেশীদের বোঝানোর চেষ্টা করেন যে তিনি হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডে দায়িত্ব পালন করেন। করোনাভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে আসা রোগীদের হাসপাতালের সামনে একটি ভবনে চিকিৎসা দেওয়া হয়। সরাসরি করোনা রোগীদের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। তারপরও বিষয়টি প্রতিবেশীরা মানতে নারাজ।
জানতে চাইলে কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মোস্তফা বলেন, বিষয়টি তিনি শুনেছেন। এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ওই নার্সকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দেওয়া হবে। চিকিৎসক-নার্স নির্বিঘ্নে চলাফেরা করবেন। কেউ কোনোভাবে বাধা দিতে পারবে না।

যুগান্তর

যুগান্তর রিপোর্ট ০৮ এপ্রিল ২০২০

করোনাভাইরাস :সংকট কাটিয়ে উঠতে গার্মেন্ট ও বস্ত্র খাতে ৯ দাবি

করোনাভাইরাসের এই নজিরবিহীন সংকটকাল কাটিয়ে উঠতে ও টিকে থাকতে হলে পুরো বিশ্বের জন্য দায়িত্বশীল ব্যবসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।বিশেষ করে বৈশ্বিক বস্ত্র ও পোশাক সাপ্লাই চেইনের ব্রান্ড কোম্পানি, খুচরা বিক্রেতা এবং ব্যবসায়ীদের দায়িত্বশীল ক্রয় কার্যক্রমে লাখ লাখ শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার ও তাদের পরিবারের জীবন-জীবিকায় ব্যাপক প্রভাব পড়বে।কাজেই বৈশ্বিক ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য শ্রম অধিকার, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও টেকসই সাপ্লাই চেইনের প্রতি প্রতিশ্রুতি ধরে রাখা ও সম্মান দেখানোর উপযুক্ত সময় এটিই।সেসব বিষয় মাথায় রেখে ছয়টি উৎপাদক ও রফতানি দেশের)সাসটেনেবল টেক্সাইল অব এশিয়ান রিজন (স্টার নেটওয়ার্কের ৯টি বস্ত্র ও পোশাক ব্যবসায়ী সমিতি বৈশ্বিক ব্রান্ড কোম্পানি, খুচরা বিক্রেতা ও ব্যবসায়ীদের কাছে বেশ কয়েকটি দাবি উত্থাপন করে একটি যৌথ বিবৃতি দিয়েছে।বুধবারের বিবৃতিতে ৯টি দাবির কথা বলা হয়েছে। যেগুলো হচ্ছে,১ .গুরুত্বপূর্ণ ক্রয় সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় সাপ্লাই চেইনের শ্রমিক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ওপর সব সম্ভাব্য প্রভাব সচেতনভাবে বিবেচনা করতে হবে।২ .ক্রয় চুক্তির শর্তাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন, এতে যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে, তা পূর্ণভাবে মেনে চলা এবং মূল্য ও পারিশ্রমিক পরিশোধের শর্ত নিয়ে নতুন করে আলোচনা না করা।৩ .সরবরাহ ও চালান গ্রহণ এবং উৎপাদিত ও উৎপাদনে থাকা পণ্যের ওপর চুক্তি অনুসারে অর্থ পরিশোধ করতে হবে। উৎপাদনে থাকা পণ্যের অর্ডার বাতিল করা যাবে না।৪ .উৎপাদন ও ডেলিভারি বাতিল কিংবা বন্ধ রাখতে হলে সরবরাহকারীদের)১০০ %এফওবি (ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কিংবা সরবরাহকারীদের শ্রমিকদের সরাসরি মজুরির প্রস্তাব দিতে হবে।৫ .ডেলিভারি ও চালানের ক্ষেত্রে বিলম্বের জন্য সরবরাহকারীরা দায়ী হবেন না এবং এ ধরনের বিলম্বের জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ দাবি করা যাবে না।৬ .অতিরিক্ত খরচ, তাড়াহুড়ো করে অর্ডার কিংবা অপ্রয়োজনীয় পরিদর্শন ও নিরীক্ষার মাধ্যমে সরবরাহকারীদের ওপর কোনো অতিরিক্ত চাপ দেয়া যাবে না।৭ . স্থানীয় পরিস্থিতি ও পরিপ্রেক্ষিত ভালো করে বোঝাপড়ার জন্য স্থানীয় অংশীদারদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকতে হবে এবং সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে।৮ .মতবিরোধের ক্ষেত্রে

পারস্পরিক গ্রহণযোগ্য সমাধান নিশ্চিত করতে সহযোগিতাপূর্ণ নিষ্পত্তি ও সংলাপের আশ্রয় নিতে হবে।

৯ .সাপ্লাই চেইনের ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব ব্যবসায়ী অংশিদারদের সমর্থন দিতে হবে এবং অব্যাহত ব্যবসা চালিয়ে যেতে, সাপ্লাই চেইন ঐক্য ও সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য দীর্ঘমেয়াদী কৌশল গ্রহণ করতে হবে।

স্টার নেটওয়ার্কের ৯টি বস্ত্র ও পোশাক ব্যবসায়ী সমিতি হল, বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতি)বিজেএমইএ(, বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন)বিকেএমইএ(, চায়না ন্যাশনাল টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেল কাউন্সিল)সিএনটিএসি(, গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন ইন কম্বোডিয়া)জিএমএসি(, মিয়ানমার গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন)এমজিএমএ (ও পাকিস্তান হোশিয়ারি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন)পিএইচএমএ(, পাকিস্তান টেক্সটাইল এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন)পিটিইএ(, টাওয়েল ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন অব পাকিস্তান)টিএমএ (ও ভিয়েতনাম টেক্সাইল অ্যান্ড গার্মেন্ট অ্যাসোসিয়েশন) ভিটাস(।

কালের কণ্ঠ

৯ এপ্রিল, ২০২০

মানবিক বিপর্যয়ে তাঁরা অমানবিক
দুঃসময়েও পোশাক কারখানায় কর্মী ছাঁটাইয়ের হিড়িক

টিইউসির দাবি ১০ দিনে ১৫ হাজার শ্রমিক ছাঁটাই

নিজস্ব প্রতিবেদক

পোশাক কারখানার মালিকরা গত ১০ থেকে ১২ দিনে প্রায় ১৫ হাজারের বেশি কর্মী ছাঁটাই করেছেন বলে অভিযোগ করেছে গার্মেন্ট শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র (জিটিইউসি)। সংগঠনটি বলছে, সরকারের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ ও পোশাক খাতের সংগঠনগুলোর শীর্ষ পর্যায় থেকে বারবার শ্রমিক ছাঁটাই না করার আহ্বান জানানো হলেও কারখানার মালিকরা তা মোটেও আমলে নিচ্ছেন না। বরং করোনাভাইরাস সংক্রমণ ঠেকাতে সরকারের দেওয়া সাধারণ ছুটির মধ্যে তৈরি পোশাক কারখানাগুলো শ্রমিক ছাঁটাই অব্যাহত রেখেছে। এমনকি ছাঁটাইয়ের সময় অধিকাংশ কারখানা বকেয়া মজুরিও দিচ্ছে না।কলকারখানা প্রতিষ্ঠান ও পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডিআইএফই) এবং

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি এই সংকট মুহূর্তে কোনো শ্রমিক ছাঁটাই না করার আহ্বান জানিয়ে আসছেন। এর আগে করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে কোনো শ্রমিক ছাঁটাই করা হবে না বলে তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারকদের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএ সভাপতি ড. রুবানা হক বারবার গণমাধ্যমে আশ্বস্ত করেছেন। বাংলাদেশ অ্যামপ্লয়ার্স ফেডারেশন থেকেও ছাঁটাই না করার করার অনুরোধ জানানো হয়।বুধবার গার্মেন্ট শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক জলি তালুকদার কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘সাধারণ ছুটির সুযোগ নিয়ে গতকাল গাজীপুর ও হেমায়েতেপুরে কয়েকটি কারখানায় দুই হাজারের বেশি শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের (টিইউসি) তথ্য অনুসারে গত ১০ থেকে ১২ দিনে প্রায় ১৫ হাজার কর্মী ছাঁটাই হয়েছে।’ এই শ্রমিক নেত্রী আরো বলেন, ‘পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে মালিকরা যে হারে শ্রমিক ছাঁটাই করছে এতে শ্রমিকরা মজুরি পাবেন কি না এই নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে।’ বাংলাদেশ জাতীয় গার্মেন্ট শ্রমিক কর্মচারী লীগের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম রনি বলেন, ‘গতকাল ১০টি কারখানা শ্রমিক ছাঁটাই করেছে। এর মধ্যে ব্যাবিলন ক্যাজুয়েল লিমিটেড এক হাজার ৫০০, ভব্স অ্যাপারেলস লিমিটেড ২০০, টর্গ ফ্যাশন ৪০০ ও স্প্যার্টান গার্মেন্টস ২১০ জন শ্রমিক ছাঁটাই করেছে। তবে এসব কারখানার বেশির ভাগ শ্রমিককে মজুরি দিয়ে আইডি কার্ড রেখে চলে যেতে বলে কারখানা কর্তৃপক্ষ।জানতে চাইলে বিজিএমইএ সভাপতি রুবানা হক কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘পোশাক কারখানার মালিকরা শ্রম আইন মেনে কারখানা লে অফ করতে পারে। এ ছাড়া প্রয়োজনে ন্যায্য মজুরি দিয়ে শ্রমিক ছাঁটাই করতে পারে। তবে আমরা অনুরোধ করেছিলাম, এমন মানবিক বিপর্যয়ের সময় যেন কোনো কর্মী এই মুহূর্তে ছাঁটাই করা না হয়। বর্তমানে প্রায় সব কারখানা বন্ধ। ৪০টি কারখানায় কাজ চলছে, যারা ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম তৈরি করছে।’

প্রথম আলো

১০ এপ্রিল ২০২০

চা-বাগান বন্ধ না করায় ১০ মিনিটের প্রতিবাদ কর্মসূচি

করোনাভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে অফিস-আদালত সবই এখন বন্ধ। তবে ছুটি নেই চা-বাগানের কর্মীদের। তাই কাল শনিবার সকালে ‘১০ মিনিটের প্রতিবাদ’ কর্মসূচি দিয়েছে চা-শ্রমিক ইউনিয়ন। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রামভজন কৈরি বৃহস্পতিবার বিকেলে এ কথা জানিয়েছেন। আজ শুক্রবার এ কর্মসূচি পালনের কথা ছিল। কিন্তু পবিত্র শবে বরাতের কারণে বিভিন্ন বাগান আজ বন্ধ। তাই তারিখ পিছিয়ে শনিবার নির্ধারণ করা হয়।

শ্রমিক ইউনিয়ন সূত্রে জানা গেছে, সারা দেশের

বিভিন্ন স্থানে ১৬৬টি চা-বাগান রয়েছে। এসব বাগানে শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় দেড় লাখ। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধে সরকার ২৬ মার্চ থেকে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করলেও চা-শিল্প এর আওতার বাইরে পড়ে যায়। অথচ বাগানের শ্রমিকেরা ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বাস করেন। ফলে তাঁদের ঝুঁকি বেশি। এ অবস্থায় বাগানে ছুটি ঘোষণার যৌক্তিকতা তুলে ধরে চা-শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে চা-বাগানের মালিকপক্ষের সংগঠন বাংলাদেশ চা-সংসদসহ (বিটিএ) বিভাগীয় শ্রম দপ্তরের কর্মকর্তাদের কাছে একাধিকবার চিঠি দেওয়া হয়। কিন্তু কোনো সাড়া মেলেনি। এর প্রতিবাদ জানাতে শনিবার সকালে কাজে যোগদানের আগে সব বাগানে অন্তত ১০ জন শ্রমিক ব্যানার নিয়ে একটি নির্ধারিত স্থানে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ১০ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকবেন।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রামভজন কৈরি মুঠোফোনে বলেন, ‘করোনার সংক্রমণ দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। আমরা খুবই শঙ্কার মধ্যে আছি। বাগানের শ্রমিকেরা দল বেঁধে কাজে যাচ্ছেন। চায়ের পাতা তুলছেন। বাগানগুলোতে করোনা সংক্রমিত হলে ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। সংশ্লিষ্ট সব জায়গায় ছুটির দাবি জানিয়ে চিঠি দিয়েছি। সবাই বলছে, সরকার নির্দেশ দিলে ছুটি ঘোষণা করা হবে। এ অবস্থায় বাধ্য হয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি আহ্বান করতে হয়েছে। ইতিমধ্যে মোবাইল ফোনে সব ভ্যালির (কয়েকটি চা-বাগান নিয়ে একটি ভ্যালি গঠিত) সভাপতি-সাধারণ সম্পাদককে কর্মসূচির কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।’

তবে বাংলাদেশ চা-সংসদের চেয়ারম্যান মো. শাহ আলম মুঠোফোনে বলেন, চা-বাগানে এখন পর্যন্ত কেউ করোনায় আক্রান্ত হননি। করোনার সংক্রমণ রোধে আগে থেকেই বাগানগুলোতে বহিরাগতদের প্রবেশ নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। শ্রমিকদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে বলা হয়েছে। তাঁদের মাস্ক-সাবান দেওয়া হয়েছে। সামাজিক দূরত্ব মেনে কাজ করতে বলা হয়েছে। শ্রমিকেরা তা মেনেও চলছেন। আর চায়ের ব্যবসা এমনিতেই খারাপ। ছুটি দিলে উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে। এর প্রভাব শ্রমিকদের ওপরও পড়বে। এ ছাড়া সরকারের পক্ষ থেকে চা-বাগানে ছুটি ঘোষণার কোনো নির্দেশনা নেই। এ ব্যাপারে সবার দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখা দরকার।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

প্রকাশ :১০ এপ্রিল, ২০২০

প্রবাসী শ্রমিকদের দরিদ্র পরিবারগুলোকে ত্রাণের আওতায় নেয়ার দাবি

বাংলাদেশে থাকা প্রবাসী শ্রমিকদের দরিদ্র পরিবারগুলোকে ত্রাণের আওতায় নেওয়ার দাবি জানিয়েছে প্রবাসী ক্লাব। ইউনিয়ন

পর্যায়ে ২০টি প্রবাসীর পরিবারকে সরকারি ত্রাণের জন্য অন্তর্ভুক্ত করতে দাবি জানানো হয়।

এক বিবৃতিতে তারা বলেন, প্রবাসীদের পরিবারগুলো রেমিটেন্সের ওপর নির্ভরশীল। করোনার কারণে পৃথিবীর কোথাও শ্রমিকরা কাজে যেতে পারছেনা। তাই দেশে টাকা পাঠাতেও পারছেনা। তারা বলেন, প্রবাসীদের মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো কঠিন সংকটের মধ্যে আছে। তাদেরকে করোনা মোকাবেলায় সহজ শর্তে বিনা সুদে ঋন দিতে দাবি জানায় প্রবাসী ক্লাব।
ইতালি, স্পেন, পর্তুগাল, সৌদি আরব, দুবাই, মালয়েশিয়াসহ অন্যান্য দেশে যেসব প্রবাসী শ্রমিক এবং ছাত্র খাদ্য সংকটে আছে, তাদেরকে দূতাবাসের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা দিতে দাবি জানানো হয়। তারা বলেন, স্থানীয়ভাবে কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তি প্রবাসী শ্রমিক এবং ছাত্রদের ত্রান দিলেও তা খুবই অপ্রতুল।

বিবৃতি দেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. নিয়াজ খান, সৌদি আরব প্রবাসী বীর মুক্তিযোদ্ধা হাসিব প্রামাণিক, অষ্ট্রেলিয়া প্রবাসী বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী খোন্দকার সালেক, পর্তুগাল প্রবাসী কমিউনিটি নেতা রানা তসলিম উদ্দীন, ফোবানার সাবেক সদস্য সচিব এম মাওলা দিলু, প্রবাসী ক্লাবের লিড কোঅর্ডিনেটর ওমর আলী প্রমুখ।

উল্লেখ্য, তিন বছর আগে প্রতিষ্ঠিত সোস্যাল মিডিয়া ভিত্তিক প্রবাসীদের শীর্ষ সংগঠন প্রবাসী ক্লাবে বিশ্বের ৪৩টি দেশে এবং ১০০টি শহরে সদস্য রয়েছে।

কালের কণ্ঠ

২২ এপ্রিল, ২০২০

প্রধানমন্ত্রীর কাছে কৃষক ও ক্ষেতমজুর সমিতির ১০ দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক : করোনা পরিস্থিতিতে কৃষক ও ক্ষেতমজুরের দুর্ভোগ লাঘবে ১০ দফা দাবি তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে বাংলাদেশ কৃষক সমিতি ও বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতি। আজ বুধবার ওই স্মারকলিপি দেওয়া হয় বলে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

কৃষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কাজী সাজ্জাদ জহির চন্দন ও ক্ষেতমজুর সমিতির সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন রেজা স্বাক্ষরিত ওই স্মারকলিপির অনুলিপি অর্থ, খাদ্য, কৃষি ও বাণিজ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হয়েছে।

স্মারকলিপিতে উল্লেখিত ১০ দফায় বলা হয়েছে, বোরো ধান কাটা, মাড়াই, নিরাপদে ঘরে তোলা, বাজারজাতসহ সার্বিক কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিতে হবে। ক্ষেতমজুরদের ধান কাটার জন্য ফসলের এলাকায় বিনাখরচে যাতায়াত, স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা ও থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্তসহ ১০ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্যবীমা নিশ্চিত করতে হবে। ক্ষেতমজুরসহ গ্রামীণ মজুর পরিবারগুলোকে সেনা সহায়তায় চিহ্নিত করে তাদেরকে রেশন কার্ডের মাধ্যমে ৩ মাস বিনামূল্যে খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করতে হবে। সকল ঋণ ও কিস্তি (মহাজনী, এনজিও, ব্যাংক ঋণ) মওকুফ করতে হবে। প্রতিটি ইউনিয়নে শস্য ক্রয়কেন্দ্র খুলে চলতি বোরো মৌসুমে ২০ লক্ষ টন ধান সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ও ১০ লক্ষ টন চাল চাতাল মালিকের মাধ্যমে সরকার নির্ধারিত দামে ক্রয় করতে হবে।

এতে আরো বলা হয়েছে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি সবজি চাষি, পোল্ট্রি, ডেইরি ও গবাদিপশু খামারিকে রক্ষায় জনপ্রতি দশ হাজার টাকা সরাসরি সহায়তা প্রদান ও দুই শতাংশ সরল সুদে ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। সবজি জাতীয় কৃষিপণ্য সরকারি উদ্যোগে বাজারজাত করার ব্যবস্থা করতে হবে। ত্রাণ-সাহায্য বিতরণে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণ বন্ধ এবং গ্রামাঞ্চলে কর্মরত সকল ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী, পরিবহণশ্রমিক ও ক্ষেতমজুরদের সুরক্ষায় মাস্ক, পিপিই ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছাড়া দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে পর্যায়ক্রমে ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি ক্রয়কেন্দ্র, খাদ্যগুদাম ও সবজিচাষ অধ্যুষিত অঞ্চলে হিমাগার নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

দাবি বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়ে স্মারকলিপিতে বলা হয়, দেশের বর্তমান সংকটকালে অর্থনীতিতে যে ধস নেমেছে, প্রধাণত কৃষি খাতকে রক্ষা করা ও তার পুনরুজ্জীবনের মধ্য দিয়েই তা থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব হতে পারে। তাই কৃষিকে আগামী দিনে দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করতে হবে। জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের জোগান দিতে ও অর্থনীতিতে গতি সৃষ্টি করতে কৃষি খাতকে প্রধান অবলম্বন করতে হবে। সেক্ষেত্রে দেশের মেহনতি কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের মূল অবদান রাখতে হবে। তাই, বর্তমানে কৃষি ও কৃষি-সংশ্লিষ্ট কৃষক-ক্ষেতমজুরদের স্বার্থ রক্ষার প্রতি নজর দেওয়া জরুরি।

যুগান্তর

২২ এপ্রিল ২০২০

৩ মাসের বেতন বাকি

ফরিদপুর চিনিকলে শ্রমিক কর্মচারীদের বিক্ষোভ

ফরিদপুর ও মধুখালী প্রতিনিধি: ৩ মাসের বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে মধুখালীর ফরিদপুর চিনিকলের ৮ শতাধিক শ্রমিক-কর্মচারী বিক্ষোভ করেছেন। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টায় প্রধান ফটকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। বিক্ষোভকারীরা জানান, ফরিদপুর চিনিকলে আখের মূল্যবাবদ চাষীদের ৮ কোটি টাকা পাওনা রয়েছে। স্থায়ী, মৌসুমি ও

দৈনিকভিত্তিতে কর্মরতদের বেতন-ভাতা বাবদ ৫ কোটি এবং অবসরপ্রাপ্তদের গ্র্যাচুইটি বাবদ ১৮ কোটি টাকা পাওনা রয়েছে।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শ্রমজীবী ইউনিয়নের সভাপতি শাহ হারুন অর রশিদ, সাধারণ সম্পাদক কাজল বসু, সহ-সভাপতি মনিরুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক মনিরুজ্জামান মিন্টু, সাবেক শ্রমিক নেতা আবুল বাশার বাদশা, শাহিন মিয়া প্রমুখ। তারা বলেন, ৩ মাস বেতন-ভাতা না পেয়ে শ্রমিক-কর্মচারীরা মানবেতর জীবনযাপন করছেন। তারা ধার-দেনা, দুশ্চিন্তা ও মানসিক চাপে দিশেহারা। অপরদিকে কষ্টে ফলানো আখ চিনিকলে বিক্রি করে টাকা না পেয়ে উৎসাহ হারাচ্ছেন চাষীরা। বক্তারা চিনিশিল্প রক্ষায় প্রধানমন্ত্রীর সদয় সহানুভূতি কামনা করেন। এ লক্ষ্যে মধুখালী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ফরিদপুরের জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান করেছে ফরিদপুর চিনিকল শ্রমজীবী ইউনিয়ন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোস্তফা মনোয়ার জানান, প্রাপ্ত স্মারকলিপি প্রধানমন্ত্রী বরাবরে পাঠানো হয়েছে। উল্লেখ্য, শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প কর্পোরেশনের আওতায় দেশের ১১টি চিনিকলে কর্মরতরা ৩ মাস বেতন পাচ্ছেন না। এর সংখ্যা ৩০ লাখ।

NEWAGE

00:20, Apr 21,2020

RMG workers stage demo for wages

Thousands of readymade garment workers of more than a dozen factories at Gazipur, Ashulia and Mymensingh on Monday demonstrated demanding their wages of March.Labour leaders said that more than 10 workers of Consist Apparels Ltd in Gazipur were injured as police charged baton on them during the demonstration.Our correspondent in Gazipur reported that several hundred workers of Consist Apparels Ltd on Monday gathered in front of the factory demanding their wages of March.At one stage, workers blocked Dhaka-Mymensingh highway and police tried to disperse them from the road. Industrial police officials said that workers of MH Fashions and Esco Woven Ltd in Gazipur on Monday took to the street demanding their dues.More than 200 workers of Madina Dyeing and Printing in Munshiganj on Monday stageddemonstration in front of the factory demanding their wages.According to the IP data wages of March remained outstanding in 320 RMG and textile factories and 171 of them registered with Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association.BGMEA, however, said that a total of 2153 factories out of 2274 members (who export directly) of the trade body paid wages as of Saturday while the payment remained under process in 121 units.

NEWAGE

Apr 20, 2020

Poor stage demo demanding relief in Barishal, Sirajganj

Poor people who lost their jobs during the ongoing shutdown for past three weeks due to spread of coronavirus infection staged demonstration in Barishal and Sirajganj on Sunday.New Age correspondent in Barishal reported that over one hundred poor people of Barishal city's ward no 1 took to the street in Paschim Kawnia area of Barishal city and began demonstration demanding relief at about 10:00am.

They had been demanding relief, either from the government or from any other quarter, as they lacked food in their homes and they were starving.

Kawnia police station officer-in-charge Zahid-Bin Alam said that the demonstrators left the spot as they assured them to provide with relief materials after consulting with their local elected representatives.

New Age correspondent in Sirajganj reported that several hundred poor people of Durgapur union under Ullapara in the district staged demonstration demanding relief and protesting against the local union parishad chairman's nepotism in distributing relief.

The protesters blocked Dhaka-Nagarbari highway at Balshabari point of Ullapara at about 11:00am to press home their demands.

Ullapara police station OC Dipok Kumar who went to the spot and said that the villagers demonstration might be an outcome of lack of the chairman's coordination in relief distribution and instigation of local Jamaat.

He said that the demonstrators left the place after assurance of getting relief.

UP chairman Afsar Ali blamed opposition Bangladesh Nationalist Party and Jamaat men for instigating people to stage demo.

কালের কণ্ঠ

২১ এপ্রিল, ২০২০

শ্রমিকদের জন্য রেশন চালুসহ তিন দফা দাবিতে মানববন্ধন

করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় শ্রমিকদের জন্য রেশন ব্যবস্থা চালুসহ তিনদফা দাবি জানিয়েছে গার্মেন্ট শ্রমিক ও শিল্প রক্ষা জাতীয় মঞ্চ। আজ মঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন ও সমাবেশ থেকে এই দাবি তুলে ধরে তা দ্রুত বাস্তবায়নের আহ্বান জানানো হয়।সমাবেশে সংগঠনের আহ্বায়ক শ্রমিকনেতা মো. আবুল হোসেন দাবিগুলো তুলে ধরে বলেন, করোনা দূর্যোগ পরিস্থিতিতে শিল্প-কারখানা বন্ধ ঘোষণা ও ছাটাই লে-অফ বন্ধ করতে হবে। সরকার ঘোষিত ব্যবস্থা অনুযায়ী শ্রমিকদের বকেয়া বেতনসহ এপ্রিল মাসের বেতন পরিশোধ করতে হবে। এই মুহূর্তে রেশনিং চালু ও বাড়ি ভাড়া আদায় স্থগিত করতে হবে।সমাবেশ থেকে গাজীপুরের বড়বাড়ী তারগাছ এলাকায় বকেয়া পাওনা পরিশোধ করার কথা বলে কনসিস্ট এ্যাপারেলস লিমিটেডের কারখানার শ্রমিকদের ডেকে এনে টাকা না দিয়ে উল্টো পুলিশের ব্যাপক লাঠিচার্জ ও টিয়ারশেল নিক্ষেপের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়।

কালের কণ্ঠ
২৪ এপ্রিল ২০২০

শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধের দাবি সিপিডির

নিজস্ব প্রতিবেদক : বাংলাদেশে নভেল করোনাভাইরাস সংক্রমণ হওয়ার পর কারখানা বন্ধ ও লোকসানের অজুহাতে পোশাক খাতে এখন পর্যন্ত ২৫ হাজার শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন শ্রমিক নেতারা।

গতকাল বৃহস্পতিবার বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত এক ভার্চুয়াল আলোচনায় শ্রমিক নেতারা আরো অভিযোগ করেন, পোশাক খাতে এখনো যেসব শ্রমিকের চাকরির মেয়াদ এক বছর হয়নি, তাঁদের মালিকদের পক্ষ থেকে ফোন করে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে। অনেক শ্রমিক এখনো মার্চ মাসের বেতন পাননি। তা ছাড়া অনেক কারখানার মালিক কারখানা লে অফ করতে যাচ্ছেন।

শ্রমিক নেতারা বলেছেন, বাংলাদেশে মোট রপ্তানির ৮৫ ভাগ আসে পোশাক খাত থেকে। বছরে তিন হাজার ৫০০ কোটি ডলার রপ্তানি করে পোশাক খাত। এই খাতে ৪০ লাখ শ্রমিক জড়িত।

সিপিডি গতকাল ভার্চুয়াল আলোচনাটি রানা প্লাজা ভবন ধসের সপ্তম বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজন করলেও সবার বক্তব্যে ক্ষোভ ঝরেছে করোনার সময়ে মালিকদের আচরণে। করোনার সংক্রমণ ঠেকাতে পুরো বাংলাদেশ যেখানে অবরুদ্ধ, সেখানে কিভাবে কার সিদ্ধান্তে শ্রমিকদের এত কষ্ট দিয়ে হেঁটে কারখানায় কাজে আনতে বাধ্য করা হলো, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করেছেন কেউ কেউ। রানা প্লাজা ভবন ধসের সাত বছর পেরিয়ে গেলেও অনেক নিহত ও আহত শ্রমিক প্রতিশ্রুত অর্থ পাননি বলেও অভিযোগ করেছেন শ্রমিক নেতারা। অবশ্য

আলোচনায় অংশ নিয়ে বিজিএমইএর একজন সহসভাপতি জানিয়েছেন, কারখানার মধ্যে শ্রমিকদের পূর্ণ স্বাস্থ্য সুরক্ষা দেওয়ার মতো সক্ষমতা আছে। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করেই কারখানা খোলা হবে বলে জানান তিনি।

সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুনের সঞ্চালনায় আলোচনায় অংশ নিয়ে সম্মিলিত গার্মেন্ট শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি নাজমা আক্তার বলেন, সারা দেশে সাধারণ ছুটির মধ্যেও কারখানার মালিকরা শ্রমিকদের কারখানায় নিয়ে আসতে বাধ্য আচরণ করার আহ্বান জানান তিনি।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

২৬ এপ্রিল, ২০২০

বেতনের দাবিতে গাজীপুরে ফের শ্রমিকদের বিক্ষোভ অবরোধ

গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরে লকডাউনের মধ্যেও গতকাল দিনভর বিক্ষোভ করেছেন পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। বেতন-ভাতা পরিশোধের দাবিতে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা এ সময় ঢাকা-টাঙ্গাইল ও ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। এতে সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের ইন্সপেক্টর রেজাউল করিম, কারখানা শ্রমিক ও স্থানীয়রা জানান, কালিয়াকৈরের বাড়ইপাড়ার হেচং বিডি লিমিটেড পোশাক কারখানাটি নভেম্বর মাসে লে-অফের ঘোষণা দিয়ে বন্ধ করে দেয় কর্তৃপক্ষ। তখন অক্টোবর ও নভেম্বর মাসের বেতন-ভাতাসহ শ্রমিক-কর্মচারীদের পাওনাদি পরিশোধ করেনি। কয়েকদিন আগে কারখানাটি ২৫ এপ্রিল চালু এবং আগামী ৭ মে শ্রমিক-কর্মচারীদের পাওনাদি পরিশোধের তারিখ ঘোষণা করে গেটে নোটিস টানিয়ে দেয় কর্তৃপক্ষ। এর পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল সকাল থেকে শ্রমিকরা কারখানার সামনে জড়ো হয়ে অবস্থান নিতে থাকেন। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ অবস্থানের পরও কারখানায় মালিক পক্ষের কাউকে না পেয়ে এবং কারখানার গেট খুলে না দেওয়ায় শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় তারা তাদের দুই মাসের বকেয়াসহ পাওনাদি পরিশোধ এবং কারখানা চালুর দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করেন। একপর্যায়ে শ্রমিকরা কারখানার পার্শ্ববর্তী ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে অবস্থান নেয় এবং সড়ক অবরোধ করেন। এতে মহাসড়কের উভয় দিকে যানবাহন আটকা পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মালিক পক্ষের সঙ্গে আলোচনার আশ্বাস দিয়ে মহাসড়কের ওপর থেকে অবরোধকারীদের সরিয়ে নেয়। পরে শ্রমিকরা কারখানার গেটে গিয়ে অবস্থান নেয়। এ সময় পুলিশ আলোচনার জন্য মালিক পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য দীর্ঘক্ষণ চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। একপর্যায়ে রবিবার সকালে আবারও কারাখানার গেটে অবস্থান নেওয়ার ঘোষণা দিয়ে বিকালে শ্রমিকরা কারখানা এলাকা ত্যাগ করে।

এদিকে জেলার শ্রীপুর উপজেলার জৈনাবাজারে এটিএস সোয়েটার কারখানার শ্রমিকরা বকেয়া বেতন-ভাতাসহ তাদের পাওনার দাবিতে সকাল থেকে গেটে জড়ো হতে থাকেন। দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পরও কর্তৃপক্ষের সাড়া না পেয়ে শ্রমিকেরা বিক্ষোভ শুরু করেন। শ্রমিকেরা একপর্যায়ে কারখানার পার্শ্ববর্তী ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে গিয়ে অবস্থান নেয় এবং সড়ক অবরোধ করেন। এতে মহাসড়কের উভয় দিকে যানবাহন আটকে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অবরোধকারীদের ধাওয়া করে। এ সময় পুলিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে শ্রমিকদের পাওনাদি পরিশোধের আশ্বাস দিলে অবরোধ প্রত্যাহার করে কারখানার সামনে গিয়ে অবস্থান নেয়। পরে পুলিশের মধ্যস্থতায় কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শ্রমিক প্রতিনিধিদের বৈঠক হয়। বৈঠক শেষে মালিক পক্ষ আগামী ৭ মে শ্রমিকদের মার্চ মাসের বেতনসহ পাওনাদি পরিশোধের ঘোষণা দিলে বিকালে শ্রমিকরা তাদের আন্দোলন কর্মসূচি স্থগিত করে এলাকা ত্যাগ করে।এ ছাড়াও একইদিন একই উপজেলার টেংরা কেওয়া বাজারের জামান ফ্যাশন পোশাক কারখানার শ্রমিকরা তাদের বেতন-ভাতা পরিশোধের দাবিতে গেটে বিক্ষোভ করেছেন। বিক্ষোভের মুখে কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের বেতন-ভাতা শিগগিরই পরিশোধের আশ্বাস দিলে তারা কারখানা এলাকা ত্যাগ করেন।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুশান্ত সরকার জানান, কয়েকদিন ধরে করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ঘোষিত লকডাউন ভেঙে কিছু কারখানার শ্রমিক বিভিন্ন দাবিতে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করে আসছে। গতকালও কয়েকটি কারখানার শ্রমিক বিক্ষোভ করেছেন। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশের উদ্যোগে ইতিমধ্যে বেশ কিছু কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের পাওনাদি পরিশোধের ব্যবস্থা নিয়েছে। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে গাজীপুরের বেশিরভাগ কারখানা ছুটি ঘোষণা করে উৎপাদন বন্ধ রেখেছে কর্তৃপক্ষ। তবে জরুরি সেবার জন্য কিছু কারখানা খোলা রয়েছে। গত ১১ এপ্রিল গাজীপুর জেলাকে লকডাউন (অবরুদ্ধ) ঘোষণা করা হয়েছে।

কালের কণ্ঠ

২৭ এপ্রিল, ২০২০

কুলাউড়ার কালিটি চা-বাগান
জেলা প্রশাসকের হস্তক্ষেপে শ্রমিক অসন্তোষের অবসান

কুলাউড়া (মৌলভীবাজার) প্রতিনিধি : মৌলভীবাজারের কুলাউড়ার কালিটি চা বাগানের দীর্ঘদিনের অচলাবস্থা ও ১২ সপ্তাহের বকেয়া মজুরিসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত শ্রমিকদের সকল বকেয়া পরিশোধ করার জন্য বাগান মালিককে কঠোর হুঁশিয়ারী প্রদান করেছেন জেলা প্রশাসন। বকেয়া মজুরী না পাওয়ায় অনাহারে-অর্ধাহারে থেকে একের পর এক

আন্দোলন ও বিক্ষোভ করে আসছিল বাগানের সাড়ে পাঁচশত শ্রমিক। অবশেষে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন মৌলভীবাজারের জেলা প্রশাসক নাজিয়া শিরীন। তাঁর হস্তক্ষেপে শ্রমিক অসন্তোষ ও অচলাবস্থা নিরসন হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।বৃহস্পতিবার কুলাউড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে জেলা প্রশাসক নাজিয়া শিরীনের সভাপতিত্বে এক জরুরী বৈঠক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, দ্রুততম সময়ের মধ্যে শ্রমিকদের সম্পূর্ণ বকেয়া মজুরীসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানে বাগান মালিক কর্তৃপক্ষ যেন কার্যত উদ্যোগ গ্রহণ করে। অন্যথায় জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে বাগান পরিচালিত হবে। বকেয়া পরিশোধ না করলে বাগান মালিক বাগানে প্রবেশ করতে পারবে না, প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে বাগান থেকে চা-পাতা উত্তোলন করে তা বিক্রি করে শ্রমিকদের বকেয়া মজুরী প্রদান করা হবে। বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মৌলভীবাজার জেলা পুলিশ সুপার ফারুক আহমেদ পিপিএম (বার), কুলাউড়া উপজেলা চেয়ারম্যান এ কে এম সফি আহমদ সলমান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এ টি এম ফরহাদ চৌধুরী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কুলাউড়া সার্কেল) সাদেক কাওসার দস্তগীর, এনএসআই'র উপ-পরিচালক মো. আবু আব্দুল্লাহ, কুলাউড়া থানার অফিসার ইনচার্জ মো. ইয়ারদৌস হাসান, শ্রম অধিদপ্তরের উপপরিচালক নাহিদুল ইসলাম, কল কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উপ মহাপরিদর্শক মোহাম্মদ মাহবুবুল হাসান, বিটিইএস'র সহ-সভাপতি মো. দেলোয়ার হোসেন কর্মধা ইউপি চেয়ারম্যান এম এ রহমান আতিক, কালিটি চা বাগানের এমডি কয়ছর আহমদ, কালিটি চা বাগানের ব্যবস্থাপক প্রণব কান্তি দেব, চা শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সম্পাদক রামভুজন কৈরি, কর্মধা ইউপি সদস্য লছমী নারায়ণ, কালিটি চা বাগানের পঞ্চায়েত সভাপতি শম্ভু দাস, সম্পাদক উত্তম কুমার প্রমুখ।

বৈঠকে পর জেলা প্রশাসনের নির্দেশে ও উপজেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে চা-বাগান থেকে কয়েকদিন থেকে চা-পাতা উত্তোলন হচ্ছে। এবং এই চা-পাতা বিক্রি করে শ্রমিকদের মজুরী প্রদান করা হচ্ছে। রবিবার উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে বাগান ব্যবস্থাকসহ শ্রমিক নেতাদের উপস্থিতিতে সরাসরি উত্তোলনকৃত ২ হাজার কেজি চা-পাতার নিলাম ডাক হয়। এবং ১৮ টাকা কেজি দরে শ্রীমঙ্গলের ব্যবসায়ী বয়ান আলী এই পাতাগুলো ক্রয় করেন এবং তিনি অগ্রীম পাঁচ লক্ষ টাকা প্রদান করেন।

আরেকটি সূত্রে জানা যায়, বাংলাদেশ চা বোর্ড ২১ এপ্রিল কালিটি চা-বাগানে এমডি কয়ছর আহমেদ বরাবরে একটি নোটিশ প্রদান করেন। এতে বলা হয়, আগামী ৭দিনের মধ্যে শ্রমিকদের মজুরীসহ সব বকেয়া পরিশোধ করতে হবে। অন্যতায়, সরকারি বিধি মোতাবেক বাগানের লিজ বাতিল করা হবে বলে নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাগান শ্রমিক পঞ্চায়েত কমিটির সভাপতি শম্ভু চৌধুরী দাশ ও সম্পাদক উত্তম কালোয়ার বলেন, বাগানের শ্রমিকদের দুর্ভোগ ও কষ্টের কথা চিন্তা করে গুরুত্ব দিয়ে জেলা প্রশাসক মহোদয় যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাতে আমরা সকল শ্রমিকরা খুশি হয়েছি। এখন আশা করছি, তাঁর কঠোর হস্তক্ষেপে বাগানের সকল সমস্যার সমাধান হবে।

কালিটি চা- বাগানের ব্যবস্থাপক প্রণব কান্তি দেব জানান, প্রশাসনের নির্দেশে বর্তমানে বাগান থেকে চা-পাতা উত্তোলন হচ্ছে। এই চা-পাতা বিক্রি করে শ্রমিকদের বকেয়া মজুরী পরিশোধ করা হবে। কিছুটা হলেও শ্রমিকরা এখন ¯^স্তিতে আছে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার এ টি এম ফরহাদ চৌধুরী বলেন, বাগানের শ্রমিকদের কথা চিন্তা করে জেলা প্রশাসক নাজিয়া শিরীনের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সাড়ে পাঁচশত শ্রমিককে ত্রাণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। আরো দুশত জনকে ত্রাণ সহায়তা দেয়া হবে। একশত শ্রমিককে আউশ প্রণোদনা হিসেবে ধানের বীজ প্রদান করা হবে। তাছাড়া সমাজসেবা অধিদপ্তরের পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবন মান উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০০ শ্রমিককে ৫ হাজার টাকা করে প্রদান করা হবে। সর্বোপরি, ডিসি স্যারের কঠোর হস্তক্ষেপের কারণে শ্রমিকদের সৃষ্ট সমস্যার সমাধান হয়েছে।

এ বিষয়ে মৌলভীবাজারের জেলা প্রশাসক নাজিয়া শিরীন রবিবার বিকেলে মুঠোফোনে বলেন, কালিটি চা-বাগানের সৃষ্ট সমস্যার বিষয়টি আমরা অধিক গুরুত্ব দিয়ে সমাধান করেছি। বর্তমানে বাগান মালিকের কাছ থেকে আমরা বাগানটি বুঝে নিয়েছি। যতদিন পর্যন্ত মালিক শ্রমিকদের মজুরীসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার সমাধান না করবে ততদিন বাগান প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে। আমরা সব সময় শ্রমিকদের সাথে আছি। বর্তমান পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বাগান নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

প্রসঙ্গত, কালিটি চা-বাগানের শ্রমিকরা ১২ সপ্তাহের মজুরীসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার দাবিতে গত ১৫ এপ্রিল বকেয়া মজুরীর দাবিতে বাগানে ভূখা বিক্ষোভ মিছিল করে। এরপর ১৯ এপ্রিল বাগানের শ্রমিকরা আবারো বকেয়া মজুরীসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার দাবিতে সাড়ে সাত কিলোমিটার লং মার্চ করে ভূখা বিক্ষোভ মিছিল করে কুলাউড়া শহরে এসে এক ঘণ্টা প্রধান সড়ক অবরোধ করে। তাদের আন্দোলনের বিষয়টি বিভিন্ন গণমাধ্যমে আসে। চা-শ্রমিকদের বকেয়া মজুরীর দাবিতে ১৫১জন নাগরিক বিবৃতি দেন এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। কিন্তু তাদের এত আন্দোলন ও বিক্ষোভ কর্মসূচির পরও বাগানের মালিকপক্ষ সমস্যা সমাধানে কোনো কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। পরবর্তীতে মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসক নাজিয়া শিরীন কুলাউড়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান একেএম সফি আহমদ সলমান ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে বাগানের সৃষ্ট সমস্যার খবর জানতে পেরে নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

সমকাল

২৭ এপ্রিল ২০২০

ঘাটাইলে ত্রাণ না পেয়ে সড়ক অবরোধ

ঘাটাইল (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি: টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে করোনাভাইরাসের প্রভাবে কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষেরা ত্রাণ না পেয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন।

সোমবার সকালে উপজেলার পোড়াবাড়িতে প্রায় দেড় ঘণ্টা টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ সড়ক অবরোধ

করে তারা বিক্ষোভ করেন। পরে ইউএনও, উপজেলা চেয়ারম্যান এবং ইউপি চেয়ারম্যানের আশ্বাসে তারা অবরোধ তুলে নেন।

বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ করেন, সরকারি খাদ্য সহায়তা তারা এখনো পাননি। ঘরে খাবার নেই, সন্তানরা না খেয়ে রয়েছে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ কেউ খোঁজ নেননি।

খবর পেয়ে ইউএনও অঞ্জন কুমার সরকার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বিক্ষোভকারীদের শান্ত করেন। তিনি দ্রুততম সময়ে খাদ্য সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দিলে বিক্ষোভকারীরা সড়ক অবরোধ তুলে নেন।

ইউএনও অঞ্জন কুমার সরকার বলেন, তাদের নাম ঠিকানা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং আরও কেউ বাকি থাকলে তাদের নামের তালিকা করে উপজেলায় পাঠাতে বলা হয়েছে। তাদের ঘরে দ্রুত ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৭ এপ্রিল, ২০২০

ঝুঁকিতে কৃষি বিভাগের মাঠকর্মীরা, ব্যক্তিগত সুরক্ষা দাবি

ফুলবাড়ী (দিনাজপুর) সংবাদদাতা : '**বোরো ধান কিনতে কৃষক তালিকা তৈরি, আউশ ধানের প্রণোদনায় কৃষক তালিকা তৈরি, কৃষি কার্ড হালনাগাদ, ফসলের বালাই দমন, আম, কাঁঠাল, লিচুর ফলনে কৃষককে পরামর্শ দেওয়া, ইউনিয়নে ট্যাগ অফিসারের দায়িত্ব পালন- এমন আরো কত কিছু করতে হচ্ছে আমাদেরকে। কিন্তু করোনা পরিস্থিতিতে আমাদের কোনো ব্যক্তিগত সুরক্ষা নেই।**'

কথাগুলো বলছিলেন দিনাজপুরের ফুলবাড়ী উপজেলার উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা শ্রী মুক্তি চন্দ্র বিশ্বাস। তিনি জানান, এ বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত পার্সোনাল প্রটেকশন ইকুপমেন্ট (পিপিই) বা অন্য কোনো সুরক্ষা সামগ্রী পাওয়া যায়নি। এ কারণে ঝুঁকি নিয়েই কৃষকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে, মাঠে থেকে তাদের কাজ করতে হচ্ছে।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা এটিএম হামীম আশরাফ মাঠপর্যায়ে কাজ থাকায় ঝুঁকি রয়েছে বলে স্বীকার করেছেন। গতকাল সোমবার (২৭ এপ্রিল) সকালে কথা হলে ইত্তেফাকের এ সংবাদদাতাকে তিনি বলেন, 'এখন পর্যন্ত ব্যক্তিগত সুরক্ষার কোনো সরঞ্জাম সরকারিভাবে বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সাধারণ ছুটিকালীন ১৮টি মন্ত্রণালয়ের বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের যেসব অফিস সীমিত পরিসরে খোলা রাখার কথা বলা হয়েছে এর মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের নাম রয়েছে তিন নম্বরে। গত ২৩ এপ্রিল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব কাজী

মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে ওইসব মন্ত্রণালয়ের অফিস সীমিত পরিসরে খোলা রাখতে অনুরোধ করা হয়।

সংশ্লিষ্টরা জানান, কৃষি বিভাগে কর্মরতদের বর্তমান পরিস্থিতিতে অফিসে উপস্থিত থাকার পাশাপাশি মাঠপর্যায়ে কাজ করতে হচ্ছে। লকডাউনের মধ্যেই বোরো ধান কাটতে আগ্রহী শ্রমিক সংগ্রহ করে তাঁদের নাম-ঠিকানার তালিকা তৈরি, ধান কেনার জন্য কৃষক তালিকা প্রণয়ন, কৃষকের মাঝে সার ও বীজ বিতরণ, কৃত্রিম সংকট যেন সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে নিয়মিত মাঠ পরিদর্শনসহ বিভিন্ন ধরনের কাজে ব্যস্ত সময় পার করতে হচ্ছে সরাসরি মাঠ পর্যায়ে থেকে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আব্দুস সালাম চৌধুরী বলেন, কৃষি বিভাগের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের ঝুঁকিমুক্ত রাখতে এবং তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রী প্রদানের জন্য দ্রুত উদ্যোগ নেওয়া হবে।

উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আতাউর রহমান মিল্টন বলেন, এলাকার জাতীয় সংসদ সদস্য, সাবেক মন্ত্রী এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার মহোদয়ের সাথে আলোচনা করে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের মাঝে দ্রুত সুরক্ষা সামগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

প্রথম আলো

২৭ এপ্রিল ২০২০

গাজীপুরে বকেয়া বেতন ও কারখানা খোলার দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

প্রতিনিধি, গাজীপুর: গাজীপুরের ভোগড়া এলাকায় লে অফ করা কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ করে শ্রমিকরা। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৯টায়। ছবি: মাসুদ রানাগাজীপুর সিটি করপোরেশনের ভোগড়া এলাকায় বকেয়া বেতন ও লে-অফ থাকা কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে আজ সোমবার সকালে শ্রমিকেরা বিক্ষোভ করে। এ সময়ে উত্তেজিত শ্রমিকেরা তিনটি মোটরসাইকেল ও আটটি বাইসাইকেলে অগ্নিসংযোগ করে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে। পরে শিল্প পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

শিল্প পুলিশ ও শ্রমিকরা জানায়, ভোগড়া এলাকার স্টাইলিস গার্মেন্টস কারখানা কর্তৃপক্ষ এক মাস আগে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত কারখানা লে-অফ ঘোষণা করে বিজ্ঞপ্তি দেয়। লে-অফ করার আগে ৩০ জন শ্রমিকের বেতন এবং ৮০ জন স্টাফের ৬০ শতাংশ বেতন বকেয়া ছিল। দুইদিন ধরে ওই কারখানার শ্রমিকেরা বন্ধ করে দেওয়া কারখানাটি দ্রুত খুলে দেওয়া এবং শ্রমিক-স্টাফদের বকেয়া বেতনের দাবি জানিয়ে আসছিলেন।

দাবি পূরণ না হওয়ায় সোমবার সকাল সাড়ে আটটার দিকে কারখানার সমানে জড়ো হয় শ্রমিকেরা। পরে তাঁরা আশপাশে থাকা ভলমন্ট ফ্যাশন, ক্রাউন ফ্যাশন, টেকনো ফাইবার নামের চলমান কারখানার শ্রমিকদের কাজ না করার আহ্বান জানায়। একপর্যায়ে ওইসব কারখানায় ইটপাটকেল ছুঁড়তে থাকে। এ সময় শ্রমিকেরা ক্রাউন ফ্যাশন কারখানার সামনে মহাসড়কের পাশে পার্কিং করা তিনটি মোটরসাইকেল ও ৮টি বাইসাইকেলে অগ্নিসংযোগ করে। প্রথমে তাঁদের মহাসড়ক ছেড়ে যেতে অনুরোধ জানালোও তাঁরা সাড়া দেয়নি। পরে কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করলে মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

শ্রমিকদের আন্দোলনের কারণে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক সকাল সাড়ে ৮টা থেকে ১১টা পর্যন্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। যার কারণে দুই পাশেই মালবাহী যান ও ব্যক্তিগত গাড়ির জট লেগে যায়। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করলে বেলা ১১টার দিকে ফের যানবাহন চলাচল শুরু হয়।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুশান্ত সরকার জানান, কারখানায় কাজ না থাকায় লে-অফ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। এরপরও শ্রমিকেরা কারখনা খোলা ও কিছু শ্রমিকের বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ ও অগ্নিসংযোগ করে। খবর পেয়ে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

প্রথম আলো

২৭ এপ্রিল ২০২০

সাভারে কারখানা খোলা–বন্ধ নিয়ে ‘বিভ্রান্ত’ শ্রমিকেরা, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার: কারখানা বন্ধের ঘোষণার প্রতিবাদে ঢাকার সাভারের উলাইলে বিক্ষোভ করেন কেএল ডিজাইনের শ্রমিকেরা। আজ সোমবার সকালে। ছবি: অরূপ রায় মেটা:ঢাকার সাভার ও আশুলিয়ায় কয়েকটি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা আজ সোমবার সকালে বিক্ষোভ করেছেন। কোনো কারখানা খোলার দাবিতে শ্রমিকেরা বিক্ষোভ করেছেন, আবার কোনো কারখানা বন্ধ করার জন্য শ্রমিক বিক্ষোভ হয়েছে। শ্রমিকেরা কাজে যোগ না দিয়ে ফিরে যাওয়ায় কারখানা বন্ধ ঘোষণার খবরও পাওয়া গেছে।শিল্প পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ নতুন করে কয়েকটি কারখানায় কাজ শুরু হয়েছে এবং শ্রমিকদের অনীহার কারণে কয়েকটি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। কয়েকটি কারখানার শ্রমিকেরা বিক্ষোভ করেছেন। শিল্প পুলিশের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, সব কারখানা একসঙ্গে না খোলার কারণে চালু হওয়া কারখানার শ্রমিকেরা অনেকটা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছেন। তাঁরা (চালু হওয়া কারখানার শ্রমিক) মনে করেন, শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনা করে অধিকাংশ কারখানা বন্ধ রাখা হয়েছে। এ ছাড়া বন্ধ থাকা কারখানার শ্রমিকেরা ঘরে বসেই বেতন

পাবেন বলে ধারণা তাদের। আর তাদের কাজে এনে স্বাস্থ্যঝুঁকিতে ফেলা হচ্ছে। এ কারণে চালু হওয়া অনেক কারখানার শ্রমিকেরা কাজ করতে চাচ্ছেন না।

পুলিশ ও শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আজ সকালে কারখানা চালু হওয়ার পরপরই কাজ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন আশুলিয়ার নরসিংহপুরের শারমীন গ্রুপের শ্রমিকেরা। একপর্যায়ে শ্রমিকেরা কাজ না করে কারখানা থেকে বের হয়ে যান।

এই কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ইসমাইল হোসেন বলেন, বর্তমান অবস্থায় শ্রমিকদের নিরাপত্তার কথা ভেবে গত শনিবার কারখানা খোলার দিন দুই শিফট চালু করা হয়েছিল। অর্ধেক শ্রমিক সকাল ছয়টা থেকে বেলা দুইটা পর্যন্ত আর বাকি অর্ধেক শ্রমিক বেলা আড়াইটা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত কাজ করছিলেন। এতে শ্রমিকেরা ছয় ফুট দূরত্বে বসে কাজ করতে পারতেন। কিন্তু শ্রমিকেরা নানা অজুহাতে এক শিফট চালু করার দাবি জানান। তাঁদের দাবি অনুযায়ী আজ থেকে এক শিফট চালু করা হয়েছিল। এরপরও আজ সকালে শ্রমিকেরা কর্মস্থলে উপস্থিত হয়ে কারখানা থেকে বের হয়ে যান। পরে অবশ্য আলোচনার ভিত্তিতে তাঁরা কাজে ফিরতে সম্মত হয়েছেন।

একই এলাকার হা-মীম গ্রুপের শ্রমিকেরা আজ কর্মস্থলে উপস্থিত হয়ে বর্তমান অবস্থায় কাজ করতে অপরগতা প্রকাশ করেন। পরে কারখানাটি বন্ধ ঘোষণা করা হয়। কারখানার মূল ফটকে দেওয়া নোটিশে বলা হয়, আন্তর্জাতিক ক্রয় আদেশ বাতিল, শ্রমিকদের নিরাপত্তা আর স্বাস্থ্যঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনা করে কারখানা বন্ধ ঘোষণা করা হলো।অন্যদিকে জামগড়ার নেক্সট কালেকশন নামের একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরাও আজ সকালে কর্মস্থলে উপস্থিত হয়ে কাজ না করে কারখানা থেকে বের হয়ে গেছেন বলে জানা গেছে।আশুলিয়ার সিগমা ফ্যাশনসের ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকেরা আজ বেলা ১১টার দিকে কারখানার সামনে উপস্থিত হয়ে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। এ সময় তাঁরা ছাঁটাইয়ের আদেশ প্রত্যাহারের দাবি জানান।এদিকে সাভারের উলাইল এলাকার কে এল ডিজাইন অ্যাপারেলসের শ্রমিকেরা কারখানা খোলার দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন। গত রোববার থেকে কারখানাটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে আজ মূল ফটকে বন্ধের নোটিশ সাঁটিয়ে দেওয়া হয়েছে। নোটিশে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক ক্রয় আদেশ বাতিল হয়ে যাওয়ায় আগামী তিন মাস কারখানাটিতে কোনো কাজ থাকবে না। এ কারণে কারখানা বন্ধ ঘোষণা করা হলো।কে এল ডিজাইনের কয়েকজন শ্রমিক বলেন, আজ তাঁদের কারকানা চালু হওয়ার কথা ছিল। সেই অনুযায়ী কর্মস্থলে উপস্থিত হয়ে তাঁরা কারখানা বন্ধ দেখতে পান। বন্ধের বিষয়টি আগে জানানো হলে তাঁরা দূর থেকে ঝুঁকি নিয়ে সাভার বা কর্মস্থলে উপস্থিত হতেন না। এ কারণে তাঁরা কারখানা খোলার দাবি জানিয়েছেন।বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতির সভাপ্রধান তাসলিমা আখতার বলেন, মালিক ও বিজিএমইএর পক্ষ থেকে পোশাক কারখানা বন্ধ ও খোলার বিষয়ে একেক সময় একেক ঘোষণা ও সিদ্ধান্তে শ্রমিকেরা বিভ্রান্তিতে পড়ছেন।

The Daily Star

April 29, 2020

Hundreds block roads demanding food aid

Several hundreds of people yesterday blocked two highways in Jashore and Savar demanding food aid. They claimed that they had lost their sources of income since the countrywide shutdown imposed about a month ago, but no government officials or representatives were yet to give them a hand, leaving them to starve. Later, they withdrew the blockades after local administrations convinced them that relief materials would soon be distributed.In Jashore, hundreds took position at Bahadurpur Bazar point on Dhaka-Jashore highway around noon.On information, officials of armed forces, police and civil administration rushed to the spot and convinced them to leave the highway with an assurance of immediate relief distribution, said KM Abu, revenue deputy collector in the district.Later, they withdrew the blockade around 2:30pm, he said.In Savar, some 100 transport workers blocked the Dhaka-Aricha highway at Savar Police Station point around 10:00am demanding food assistance.They also demanded immediate withdrawal of the government's ban on vehicular movement.Many trucks and lorries got stranded on the highway due to the blockade.On information a team of police rushed to the spot and took the situation under control by promising them that they would receive assistance in no time, said Zakaria Hossen, inspector (operation) of Savar Model Police Station.Contacted, Savar municipality mayor Hazi Abdul Goni said he did not get sufficient amount of relief materials from the government, and therefore, it was not possible for him to entertain the demands of all workers in the area.

Our correspondents in Jashore and Savar contributed to this report.

কালের কণ্ঠ

২৯ এপ্রিল, ২০২০

করোনা হাসপাতালে সেবায় অসন্তুষ্ট কমিটির সদস্যরাই

তৌফিক মারুফ : করোনাভাইরাস মোকাবেলায় জরুরি ও অপরিহার্য হিসেবে প্রায় দুই ডজন গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ প্রস্তুত করেছে সরকার গঠিত স্বাস্থ্যবিষয়ক জাতীয় কমিটি। এই কমিটির অনেক সদস্যই করোনাভাইরাসে আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য প্রস্তুত করা বিশেষায়িত হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা নিয়ে সন্তুষ্ট নন। গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় কমিটির এক বৈঠকে হাসপাতাল পরিদর্শনকারী সদস্যরা বেশির ভাগই অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

এর আগে গত সোমবার রাজধানীর বড় তিনটি কভিড হাসপাতাল সরেজমিনে পরিদর্শন করে অনেক ধরনের ঘাটতি খুঁজে পান জাতীয় কমিটির আওতাধীন বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের উপকমিটির সদস্যরা। গতকাল মঙ্গলবার তাঁরা এসব সমস্যা সংবলিত প্রতিবেদন ও সুপারিশ পেশ করেন জাতীয় কমিটির কাছে।

- রোগীদের অনেক অভিযোগের সত্যতা পেলেন কমিটির সদস্যরা
- বড় সমস্যা নিচের দিকের সহায়ক কর্মী না থাকা
- করোনা হাসপাতাল ছেড়ে পালিয়েছেন আউটসোর্সিং কর্মীরা
- কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকে দুই ডজনেরও বেশি সুপারিশ

জাতীয় কমিটির সূত্র থেকে জানা যায়, গত সোমবার তাঁরা রাজধানীর কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল, কুয়েত বাংলাদেশ মৈত্রী হাসপাতাল ও মুগদা জেনারেল হাসপাতাল পরিদর্শন করেন তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে। তাঁরা এ সময় অবকাঠামোগত অবস্থা, যন্ত্রপাতি পরিস্থিতি, জনবল পরিস্থিতি, চিকিৎসক-নার্স ও অন্য কর্মচারীদের উপস্থিতি ও তাঁদের সংখ্যা পর্যবেক্ষণ করেন। একই সঙ্গে তাঁরা রোগীদের সঙ্গে কথা বলেন, তাদের সমস্যা জানতে চান এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও কথা বলেন।

এই কমিটির সদস্যরা জানান, কুয়েত মৈত্রী হাসপাতাল ও কুর্মিটোলা হাসপাতালে সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা গেছে নিচের পর্যায়ের কর্মচারীর শূন্যতা। বিশেষ করে চিকিৎসক-নার্স ও রোগীদের বিভিন্ন জরুরি প্রয়োজনে সহায়তা কর্মী নেই বললেই চলে। এমনকি আউটসোর্সিং ভিত্তিতে যাঁরা এত দিন এসব হাসপাতালে নিয়োজিত ছিলেন তাঁরা প্রায় সবাই পালিয়ে গেছেন। প্রায় একই অবস্থা মুগদা হাসপাতালেও।

এ ছাড়া অবকাঠামোগত সমস্যাও তাঁরা চিহ্নিত করেছেন। পেয়েছেন অক্সিজেনসহ আরো কিছু যন্ত্রপাতির ঘাটতি। সব কিছুই তাঁরা গতকাল জানিয়েছেন জাতীয় কমিটিকে। সেই সঙ্গে তাঁরা এসব সমস্যা সমাধানের সুপারিশ করেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক সদস্য জানান, রোগীদের কিছু অভিযোগের সত্যতা আছে। এগুলো কাটানো খুবই জরুরি। এ ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাসপাতাল শাখার মনিটরিংয়ের দুর্বলতা রয়েছে। এমনকি বাস্তব চিত্র ওপরের দিকে অনেকটা জানানো হয়নি বলেও হাসপাতাল প্রবাস পরিদর্শনকারী কোনো কোনো সদস্য মনে করছেন। এদিকে জাতীয় কমিটির আরেক সদস্য জানান, জাতীয় কমিটি দ্বিতীয় বৈঠকে এই কমিটির আওতায় পাঁচটি উপকমিটি গত কয়েক দিনে যে পর্যবেক্ষণ ও কার্যক্রম করেছে তার ভিত্তিতে দুই ডজনেরও বেশি সুপারিশ তুলে ধরে। এখন জাতীয় কমিটি এই সুপারিশগুলো আরেক দফা পর্যালোচনা করবে। পরে তা খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে সরকারের কাছে করোনাভাইরাস মোকাবেলায় সার্বিক বিষয়ে একটি চিত্র তুলে ধরবে। এখানে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে।

এদিকে হাসপাতাল পরিদর্শনসংক্রান্ত উপকমিটির চেয়ারম্যান ও স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ডাক্তার ইকবাল আর্সলান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা কী পেয়েছি না পেয়েছি তা এভাবে প্রকাশ করা ঠিক হবে না। আমরা আমাদের পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশমালা জাতীয় কমিটির কাছে উপস্থাপন করেছি। যা করার জাতীয় কমিটির সুপারিশের মাধ্যমে সরকার করবে।'

তবে হাসপাতাল পরিদর্শন করা আরেক সদস্য নাম প্রকাশ না করার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, করোনাভাইরাস আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় এখন পর্যন্ত ব্যবহৃত হাসপাতালগুলোতে সবচেয়ে বড় সমস্যা নিচের দিকের সহায়ক কর্মীদের। একরকম তা নেই বললেই চলে। যাঁদের সহায়তা ছাড়া রোগীদের খাদ্য, পথ্য কিংবা জরুরি উপকরণ আনা-নেওয়া চালানো যায় না। চিকিৎসকরাও অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের সহায়তা কর্মীর অভাবে অনেকটা নিরুপায় হয়ে পড়েন। অন্যদিকে কারিগরি জায়গায়ও যেসব ঘাটতি দেখা যাচ্ছে তাও কাটানো জরুরি হয়ে পড়েছে।

হাসপাতাল পরিদর্শন কমিটির আরেক সদস্য কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমাদের মনে হয়েছে শুধু এই তিনটি হাসপাতালে নয়, রোগীর সংখ্যা বেড়ে গেলে অন্য হাসপাতালগুলোতেও প্রায় একই ধরনের সংকট দেখা দেবে। তাই আমরা এই অভিজ্ঞতাগুলো কাজে লাগিয়ে অন্য হাসপাতালগুলো প্রস্তুত করার জন্য সুপারিশ করব।'

জাতীয় কমিটির আরেক সদস্য জানান, শুধু হাসপাতালে নয়, দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে করোনাভাইরাস মোকাবেলায় আরো কিছু সীমাবদ্ধতার কথা তাঁরা সরকারের কাছে সুপারিশ আকারে তুলে ধরার জন্য প্রায় দিন-রাত কাজ করছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৯ এপ্রিল, ২০২০

সাভারে বকেয়া বেতনের দাবীতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারের আশুলিয়ায় বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবীতে শ্রমিকরা বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ করেছে। বুধবার (২৯ এপ্রিল) ডিইপিজেড এর এ-ওয়ান বিডি লি: এবং জামগড়া এলাকার ওয়ার্ল্ড ওয়ান ডেনিম লিঃ পোশাক কারখানার শ্রমিকরা তাদের বেতন পরিশোধের দাবীতে এ কর্মসূচি পালন করে।

পুলিশ ও শ্রমিক সূত্রে জানা গেছে, আশুলিয়ার রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার (ডিইপিজেড) পুরাতন জোনের এ ওয়ান বিডি লিঃ পোশাক কারখানার ১১শ শ্রমিকের চলতি মাসসহ ৪ মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। একাধিকবার কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের বেতন প্রদানের আশ্বাস দিলেও বেতন পরিশোধ করা হয়নি। ফলে বেশ কিছুদিন ধরেই কারখানাটির শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবী জানিয়ে আসছে।

বুধবার সকাল থেকে ডিইপিজেডের প্রধান ফটকে অবস্থান নিয়ে নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়কে বিক্ষোভ মিছিল করতে থাকে শ্রমিকরা। একপর্যায়ে তাঁরা ডিইপিজেডের মহাব্যবস্থাপকের

কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়ে চলতি মাসসহ তাঁদের চার মাসের বকেয়া বেতন ও ভাতা পরিশোধের দাবি জানায়। পরে পুলিশ এসে শ্রমিকদের বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করার আশ^াস দিয়ে তাদের সরিয়ে দিলে তারা বাড়ী ফিরে যায়। অপরদিকে জামগড়া এলাকার ওয়ার্ল্ড ওয়ান ডেনিম লিমিটেড নামের একটি কারখানার শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবীতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে। সকালে কারখানার সামনে অবস্থান নিয়ে বেতনের দাবিতে শ্রমিকরা বিক্ষোভ করতে থাকেন। একপর্যায়ে তারা আবদুল্লাহপুর-বাইপাইল সড়ক অবরোধ করে। এ সময় ওই সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ধাওয়া দিয়ে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দিলে পুনরায় যানচলাচল শুরু হয়।ডিইপিজেডের মহাব্যবস্থাপক (জিএম) আব্দুস সোবাহান সাংবাদিকদের জানান, এ ওয়ান কারখানার শ্রমিকদের বকেয়া বেতন-ভাতা শীঘ্রই পরিশোধ করা হবে।

সমকাল
৩০ এপ্রিল ২০২০

ডাক্তার-নার্সদের মতো মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগের দাবি

সমকাল প্রতিবেদক: আউটসোর্সিং প্রক্রিয়া বাতিল করে ডাক্তার ও নার্সদের মতো টেকনোলজিস্টদের নিয়োগের দাবি জানানো হয়েছে। গতকাল বুধবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সামনে আয়োজিত মানববন্ধন কর্মসূচিতে মেডিকেল টেকনোলজিস্টরা এ দাবি জানান।

মেডিকেল টেকনোলজিস্ট সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দের দাবি, অবিলম্বে আউটসোর্সিং প্রক্রিয়া বাতিল করে মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের অ্যাডহক কিংবা সরাসরি নিয়োগ প্রদান করতে হবে। নানাভাবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আমাদের পাশ করিয়ে ১২ বছর ধরে বেকার করে রেখেছে।

এর আগে আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ৩৮৬ জন মেডিকেল টেকনোলজিষ্টকে নিয়োগের পরিপত্র প্রকাশ করেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। এর প্রতিবাদে প্রায় তিন শতাধিক বেকার ও পেশাজীবী মেডিকেল টেকনোলজিস্ট স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সামনে অবস্থান নিলে কর্মকর্তারা নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. ইউসুফ ফকির আউটসোর্সিং বাতিলের বিষয়ে সমর্থন জানিয়ে বিষয়টি সমাধানের আশ্বাস দেন।

আন্দোলনকারীরা জানান, দেশে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ার পর থেকে ভাইরাসটি শনাক্তে রোগীদের নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আসছেন সরকারি হাসপাতালে কর্মরত মেডিকেল টেকনোলজিস্টরা। প্রাথমিক পর্যায়ে স্বল্প পরিসরে করোনা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হলেও বর্তমানে রোগীর সংখ্যা এবং পরীক্ষা কেন্দ্র বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের দিয়ে সুষ্ঠুভাবে কাজ চালিয়ে নেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

তারা আরও জানান, রোগীদের পরীক্ষায় নিয়োজিত বেশ কয়েকজন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট করোনায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন এবং অনেকে কোয়ারেন্টাইনে আছেন। সরকারি পর্যায়ে কর্মরত সীমিত সংখ্যক টেকনোলজিস্ট দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

তাদের দাবি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী একজন চিকিৎসকের বিপরীতে পাঁচজন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট থাকার কথা। দেশে প্রায় ৭০ হাজার চিকিৎসকের বিপরীতে মেডিকেল টেকনোলজিস্টের পদ আছে সর্বসাকল্যে নয় হাজার। এর মধ্যেও বহু সংখ্যক পদ শূন্য রয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগ না হওয়ায় প্রায় ৩০ হাজার টেকনোলজিস্ট বেকার অবস্থায় দুর্বিষহ জীবনযাপন করছেন বলেও জানান তারা। জরুরি অবস্থা বিবেচনায় রাষ্ট্রপতির নির্দেশে সরকার যেভাবে চিকিৎসক ও নার্সদের নিয়োগ প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সে প্রক্রিয়া অনুসরণ করে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগের দাবি জানান তারা।

বিক্ষোভে মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের বিভিন্ন সংগঠন বিএমটিএ, স্বামেপ, এম-ট্যাব, বারিট, সম্মিলিত মেডিকেল টেকনোলজিস্ট পরিষদের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সমকাল

৩০ এপ্রিল ২০২০

সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ পরিবহন শ্রমিকদের

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধিগণপরিবহন চালু করার দাবিতে নারায়ণগঞ্জে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন পরিবহন শ্রমিকরা। গতকাল বুধবার সকাল ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত দুই ঘণ্টা সাইনবোর্ড এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন শতাধিক পরিবহন শ্রমিক। এ সময় বেশ কিছু পণ্যবাহী ট্রাক ও প্রাইভেটকার আটকে পড়ে যানজটের সৃষ্টি হয়। আটকা পড়ে নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনের সাংসদ সেলিম ওসমানের গাড়িও।

বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা জানান, লকডাউনের কারণে দীর্ঘদিন গণপরিবহন বন্ধ থাকায় তারা সবাই বেকার। তাদের ঘরে খাবার নেই, সরকারি সহায়তাও পাননি। তারা মানবেতর জীবনযাপন করছেন। এই পরিস্থিতিতে তারা বাধ্য হয়ে রাস্তায় নেমেছেন। তারা বলেন, হয় আমাদের ত্রাণ দিন, না হয় সড়ক খুলে দিন। গার্মেন্ট ও অন্যান্য শিল্পকারখানা খুলে দেওয়া হয়েছে। তাহলে গণপরিবহন চালু করা হবে না কেন?

দুপুর ১২টার দিকে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের শান্ত করে সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

The Daily Star

April 30, 2020

‘Where is our welfare fund?’

Lalmonirhat transport workers protest, claim they aren’t getting help

Star Online Report

Over one hundred transport workers formed a human chain in Lalmonirhat's bus stand area this noon demanding financial assistance from their welfare fund amid the Covid-19 pandemic.

They chanted "where is our welfare fund?" and demanded getting back the money they had been depositing for long.

The workers alleged that they were not getting any help in this crisis.

Around 8,000 transport workers and their families in Lalmonirhat have been passing days in hardship since bus services were suspended on March 26, the workers said.

"Usually, transport workers do not get any fixed salary. So we used to deposit a small portion of our money in a welfare fund for emergencies," Rony Islam, a transport worker in Lalmonirhat town, said.

"But during these hard times, we are not getting help," he added.

Asadaul Islam, another transport worker, said, "No one, not even the owners' association or the workers' union, have come forward to help us in this time of distress."

"BNP-backed transport workers formed the human chain," claimed Amirul Islam, president of Lalmonirhat District Bus-Minibus Workers' Union.

"We have already provided food assistance that includes five kg rice, one kg pulse and half litre edible oil to 250 workers," he said.

Bulbul Ahmed, general secretary of the organisation, claimed, "The deposited money in the welfare fund have been spent for the welfare of workers during different periods.

বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

এপ্রিল ০৬, ২০২০

রফতানিমুখী শিল্পের কর্মীদের মোবাইল অ্যাকাউন্ট খোলার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক: করোনাভাইরাস সংক্রমণ বিস্তার রোধে সচল রফতানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারীদের মোবাইল অ্যাকাউন্ট খোলার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। সরকার ঘোষিত আর্থিক প্রণোদনা এবং বেতন-ভাতাদি এই হিসাবে পৌঁছে দেয়া হবে।আজ সোমবার বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেম ডিপার্টমেন্ট থেকে এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। দেশে কার্যরত সব তফসিলি ব্যাংক এবং সব মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রোভাইডারের প্রধান নির্বাহীদের কাছে পাঠানো এ প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, চলতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে সচল রফতানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারীদের মোবাইল অ্যাকাউন্ট নিশ্চিত করতে হবে। যাতে করে এই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে বেতন ভাতা এবং সরকারি প্রণোদনা পরিশোধ করা যায়। এজন্য শ্রমিক অথবা কর্মচারীদের জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা জন্ম নিবন্ধন সনদের প্রয়োজন হবে। তবে এই হিসাব খোলার জন্য কোনো ধরনের চার্জ বা ফি কাটা হবে না। এই হিসাব খোলার জন্য উর্ধ্বতন পর্যায় থেকে গ্রাহকদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং উৎসাহিত করার জন্য প্রচারণাসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করারও নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

৭ এপ্রিল, ২০২০

কারখানা বন্ধ ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত, ১৬ তারিখের মধ্যেই মার্চের বেতন

করোনার প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত সরকারি-বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেছে সরকার। সরকারি ছুটির সঙ্গে সমন্বয় করে দেশের সব পোশাক কারখানা আগামী ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। এছাড়া শ্রমিক-কর্মচারীদের মার্চ মাসের বেতন আগামী ১৬ এপ্রিলের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। পোশাক মালিকদের বড় দুটি সংগঠন 'বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রফতানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ)' এবং বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ) এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সোমবার রাত্রে সংগঠন দুটির পক্ষ থেকে গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানানো হয়।

বিকেএমইএ-এর সভাপতি একেএম সেলিম ওসমান এবং বিজিএমইর সভাপতি ড. রুবানা হক এর যৌথ ঘোষণায় গণমাধ্যমকে বলা হয়েছে, মহামারী করোনাভাইরাসের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরকারের ছুটির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএর সদস্য প্রতিষ্ঠান সমূহ আগামী ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তবে রফতানিমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠান যাদের জরুরী রফতানি কার্যাদেশ রয়েছে এবং যেসব কারখানায় করোনার সরঞ্জামাদি, মাস্ক চিকিৎসকদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) এবং করোনা প্রতিরোধী সামগ্রী তৈরি করছে, এমন কারখানাগুলোকে তাদের শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে প্রয়োজনে খোলা রাখতে পারবে। এক্ষেত্রে নিজ নিজ অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ/বিকেএমইএ), কল কারখানা পরিদর্শন অধিদফতর এবং শিল্প পুলিশকে কারখানা খোলা রাখার বিষয়টি জানাতে হবে। এছাড়া ১৬ এপ্রিলের মধ্যে শ্রমিক-কর্মচারীদের মার্চ মাসের বেতন পরিশোধ করতে হবে।

সমকাল
০৪ এপ্রিল ২০২০

সব শ্রমিক মার্চ মাসের বেতন পাবেন: রুবানা হক

মার্চ মাসের বেতন নিয়ে পোশাক কারখানার শ্রমিকদের কোন শঙ্কার কারণ নেই জানিয়ে বিজিএমইএ সভাপতি রুবানা হক বলেছেন, সব শ্রমিকই তাদের মার্চ মাসের বেতন পাবেন।

শনিবার রাত সোয়া দশটায় এক অডিও বার্তায় রুবানা হক সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

অডিও বার্তায় বিজিএমইএ সভাপতি রুবানা হক সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় ১১ এপ্রিল পর্যন্ত কারখানা বন্ধ রাখার জন্য সকল মালিকদের প্রতি অনুরোধ জানান।

এছাড়া কারখানায় অনুপস্থিতির কারণে কোনো শ্রমিক চাকরি হারাবেন না বলেও আশ্বস্ত করেন তিনি।

সমকাল
০৪ এপ্রিল ২০২০

১১ এপ্রিল পর্যন্ত কারখানা বন্ধ রাখার অনুরোধ বিজিএমইএর

করোনাভাইরাসের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে ১১ এপ্রিল পর্যন্ত কারখানা বন্ধ রাখার জন্য মালিকদের প্রতি অনুরোধ করেছেন বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রফতানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সভাপতি ড. রুবানা হক।

শনিবার রাত সোয়া দশটায় সাংবাদিকদের কাছে পাঠানো এক অডিও বার্তায় ড. রুবানা হক এ অনুরোধ করেন।

কারখানায় অনুপস্থিতির কারণে কোনো শ্রমিক চাকরি হারাবে না বলেও আশ্বস্ত করেছেন ড. রুবানা হক।

এছাড়া গেল মার্চের বেতন নিয়ে শ্রমিকদের কোনো শঙ্কার কারণ নেই জানিয়ে রুবানা হক বলেন, সব শ্রমিকই তাদের মার্চ মাসের বেতন পাবেন।

এর আগে রাত দশটায় অপর বার্তায় বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, তৈরি পোশাকের বিদেশি ক্রেতা এবং ব্র্যান্ডগুলো যাতে রপ্তানি আদেশ বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে এ বিষয়ে জোরালোভাবে আলাপ-আলোচনা শুরু করবেন তিনি।

উল্লেখ্য, আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৪ মার্চ অর্থ্যাৎ শনিবার পর্যন্ত কারখানা বন্ধ ছিল। রোববার থেকে কারখানা খুলে দেওয়ার কথা। সেভাবে মালিকরাও প্রস্তুত হয়। শ্রমিকরাও কষ্ট করে ঢাকায় আসতে শুরু করেন। তবে এতে করোনার ঝুঁকি বৃদ্ধির শঙ্কা নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হয়।

দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ঢাকায় আসতে শ্রমিকদের অমানবিক কষ্টের কথাও তুলে ধরে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম।

বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

এপ্রিল ০৫, ২০২০

পোশাক শ্রমিকদের এপ্রিলের বেতন চলতি মাসেই : গভর্নর

পোশাক শ্রমিকদের চলতি মাসের বেতন আগামী ৩০ এপ্রিল দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির। তিনি বলেন, রফতানি খাতের শ্রমিকদের তিন মাসের বেতন-ভাতার জন্য যে পাঁচ হাজার কোটি টাকার তহবিল গঠন করা হয়েছে তার একটা নীতিমালা বাংলাদেশ ব্যাংক প্রণয়ন করেছে। এ তহবিল থেকে এপ্রিল, মে এবং জুন-এ তিন মাসের বেতন-ভাতা দেয়া হবে। আশা করছি, এপ্রিল মাসের শেষ তারিখেই এপ্রিল মাসের বেতন এ তহবিল থেকে দেয়া সম্ভব হবে।

আজ রবিবার গণভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে দেশের অর্থনীতির উপর বিরূপ প্রভাব উত্তরণের জন্য ৭২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকার আর্থিক প্রণোদনার প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর মধ্যে করোনাভাইরাসের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে রফতানিমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য পাঁচ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

করোনাভাইরাসের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে রফতানিমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠান তথা পোশাক শ্রমিকদের তিন মাসের বেতন-ভাতার পাঁচ হাজার কোটি টাকার তহবিলের সার্কুলার গত বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ জারি করেছে। আজ রবিবার প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শেষে গভর্নর ফজলে কবির পোশাক শ্রমিকদের বেতনের বিষয়ে এই তথ্য জানান।

ফজলে কবির বলেন, আমি মনে করি প্রধানমন্ত্রী যেসব প্যাকেজের ঘোষণা দিয়েছেন এগুলো বাস্তবায়ন করলে অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াবে। আমরা কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কাছাকাছি পৌঁছাতে পারবো।

তিনি বলেন, নভেল করোনা ভাইরাসের সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব উত্তরণে বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যাপ্ত তারল্যের জোগান স্বাভাবিক রাখাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। এই তারল্য অর্থনীতির বিভিন্ন খাত উপখাতে সুষ্ঠুভাবে সঞ্চালন নিশ্চিত করবে। বাংলাদেশ ব্যাংক বেশ কয়েকটি পুনঃঅর্থায়নের তহবিলের আকার বৃদ্ধি করেছে।

১ এপ্রিল থেকে তফসিলি ব্যাংকে ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও হার (সিআরআর) হ্রাস করে, সাপ্তাহিক গড় ভিত্তিতে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। আগে তা ৫ দশমিক ৫ শতাংশ ছিল। এর ফলে ব্যাংকসমূহ অতিরিক্ত ৬ হাজার ৫০০ কোটি টাকা তাদের হাতে জমা থাকবে। যা দিয়ে তারা তারল্য সংকট মেটাবে। ব্যাংকিং খাতে পর্যাপ্ত তারল্য নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুদ হার বার্ষিক শতকরা ৬ ভাগ থেকে ২৫ বেসিস পয়েন্ট কমিয়েছে। যার ফলে ব্যাংকের তারল্য জোগাড় করতে কম ব্যয় হবে।

প্রথম আলো

০৫ এপ্রিল ২০২০

‘আমরা শ্রমিক না মানুষ, বুঝতে পারি না’

দ্বিতীয় দফা ছুটি পেয়ে শ্রমিকেরা আবারও বাড়ি ফিরছেন। গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকায় খোলা ট্রাকে গাদাগাদি করে বাড়ি ফিরছেন তাঁরা। মাওনা চৌরাস্তা, শ্রীপুর, গাজীপুর, ৫ এপ্রিল।

ছবি: সাদিক মৃধা'করোনাভাইরাসের কারণে ছুটি হইল। টাকা নাই। বাড়িত চইলা গেলাম। চাকরি বাঁচাবার জন্য শনিবার চইলা আসলাম। আইসা শুনি আবার ছুটি। আগে জানাইলে কি হইতো? আসলে আমরা শ্রমিক না মানুষ, বুঝতে পারি না।'

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার একটি পোশাক কারখানার অপারেটর মুজিবুর রহমান মাওনা চৌরাস্তা এলাকায় গাড়ির জন্য অপেক্ষারত অবস্থায় এসব কথা আক্ষেপের সুরে বলেন। তিনি গতকাল শনিবার সারা দিন হেঁটে ও ভেঙে ভেঙে ছোট ছোট গাড়িতে করে শ্রীপুরে পৌঁছান। পরে আবারও ছুটি ঘোষণার পর আজ রোববার তাঁর স্ত্রী ও ৬ মাস বয়সী শিশুকে নিয়ে বাড়ি ফিরছেন।

সৌভাগ্যক্রমে একটি খোলা ট্রাকে আরও অন্তত ৩০ জনের সঙ্গে জায়গা পেয়েছেন শেরপুরের ঝিনাইগাতী উপজেলার দ্বীন ইসলাম। তিনি শ্রীপুরের গড়গড়িয়া মাস্টারবাড়ী এলাকার একটি পোশাক কারখানার কর্মী। তাঁর কোলে সাত-আট মাস বয়সী এক শিশু। নিজের ট্রাভেল ব্যাগ থেকে একটি গেঞ্জি বের করে শিশুর মাথায় দিয়ে তীব্র রোদ নিবারণের চেষ্টা করছিলেন তিনি। প্রথম আলোর এই প্রতিবেদককে তিনি বলেন, 'অনেক কষ্টে আছি ভাই। ভাইরাসের ভয়ের ভেতরেও বাড়িতে যাইতে হইতেছে। গাড়ি বন্ধ রাইখা আমগরে এখানে আনার দরকার ছিল? আবার আমগর উপরে এমন বিপদ চাপাইয়া দেওয়া হইলো।'

ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের মুলাইদ এলাকায় পিকআপের ২৫ যাত্রীকে নামিয়ে দিয়েছে পুলিশের একটি টহল দল। পরে তাঁরা হেঁটে ময়মনসিংহ অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। তাঁদের মধ্যে শরিফুল ইসলাম নামের একজন বলেন, 'কীভাবে যাব কিচ্ছু জানি না। গাড়ি থেকে নামায়া দিয়েছে পুলিশ। এ এলাকায় থাকলে খামু কী? হাতে টাকা তো নাই।'

করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকির মধ্যে গাদাগাদি করে ট্রাকে উঠলেন কেন—এমন প্রশ্নের উত্তরে রোজিনা পারভীন নামের এক পোশাকশ্রমিক বলেন, 'কী করমু, বাধ্য হইছি। আমরা পোশাকশ্রমিক। আমাদের জীবন এভাবেই চলে।'

টহল পুলিশের ভয়ে গড়গড়িয়া মাস্টারবাড়ী এলাকায় ট্রাকের পেছনে যাত্রীদের টেনেহিঁচড়ে দ্রুত তোলা হচ্ছে—এমন দৃশ্য দেখা যায়। আজ রোববার বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত গড়গড়িয়া মাস্টারবাড়ী বাসস্টেশন থেকেই অন্তত ১৫টি ট্রাক-পিকআপকে যাত্রী নিয়ে যেতে দেখা গেছে। এসব ট্রাক-পিকআপে সামাজিক দূরত্ব বলতে কিছুই ছিল না।

এসব বিষয়ে মাওনা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মঞ্জুরুল হক প্রথম আলোকে বলেন, 'সার্কেল এএসপির নেতৃত্বে ওসি মাওনা হাইওয়ে, ওসি নাওজোর ও ওসি ভরাডোবা অন্তত ৩০ জন পুলিশসহ ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ত্রিশালের বৈলর পর্যন্ত ঘুরে এসেছি। পথে যাদেরই খোলা ট্রাকে যেতে দেখেছি, তাদের সম্মানের সঙ্গে করোনাভাইরাস বিষয়ে সচেতন করেছি।' তিনি আরও বলেন, 'মাওনা হাইওয়ের অধীনে বিভিন্ন এলাকার মানুষকেও সচেতন করছি।'আরেক গার্মেন্টস মালিকীন বলছেন, তেনারা নাকি শ্রমিক পালেন!

প্রথম আলো

০৬ এপ্রিল ২০২০

৮ ইপিজেডে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত সাধারণ ছুটি

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধে দেশের আটটি ইপিজেড (রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা) সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে বেপজা। আগামীকাল ৬ এপ্রিল থেকে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত এসব ইপিজেডের সব শিল্পপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) আজ রোববার রাতে এ-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করে।চট্টগ্রাম, ঢাকা, ঈশ্বরদী, উত্তরা, মোংলা, কুমিল্লা, আদমজী ও কর্ণফুলী—এই আটটি ইপিজেডে ৪৭৪টি শিল্পকারখানায় ৫ লাখের বেশি শ্রমিক কাজ করেন।বেপজার মহাব্যবস্থাপক (ইএস) নাহিদ মুন্সী স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিশেষ বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট ইপিজেডের মহাব্যবস্থাপকের অনুমোদন সাপেক্ষে কোনো কারখানা জরুরি প্রয়োজনে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারবে। একই সঙ্গে সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের (কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার, পানি শোধনাগার, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র) কার্যক্রম আগের মতোই চলবে।

প্রথম আলো

০৫ এপ্রিল ২০২০

ভোগান্তি পেরিয়ে কারখানায় এসে আবার ফিরে গেলেন শ্রমিকেরা

কারখানায় যোগ দিতে এসে দেখেন বন্ধ। ফলে ফিরে যেতে হয় শ্রমিকদের। সিদ্ধিরগঞ্জের আদমজী ইপিজেড এলাকা। গণপরিবহন বন্ধ থাকায় বিকল্প ব্যবস্থায় ভোগান্তি নিয়ে কর্মস্থলে ফিরেছিলেন কারখানার শ্রমিকেরা। এসে দেখেন বন্ধ। অনেক কারখানার সামনে নোটিশ ঝোলানা, সেখানে লেখা—আগামী ১১ এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ। ফলে আবারও ভোগান্তির মধ্য দিয়ে ফিরে যেতে হয় শ্রমিকদের। অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, যদি ছুটি বাড়ানোই হলো, তাহলে কেন তাঁদের আগে জানানো হলো না। আজ রোববার নারায়ণগঞ্জের বেশির ভাগ কারখানাই বন্ধ ছিল। তবে বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর সদস্যভুক্ত ৪০টি পোশাক কারখানাসহ জেলায় ২৭৫টি কারখানা খোলা ছিল।

করোনাভাইরাসের প্রার্দুভাব ঠেকাতে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে ঘরে থাকতে। সবাইকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে। বন্ধ রাখা হয়েছে গণপরিবহন। কিন্তু গত শুক্রবার থেকে কর্মস্থল ঢাকা ও আশপাশের পোশাক কারখানা–অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে ফিরতে শুরু করেন হাজারো

মানুষ, যাঁদের অধিকাংশই পোশাকশ্রমিক। ফেরিতে, ট্রলারে, পিকআপে, মাইক্রোবাসে, ট্রাকে দ্বিগুণ ভাড়া দিয়ে গাদাগাদি করে মানুষকে আসতে দেখা গেছে। গাড়ি না পেয়ে অনেকে দীর্ঘ পথ হেঁটেও এসেছেন। এতে বড় ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকি দেখা দেওয়ায় রাতে মালিকপক্ষ থেকে কারখানা বন্ধের অনুরোধ জানানো হয়।শিল্প পুলিশ-৪–এর পুলিশ সুপার সৈকত শাহীন প্রথম আলোকে বলেন, নারায়ণগঞ্জ জেলায় পোশাকসহ বিভিন্ন ধরনের শিল্পপ্রতিষ্ঠান রয়েছে ২ হাজার ৪৫৯টি এবং কারখানাগুলোতে মোট ৪৫ লাখ শ্রমিক কাজ করেন। আজ রোববার তৈরি পোশাক, নিটিং, ডাইং, সিমেন্ট, বিস্কুটসহ বিভিন্ন ধরনের ২৭৫টি প্রতিষ্ঠান খোলা ছিল। এর মধ্যে বিজিএমইএর সদস্যভুক্ত ১৫টি এবং বিকেএমইএর সদস্যভুক্ত ২৫টি পোশাক কারখানা চালু ছিল। তিনি বলেন, যেসব শ্রমিক কাজে যোগ দিতে এসেছিলেন, তাঁদের হ্যান্ডমাইকে ঘোষণা দিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে বলা হয়েছে।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

প্রকাশ : ৪ এপ্রিল, ২০২০

ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে পোশাক শ্রমিকদের ঢল

পোশাক কারখানা খুলে দেওয়ায় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলার কর্মমুখী মানুষ পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া নৌ-পথ পাড়ি দিয়ে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ছুটছেন। গণপরিবহন বন্ধ থাকায় ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে পায়ে হেঁটে, ভ্যান-ট্রলি এবং পিকআপ ভ্যানে করে গন্তব্যে ছুটছেন তারা।

শনিবার দুপুর ১২টার দিকে দেখা যায়, ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের বিভিন্ন বাসট্যান্ডে ঢাকামুখী যাত্রীরা কেউ হেঁটে যাচ্ছেন আবার যাদের অর্থনৈতিক অবস্থা কিছুটা ভালো তারা ভ্যান বা পিকআপে করে ছুটে চলছেন ঢাকার দিকে। পাটুরিয়া ঘাট থেকে ঢাকার নবীনগরের ভাড়া ৫০ থেকে ৬০ টাকা আর সেখানে এক স্টপেজ থেকে অন্য স্টপেজে যাওয়ার জন্য ভাড়া গুনতে হচ্ছে একশ টাকা তবুও অতিরিক্ত টাকা দিয়েই যাচ্ছেন পোশাক শ্রমিকরা।

ঢাকার আশুলিয়ার পোশাক কারখানার শ্রমিক জানান, কারখানা খুলে গেছে তাই যাচ্ছি। আজ কারখানায় উপস্থিত না হতে পারলে যে কয়দিন ছুটি পাইছি সে কয়দিন অনুপস্থিত দেখাবে কর্তৃপক্ষ। যার কারণে অতিরিক্ত টাকা দিয়েই কারখানায় যাচ্ছি।

মানিকগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো .হাফিজুর রহমান জানান, মানিকগঞ্জের ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে আঞ্চলিক গণপরিবহন বন্ধ রয়েছে। এছাড়া এই মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে পুলিশের চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। গতকাল থেকে পোশাক কারখানার শ্রমিকরা পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া

নৌ-পথ পারি দিয়ে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক দিয়ে তাদের নিজ নিজ গন্তব্যে যাচ্ছে বলে জানান এই পুলিশ কর্মকর্তা।

The Daily Star

April 06, 2020

RMG owners divided when lives at risk

No specific govt guidelines on factory closure; workers left in uncertainty; some factories kept open

A ferry crammed with mostly ready-made garment workers leaving Dhaka for home yesterday morning. The photo was taken at Mawa Ghat on the Padma. Hundreds of workers walked for hours to reach the city after the authorities had decided to open the factories, but they had to travel back to their villages as the owners changed their decision following widespread criticism. Photo: COLLECTED, Star

Staff Correspondent Division among influential owners over the closure of garment factories and an absence of specific instructions from the government had sent thousands of workers into a dangerous scramble to get back to Dhaka.These workers braved risk of coronavirus infection and trudged to Dhaka only to find their factories closed.The apex body of the garment industry, Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), did not notify workers about the extension of the shutdown declared by the government on April 1.Workers at a factory gate in Savar learn that the factories would remain shut. Photo: COLLECTED, STAR

Citing a lack of authority to close factories, it waited for the government's Department of Inspection for Factories and Establishment (DIFE) to make the announcement as factories need DIFE's permission to shut down.

But the DIFE did not make any such announcement, saying many factories had pending work orders and some were making Personal Protective Equipment (PPE), the production of which is crucial.

This led thousands of workers to head to Dhaka and its adjoining areas like in Savar, Ashulia, Maona, Gazipur, Tongi, Narayanganj and Mirpur.

Most of the factories were closed on March 26 when the 10-day closure to slow down the coronavirus outbreak began.

A few factories continued production as the BGMEA and DIFE both had said that the factories could run if they had work orders or were making masks or other protective gear.

Shibnath Roy, inspector general of the DIFE, said "The DIFE did not ask for the closure of all factories even in the second circular published on April 1."

They had always said factories could run if they took proper safety measures, he said.

"The situation could have been avoided had the factory owners notified the workers about the extension of the government's general holiday up to April 11."

He said the factory owners had the time to do so but they could not reach a consensus in this regard. Some influential owners were in favour of implementing health and safety measures and continuing production, he told The Daily Star over phone.

The BGMEA and Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) leaders, and officials of DIFE had a meeting in Tejgaon on Saturday afternoon but failed to agree on closing the factories.

Some RMG factory owners wanted to reopen their units from yesterday.

But by Saturday evening, things turned south for the owners, BGMEA and DIFE as widespread criticism poured in. It was only then the BGMEA and BKMEA requested their members to shut down their units.

Rubana Huq, president of the BGMEA, said she on March 20 wrote to the labour ministry seeking measures about shutdown of factories.

A meeting was held on March 21 and many owners said their factories could stay open implementing health and safety measures, she said.

"Even then, the BGMEA went ahead and recommended closure on March 26. We made no announcement from the BGMEA to reopen factories… After seeing the procession of people, we again recommended closure," Rubana said.

"We are urging all our members to pay the workers their March salaries as soon as possible."

She said some 190 factories under the BGMEA membership were open yesterday.

Talking to The Daily Star, Mohammad Hatem, vice-president of BKMEA, also hinted at a division between factory owners.

He said many factory owners had told them that they had emergency shipments pending and could not close their units. Most factories were, however, closed.

Regarding Saturday's coming back of the workers, Hatem said they came mainly for salaries.

"It was really difficult for us to reach a consensus," Hatem told The Daily Star over phone. He said 60 percent of the knitwear factories were running yesterday.

He claimed that most of the workers who came to Dhaka came for their salaries.

Both Hatem and Rubana said that Commerce Minister Tipu Munshi at a meeting last week said the factories could run if safety of the workers was ensured.

Around 100 garment factories in Savar and Ashulia restarted yesterday but most were closed.

Most of the workers returned to Dhaka fearing they would lose their jobs.

Murshid Ali, a sewing machine operator at a garments factory in Savar, yesterday said, "After shutdown of my factory on March 25, I went home in Kumarkhali of Kushtia.

"I had to come back and suffer on the road as a factory official called me and told me to join work on April 5 or get fired," he said.

"I returned to save my job, otherwise I would not have returned," he said, adding, "I had to walk for two and half hours and change five vehicles to reach Savar. I spent Tk 1,500 in fares."

When he reached his factory yesterday, he learnt it was closed until April 11.

"I am worried about when my salary would be paid as the factory authority did not say anything about that," he added.

Kohinur Begum, who works for a factory in Ashulia, said, "A factory official told us that they would pay our salaries by April 7."

Her factory restarted.

Azijul Haque, assistant general manager (admin) of Winter Dress Ltd in Savar, said his factory restarted yesterday.

"We restarted as we have some urgent work orders pending."

RAK Liton, general manager (HR) of AR Jeans Producer Ltd in Ashulia, said, "We have declared our factory closed till April 10 due to coronavirus outbreak. We made the decision to protect our workers."

He said they were sending the workers' salaries via mobile banking channels.

Abdus Sobhan, general manager of Dhaka Export Processing Zone, said there were 100 factories in DEPZ and 50 restarted.

Citing poor work performance, two garment factories in Savar fired around 173 workers yesterday. The factories said the workers' dues would be paid by April 30.

Nazma Akter, president of Sammilito Garment Sramik Federation, said, "Thousands of workers went to the factories on foot, risking their health and the spread of coronavirus. They need salaries and livelihood but many factories laid off workers and fired them without pay."

She said what was being done to the workers was appalling. "How would the workers and their families survive with no jobs and healthcare?" she said.

"Global unions, ITUC, Industriall, UNI, AFLCIO, other unions, should make a joint call on the government, the BGMEA, and brands to ensure workers' pay and put an end to their sufferings," Akter said.

Transparency International Bangladesh in a statement yesterday protested the factory owners' decisions that led to the sufferings of garment workers.

In Chattogram, at least 133 garment and other export-orientate factories were operational yesterday.

Two lakh workers were working in those factories. Most of them came from different parts of country on Saturday suffering a lot on the road.

Factory owners claimed that they opened their factories to keep the work order of buyers.

MA Salam, first vice-president of the BGMEA, told The Daily Star, most buyers cancelled or postponed of their orders due to the Covid-19 pandemic. However, some buyers from the Fareast were waiting for their goods.

He said 38 out of 421 BGMEA-registered factories in Chattogram zone were running. The factories are manned by around 1 lakh workers.

He said there were some factories running outside the EPZs and some were not registered with the BGMEA.

At least 30 factories registered under the BKMEA, 65 factories in three EPZs of Chattogram, producing non-garments goods, opened yesterday.

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন
৭ এপ্রিল, ২০২০ ০৯:৩২

গার্মেন্টস শ্রমিকদের চাকরি রক্ষার্থে অবিলম্বে অধ্যাদেশ জারী করা হোক

গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতন পরিশোধের জন্য ৫০০০ কোটি টাকার প্রণোদনার পরও বিপুল সংখ্যক গার্মেন্টস শ্রমিককে লে অফ করে, তাদেরকে ছাঁটাই করে দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে খোদ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদফতর।

এইসব নথিপত্র, অভিযোগ, স্মারক, চিঠি চালাচালি করতে করতেই গার্মেন্টস শ্রমিকরা সর্বশান্ত হয়ে যাবে। তাই জাতির এই ক্রান্তিকালে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারী করে দ্রুত শ্রমিক ছাটাই বন্ধের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা ১২, ১৬, ১৭ এবং ১৮ এর বিধানাবলীতে যা বর্ণিত থাকুক না কেন। রাষ্ট্রপতির এই অধ্যাদেশ জারীর মাধ্যমে পরবর্তী ৯০ দিন পর্যন্ত দেশের সকল গার্মেন্টস শ্রমিককে সবধরনের লে অফ করা এবং তাদেরকে সবধরনের ছাঁটাই করে দেয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে অবিলম্বে এই অধ্যাদেশ জারী ও বলবৎ করা হোক।

গার্মেন্টস মালিকরা শ্রমিকের বেতনের টাকার জোগান দিতে না পারলে প্রয়োজনে বেতন পরিশোধের জন্য আরও আর্থিক প্রণোদনা দিতে হবে। তবুও কোন অবস্থাতেই যেন ৪০ লাখ শ্রমিকের পরিবার অনাহারে না মরে।

লেখক: আইনজ্ঞ ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার, ৭ এপ্রিল, ২০২০

মন্ত্রিসভা বৈঠকে উদ্বেগ প্রধানমন্ত্রীর গার্মেন্ট কাণ্ডে বিস্ময়, দায়ী সংশ্লিষ্টদের ছাড়া পাচ্ছেন লঘুদন্ড ও দীর্ঘদিন থাকা হাজতিরা

দেশে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গার্মেন্ট কারখানা খোলা রাখা না রাখা নিয়ে সমন্বয়হীনতা এবং শ্রমিকদের ছুটি দিয়ে তাদের আবার ঢাকায় নিয়ে আসা এবং ফেরত পাঠানোর ঘটনায় চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি।

এমন পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য বিজিএমইএ সভাপতি রুবানা হক, সংসদ সদস্য সালাম মুর্শেদীসহ আরও

কয়েকজন এবং বাণিজ্যমন্ত্রীকে সরাসরি দায়ী করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। একই সঙ্গে তিনি বলেন, এ ঘটনার কারণে শ্রমিকদের মাধ্যমে সারা দেশে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বিস্তার লাভ করবে। গতকাল গণভবনে ক্ষুদ্র পরিসরে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে তিনি এই ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে আরও কঠোর হওয়ারও নির্দেশ দেন বলে বৈঠক সূত্রে জানা গেছে। এ ছাড়া বৈঠকে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মাদারীপুর ও গাইবান্ধা পূর্ণাঙ্গ লকডাউনের সিদ্ধান্ত হয়। বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসের ভয়াবহ বিস্তার এবং দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে দুই সপ্তাহ বিরতির পর গতকাল ছুটো আকারে মন্ত্রিসভার বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মাত্র সাত জন মন্ত্রিসভায় অংশ নেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে গণভবনে অনুষ্ঠিত বৈঠকটি সংক্ষিপ্ত সময়ে শেষও হয়ে যায়। এক ঘণ্টারও কম সময় চালা বৈঠকের বেশিরভাগ সময়ই করোনাভাইরাস এবং পোশাক কারখানা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

বৈঠক সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈঠকে গার্মেন্ট কারখানার ছুটি এবং শ্রমিকদের ঢাকা থেকে চলে যাওয়া ও আবার ফিরে আসার প্রসঙ্গ তুলে নিজেই আলোচনার সূত্রপাত করেন। এ সময় তিনি বলেন, প্রথমে গার্মেন্ট কারখানা ছুটি দেওয়া হলো। শ্রমিকরা বাড়ি চলে গেল। সরকার সাধারণ ছুটির সময়সীমা বাড়াল। কিন্তু গার্মেন্ট কারখানার মালিকরা সেটি দেখলেন না। তারা ৫ এপ্রিল কারখানা খোলার সিদ্ধান্ত নিয়ে শ্রমিকদের ঢাকায় নিয়ে আসেন। তিনি গার্মেন্ট মালিকদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, সারা দেশে সাধারণ ছুটি থাকার পরও কার নির্দেশে, কার পরামর্শে শ্রমিকদের ঢাকা নিয়ে আসা হলো? রাতে কারখানা বন্ধের ঘোষণা দিয়ে তাদের গ্রামের পথে আবার ফেরত পাঠানো হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের এই পরিস্থিতিতে সমন্বয় ছাড়া গার্মেন্ট খোলা এবং শ্রমিকদের ঢাকায় নিয়ে আসার ফলে করোনাভাইরাসের বিস্তার ঘটছে। এই পরিস্থিতির জন্য প্রধানমন্ত্রী সরাসরি গার্মেন্ট কারখানা মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ সভাপতি রুবানা হক, সাবেক সভাপতি ও সংসদ সদস্য সালাম মুর্শেদী, উপ-নির্বাচনে ঢাকা থেকে সদ্য নির্বাচিত এক সংসদ সদস্য এবং বাণিজ্যমন্ত্রীকে দায়ী করেন। এ সময় বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সী আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করে বলেন, আমি গার্মেন্ট মালিকদের নিয়ে বসেছিলাম। তাদেরকে পুরো পরিস্থিতি তুলে ধরে গার্মেন্ট কারখানা বন্ধ করার কথাও বলেছিলাম। কিন্তু তারা শোনেননি।

বৈঠক সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাৎক্ষণিকভাবে বৈঠকে উপস্থিত মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও তার মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দেন, বিকালের মধ্যে গার্মেন্ট খাতের সংশ্লিষ্ট নেতৃস্থানীয়দের নিয়ে বৈঠকে করে দেশের গার্মেন্ট কারখানা খোলাসহ সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে তারা সুনির্দিষ্ট একটি বিধান করবেন। একই সঙ্গে তিনি এ নির্দেশনাও দেন যেসব কারখানা মাস্ক, পিপিইসহ এমন পণ্য তৈরির সঙ্গে যুক্ত শুধু তাদের কারখানা খোলা থাকবে। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন,

এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহ আরও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। অন্যান্য দেশের যে পরিস্থিতি তাতে বাংলাদেশও ঝুঁকিমুক্ত নয়। সামনের দিনগুলো আরও বিভীষিকাময়। এ জন্য সরকারের নিয়ম-কানুন মানাতে সংশ্লিষ্টদের আরও কঠোর হওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। বৈঠকে উপস্থিত একাধিক মন্ত্রী বর্তমান পরিস্থিতিতে করোনাভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে এবং পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুরোপুরি লকডাউনসহ আরও কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রীকে। তাদের বক্তব্য ও পরামর্শ প্রধানমন্ত্রী মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন, তবে কোনো কথা বলেননি।

সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দিয়েছেন, এখন (গতকাল সোমবার) রাজধানী ঢাকায় কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। বাহির হতেও পারবে না। এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেন বৈঠক থেকেই। তবে খুব জরুরি প্রয়োজনে কেউ যদি বাহির হতে চান এবং উপযুক্ত কারণ দেখাতে পারেন তাহলে তাকে ছাড়া হবে। অন্যথায় সবার ক্ষেত্রেই সমান আদেশ প্রযোজ্য হবে।

বৈঠক সূত্র জানায়, বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান প্রধানমন্ত্রীকে বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে কারাগারে আটক লঘুদে সাজাপ্রাপ্ত এবং দীর্ঘদিন ধরে আটক হাজতিদের ছেড়ে দেওয়া যায় কি না। এ ব্যাপারে তিনি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা চান। জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে দ্রুত প্রস্তাব পাঠানোর নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ধর্ষণ মামলা, এসিড ছোড়ার মামলা এবং খুনের মামলার আসামিদের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হবে না। এ বিষয়টি বিশেষ নজর রাখতে হবে।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন
৭ এপ্রিল, ২০২০

কারখানা বন্ধ ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত, ১৬ তারিখের মধ্যেই মার্চের বেতন

করোনার প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত সরকারি-বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেছে সরকার। সরকারি ছুটির সঙ্গে সমন্বয় করে দেশের সব পোশাক কারখানা আগামী ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। এছাড়া শ্রমিক-কর্মচারীদের মার্চ মাসের বেতন আগামী ১৬ এপ্রিলের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। পোশাক মালিকদের বড় দুটি সংগঠন ‘বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রফতানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ)’ এবং বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ) এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সোমবার রাত্রে সংগঠন

দুটির পক্ষ থেকে গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানানো হয়। বিকেএমইএ-এর সভাপতি একেএম সেলিম ওসমান এবং বিজিএমইর সভাপতি ড. রুবানা হক এর যৌথ ঘোষণায় গণমাধ্যমকে বলা হয়েছে, মহামারী করোনাভাইরাসের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরকারের ছুটির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএর সদস্য প্রতিষ্ঠান সমূহ আগামী ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তবে রফতানিমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠান যাদের জরুরী রফতানি কার্যাদেশ রয়েছে এবং যেসব কারখানায় করোনার সরঞ্জামাদি, মাস্ক চিকিৎসকদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) এবং করোনা প্রতিরোধী সামগ্রী তৈরি করছে, এমন কারখানাগুলোকে তাদের শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে প্রয়োজনে খোলা রাখতে পারবে। এক্ষেত্রে নিজ নিজ অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ/বিকেএমইএ), কল কারখানা পরিদর্শন অধিদফতর এবং শিল্প পুলিশকে কারখানা খোলা রাখার বিষয়টি জানাতে হবে। এছাড়া ১৬ এপ্রিলের মধ্যে শ্রমিক-কর্মচারীদের মার্চ মাসের বেতন পরিশোধ করতে হবে।

বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

এপ্রিল ০৬, ২০২০

রফতানিমুখী শিল্পের কর্মীদের মোবাইল অ্যাকাউন্ট খোলার নির্দেশ

করোনাভাইরাস সংক্রমণ বিস্তার রোধে সচল রফতানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারীদের মোবাইল অ্যাকাউন্ট খোলার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। সরকার ঘোষিত আর্থিক প্রণোদনা এবং বেতন-ভাতাদি এই হিসাবে পৌঁছে দেয়া হবে।

আজ সোমবার বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেম ডিপার্টমেন্ট থেকে এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

দেশে কার্যরত সব তফসিলি ব্যাংক এবং সব মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রোভাইডারের প্রধান নির্বাহীদের কাছে পাঠানো এ প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, চলতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে সচল রফতানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারীদের মোবাইল অ্যাকাউন্ট নিশ্চিত করতে হবে। যাতে করে এই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে বেতন ভাতা এবং সরকারি প্রণোদনা পরিশোধ করা যায়। এজন্য শ্রমিক অথবা কর্মচারীদের জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা জন্ম নিবন্ধন সনদের প্রয়োজন হবে।

তবে এই হিসাব খোলার জন্য কোনো ধরনের চার্জ বা ফি কাটা হবে না। এই হিসাব খোলার জন্য উর্ধ্বতন পর্যায় থেকে গ্রাহকদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং উৎসাহিত করার জন্য প্রচারণাসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করারও নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

সমকাল

০৬ এপ্রিল ২০২০

পোশাক শ্রমিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষার অধিকার লঙ্ঘন হয়েছে :টিআইবি

তৈরি পোশাকশিল্প মালিক কর্তৃক শ্রমিকের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য সুরক্ষার অধিকার লঙ্ঘন হয়েছে দাবি করে এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। করোনা সংক্রমণ রোধে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে ১১ এপ্রিল পর্যন্ত সরকারি ছুটির ঘোষণার মধ্যেই তৈরি পোশাকশিল্প মালিকরা যেভাবে শ্রমিকদের চাপের মুখে কর্মস্থলে ফিরতে বাধ্য করেছেন তার তীব্র সমালোচনা করেছে প্রতিষ্ঠানটি।সোমবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে সংস্থাটি বলেছে, মালিকপক্ষের জাতীয় স্বার্থ পরিপন্থী এই অবিবেচনাপ্রসূত স্বার্থপর আচরণে লাখ লাখ শ্রমিক এবং কার্যত গোটা দেশই করোনাভাইরাস সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার ভয়াবহ ঝুঁকিতে পড়েছে।মালিকদের হুমকিতে 'চাকরি বাঁচাতে' দূর-দূরান্ত থেকে লাখ লাখ শ্রমিক যেভাবে পায়ে হেঁটে কাজে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছেন তাকে শ্রমিকের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার অধিকারের চূড়ান্ত লঙ্ঘন বলে অভিহিত করেছে টিআইবি।

টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, কোভিড-১৯ এর বিস্তার ঠেকাতে সরকার ছুটির মেয়াদ বাড়িয়ে দিল। আগামী দুই সপ্তাহ সময়কে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করায় সরকার কর্তৃক সবাইকে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ঘরে থাকতে বলা হচ্ছে।

তিনি বলেন, বিশ্বজুড়ে যখন সব ধরনের কার্যক্রম স্থবির হয়ে গেছে, উৎপাদিত পণ্যও রপ্তানির সুযোগ নেই বললেই চলে, পণ্য বা উপাদান যেখানে পচনশীল কিংবা জরুরি প্রয়োজনীয় বিবেচিত হওয়ার সুযোগ নেই, সেই পরিস্থিতিতে কারখানা খুলে দেবার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে শ্রমিকদের কর্মস্থলমুখী করে, তাদের এবং কার্যত পুরো দেশকে কাণ্ডজ্ঞানহীনভাবে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেওয়াটা চরম স্বার্থপরতা ও ষড়যন্ত্রমূলক ছাড়া আর কী হতে পারে! এর দায় কারখানা মালিক থেকে শুরু করে মালিকদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ যেভাবেই ব্যাখ্যা করুক না কেন, কোনো অবস্থাতেই এড়াতে পারে না।

ড. জামান বলেন, করোনা-উদ্ভূত ঝুঁকিকে জাতীয় দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা করে প্রধানমন্ত্রী সর্বপ্রথম এই খাতের পাশে দাঁড়ালেন; রপ্তানি খাতের শ্রমিকদের বেতনভাতা অব্যাহত রাখার জন্য নামমাত্র সার্ভিস চার্জে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে যে পাঁচ হাজার কোটি টাকার তহবিল ঘোষণা করলেন, তার প্রায় ৮৫ শতাংশ এ খাতের। তারপরও এ খাতের নেতৃবৃন্দ শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার অধিকার লঙ্ঘন করে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকি ব্যাপক বৃদ্ধি করে জাতীয়

স্বার্থের পরিপন্থী অবস্থান নিলেন। শ্রমিকদের কর্মস্থলে ফিরতে বাধ্য করা হলো, তারা অমানবিক পরিশ্রম করে পায়ে হেঁটে দূর-দূরান্ত থেকে ফিরলেন। তারপর তীব্র সমালোচনার মুখে প্রায় মধ্যরাতে মালিকদের সংগঠন আহ্বান জানালো কারখানা বন্ধ রাখার। এই যে শ্রমিকরা এত কষ্ট করে, এত ঝুঁকি নিয়ে ফিরলেন, তাঁরা মধ্য রাতে কোথায় যাবেন সেটা কি একবারও ভেবেছেন মালিকপক্ষ?

The Financial Express

April 07, 2020

'Pay workers' salaries for March within April 16'

Commerce minister urges industry owners

Commerce Minister Tipu Munshi has urged owners of industries to pay salaries to their workers for the month of March within April 16.

The minister also urged them not to dismiss any worker amid the ongoing shutdown following the coronavirus outbreak, reports UNB quoting a press release on Tuesday.

প্রথম আলো

০৮ এপ্রিল ২০২০

প্রণোদনা প্যাকেজ কতটা জনবান্ধব?

করোনাভাইরাস বৈশ্বিক মহামারির এই সময়ে আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষতির প্রভাব স্বল্প মেয়াদে ও দীর্ঘ মেয়াদে দুইভাবে অনুভূত হবে। স্বল্প মেয়াদে আমরা দুটি বিষয় একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছি, একদিকে পণ্য উৎপাদন ও সেবা খাত স্থবির হয়ে পড়েছে, অন্যদিকে অনেক মানুষ আয়ের উৎস হারিয়ে ফেলায় দ্রুত ক্রয়ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছেন। শ্রমিক, মজুর ও বেতনভুক্ত কর্মচারী কাজ না করলে যেমন পণ্য ও সেবা দিতে পারছেন না এবং উৎপাদকেরা দিশেহারা বোধ করছেন, তেমনি আবার আয় করতে না পারায় এই শ্রমিক, মজুর, বেতনভুক্ত অস্থায়ী কর্মচারীরা কেউ চাকরি হারিয়ে, কেউবা চাকরি হারানোর ভয়ে অসহায় হয়ে পড়েছেন।

ঋণসহায়তা কতটা কাজে দেবে? অন্যদিকে দীর্ঘ মেয়াদে, অর্থাৎ করোনা–পরবর্তী মন্দার সময় উৎপাদন পুনরায় শুরু হবে, তবে বর্তমান ক্ষতির কারণে বিনিয়োগ হ্রাস পাবে, উৎপাদন কমে যাবে, বেকারত্ব বাড়বে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাড়ানো কঠিন হয়ে যাবে এবং দ্রব্যমূল্য

বাড়বে। এ রকম অবস্থায় যখন মন্ত্রীরা বলছেন যে এই আর্থিক প্রণোদনা, যা মূলত ঋণের সুবিধা, তা সব শ্রেণি–পেশার মানুষের কাছে পৌঁছাবে, তখন তাঁরা হয়তো আশা করছেন বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা এই বিপৎকালীন ঋণ নিয়ে উৎপাদনব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে শ্রমিক ও কর্মচারীদের বেতন দিলে এটা সব শ্রেণি–পেশার মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে। আর আমদানি–রপ্তানি সহজ হলে এর সুফলও সবাই সমানভাবে ভোগ করবেন বা ধরেন, সরকার আশাবাদী যে সেই ঋণের টাকাটা ব্যবসায়ীরা এখন না পেলেও ভবিষ্যতে পাবেন, যা বিপৎকালীন ক্ষতি–পরবর্তী সময়ে কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করবে। অর্থনীতিকে সচল রাখতে অর্থ সঞ্চালনের সম্প্রসারণবাদী এমন নীতি অনেক দেশই ব্যবহার করে, তবে এর মূল উদ্দেশ্য হয় সাধারণত দীর্ঘ মেয়াদে মন্দা মোকাবিলা। অর্থাৎ ঋণপ্রাপ্তির সুবিধা ব্যবসায়ীদের একধরনের নিশ্চয়তা দেয় যে তাঁরা এখন যে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছেন, তা তাঁদের সুরক্ষা দেবে ঋণের সুবিধা বাড়লে। এভাবে চিন্তা করলে সরকার তো আশাবাদী হবেই এই প্যাকেজ নিয়ে। তাহলে সমস্যা কোথায়?

প্রথম সমস্যা হলো, অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মহীন হয়ে পড়েছে লাখ লাখ দিনমজুর ও শ্রমিক, অস্থায়ী কর্মীরা, যাঁরা এখনো চাকরি হারাননি, তাঁরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। অনানুষ্ঠানিক খাতে যাঁরা কাজ করছেন, তাঁদের সংখ্যা তো পাঁচ কোটির ওপরে। এই খাতে যাঁরা এরই মধ্যে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন, তাঁদেরই–বা কী হবে? দ্বিতীয় সমস্যা হলো, সব ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়েছে। এই অনিশ্চয়তার মধ্যে ব্যবসায়ীদের ওপর সরকার ছেড়ে দিয়েছেন কোটি কোটি মানুষের আয়ের নিশ্চয়তা। এখন প্রশ্ন হলো, সব ব্যবসায়ীই কি ঋণ পাবেন? তাঁরা তো ঋণ না–ও পেতে পারেন, ঋণ পাওয়ার শর্ত পূরণ না–ও করতে পারেন। তাহলে কি সেসব ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বেতন দেবে না? তাহলে এই ঋণ কীভাবে সব শ্রেণি–পেশার মানুষের কাছে পৌঁছাবে বলে সরকার দাবি করতে পারে?

কিন্তু ক্রয়ক্ষমতা ফিরবে কি? এই প্যাকেজে যা নেই, তা হলো এই দুর্দিনে জরুরি ভিত্তিতে মৌলিক চাহিদা পূরণে ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে অর্থ সঞ্চালন। চাকরি হারিয়ে, কাজ না থাকায়, মজুরি না পাওয়ায় যাঁরা মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হচ্ছেন, সেই শ্রেণির কাছে খাবার পৌঁছে দেওয়া, নগদ অর্থ পৌঁছে দেওয়া জরুরি হলেও সরকার এই পথ বেছে নেয়নি। কারণ, সরকার এটাকে জরুরি মনে করছে না। ক্ষুধার্ত মানুষ রাস্তায় নেমে এলে, ছিনতাই, ডাকাতি ও অন্যান্য অপরাধ বেড়ে গেলে হয়তো সরকার এটা জরুরি মনে করতে পারে। কিন্তু তখন আর এসব সামাজিক ক্ষতি পোষানো সম্ভব হবে না। এখন যেভাবে প্রণোদনা দেওয়া হলো, তাতে বেতনদাতা ও বেতনভুক্তর মধ্যে একটি স্থায়ী দ্বন্দ্ব উসকে দেওয়ার বন্দোবস্ত

করে দেওয়া হলো। যেই ভুক্তভোগীরা সরাসরি সরকারের কাছ থেকে নগদ অর্থ ও খাদ্যসহায়তা পেয়ে এই আপৎকাল পার করতে পারতেন, তাঁদের সরাসরি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সঙ্গে লেনদেনে থেকে প্রতিনিয়ত দুই পক্ষের 'টাকা নাই' 'টাকা নাই' অস্থিরতা ও সংঘাতের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হলো। এর প্রথম প্রকাশ আমরা দেখলাম ৪ এপ্রিল থেকে করোনাভাইরাস উপেক্ষা করে শহরমুখী শ্রমিকদের ঢল দেখে। চাকরি হারানোর ভয়ে করোনাঝুঁকি উপেক্ষা করে লাখ লাখ শ্রমিকের বেপরোয়া যাত্রা প্রমাণ করে, মহামারির সময়ে সামাজিক সুরক্ষা দিতে ব্যবসায়ীবান্ধব প্যাকেজ আসলে কত বেশি অকার্যকর। কী হতো যদি এখনই সরাসরি নগদ অর্থ ও খাদ্যসহায়তা তাঁদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যেত? এই শ্রমিকেরা যদি নিজ নিজ এলাকায় থেকে নিশ্চিতভাবে জানতেন যে তাঁরা সাহায্য পাবেন, তাঁদের এভাবে বেপরোয়া হয়ে হেঁটে আসতে হতো না। শ্রমিকদের বেতন নিয়ে শুরু হয়েছে অসন্তোষ। আজও দুজন শ্রমিক বেতনের দাবিতে প্রতিবাদ করতে গিয়ে নিহত হয়েছেন ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে।

খাদ্য ও অর্থসহায়তাই অর্থনীতির জন্য উপকারীখাদ্য ও অর্থ প্রদান শুধু বর্তমানে করোনাদুর্গত ব্যক্তিদের সুরক্ষাই দেবে না, এর অর্থনৈতিক সুফলও রয়েছে, তা থেকে দীর্ঘ মেয়াদে পুরো অর্থনীতি উপকৃত হতে পারে। অর্থনীতির পুরোধা মানুষের একজন জন মেনার্ড কেইনসের মতে, মন্দার সময় ব্যয় সম্প্রসারণমূলক নীতি গ্রহণ করে মন্দা থেকে উত্তরণ সম্ভব। এর মধ্য দিয়ে দ্রব্যের কমে যাওয়া চাহিদা বাড়ানো সম্ভব। দুইভাবে মন্দাবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটানো সম্ভব—ব্যয় সম্প্রসারণ ও মুদ্রা সম্প্রসারণ। নগদ অর্থ প্রদান ও খাদ্যসহায়তা হচ্ছে ব্যয় সম্প্রসারণ নীতি। এর মাধ্যমে সরকার কোষাগার থেকে অর্থ ব্যয় বাড়িয়ে তা মানুষের কাছে এমনভাবে পৌঁছে দেয়, যেন তা সামাজিক সুরক্ষা ব্যয় বাড়িয়ে অথবা কর্মসংস্থান তৈরিতে অবদান রেখে তাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে পারে। এই বর্ধিত ক্রয়ক্ষমতার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে চাহিদার পতন ঘটে না।অনেক ধরনের ব্যয় সম্প্রসারণের পাশাপাশি এটা হতে পারে মহামারির সময় স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বাড়ানো, খাদ্যসংকটে জরুরি সাহায্য প্রদান, কিংবা জনসুরক্ষা দেয় এমন খাতে ট্যাক্স কমানো ইত্যাদি। এই প্রক্রিয়ায় বিক্রেতার আয় যেমন অব্যাহত থাকে, তেমন এ ধরনের ব্যয় সম্প্রসারণ বাজার স্থিতিশীল করতেও ভূমিকা রাখে। এভাবে আপদকালীন অর্থ সঞ্চালন অব্যাহত থাকলে আসন্ন মন্দাকেও নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।আরেকটি পদ্ধতি হলো সুদ কমিয়ে ঋণসহায়তা বাড়িয়ে মুদ্রা সম্প্রসারণ। এর মাধ্যমে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হয়। বাংলাদেশের সরকার এই দ্বিতীয় পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। এই পদ্ধতি তাৎক্ষণিক সংকটকে মোকাবিলা করতে পারে না, বরং একধরনের প্রত্যাশা তৈরি করতে ভূমিকা পালন করে। এই প্রত্যাশা প্রতিটি সম্ভাব্য

ঋণগ্রহীতার মধ্যে সমানভাবে তৈরি হয় না। যারা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী, তারা এই ঋণ প্রাপ্যতাকে ইতিবাচকভাবে নেয় এবং বাকিরা এই নীতিতে সাধারণত আস্থাশীল থাকে না। এতে বিনিয়োগকারীদের একটি অংশের মধ্যে সরকারের প্রতি অনাস্থা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

ব্যয় সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করলে কোষাগারে অর্থ না থাকলে সরকারকে ঋণ নিতে হয়। এই ঋণ সরকার পরিশোধ করে জনগণের দেওয়া ট্যাক্স ও ভ্যাট থেকে। কিন্তু মুদ্রা সম্প্রসারণ নীতি)সুদে ভর্তুকি (গ্রহণ করলে সরকার সুদের একটা অংশের জন্য ব্যয় করলেও উৎপাদক বা বিনিয়োগকারীর ওপর ঋণ পরিশোধের দায় থাকে। আমরা জানি ২০১৯–এর নভেম্বর পর্যন্ত খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯৬ হাজার ৯৮৬ কোটি ৩৮ লাখ টাকা। ২০১৯ সালের প্রাক্কলিত হিসাব অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশেই খেলাপি ঋণের হার সবচেয়ে বেশি—১১ দশমিক ৪ শতাংশ। করোনাভাইরাস দুর্যোগ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে সরকার ইতিমধ্যেই ঘোষণা দিয়েছে, ঋণ পরিশোধের অপারগতায় আগামী জুন মাস পর্যন্ত নতুন করে কোনো ঋণকে খেলাপি ঘোষণা করা যাবে না)১৯ মার্চ ২০২০, প্রথম আলো(। সরকার ঋণখেলাপিদের ব্যাপারে কঠোর না হওয়ায় ঋণের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। এই অবস্থায় নতুন করে ঋণ নিলে তা পরিশোধ করা না গেলে জিডিপিতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ আরও বাড়বে। এই অবস্থা অর্থনীতির জন্য দীর্ঘ মেয়াদে মোটেও সুখকর না হলেও মন্দা থেকে উত্তরণের জন্য সরকার ঋণ সম্প্রসারণ নীতির দিকেই বেশি জোর দিয়েছে। কিন্তু এই নীতি অবলম্বন করে সরকার যদি পাশাপাশি করোনাভাইরাসের সময় দুস্থ অসহায় মানুষদের জন্য অর্থসহায়তা নিয়ে এগিয়ে না আসে, তাহলে এই ব্যবসাবান্ধব নীতি থেকে ব্যবসায়ীরাই অসমভাবে উপকৃত হবেন।

সামাজিক সুরক্ষা তহবিলব্যক্তি ও সংগঠনের উদ্যোগে দেওয়া সাহায্য দিয়ে বেশি দিন পার করা সম্ভব নয়। সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের কাজটি সরকারের। এটাকে রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক কাজ হিসেবে দেখলে মনে হতে পারে এটি কোনো দয়া-দাক্ষিণ্য। অথচ এই দুঃসময়ে খাদ্য সরবরাহ পাওয়া জনগণের অধিকার। এই সাহায্য মোটেই অর্থনীতির বাইরের কোনো সাময়িক দান প্রকল্প নয়।এ মুহূর্তে প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট সামাজিক সুরক্ষা তহবিল। বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন উৎস থেকে সহায়তা দেওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু তার সঠিক পরিমাণ এবং কাদের কীভাবে দেওয়া হবে, সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলও গঠন করা হয়েছে। আমরা শুনতে পাচ্ছি, সহায়তা দেওয়ার জন্য তালিকা তৈরি হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সাধারণত যেসব তালিকা তৈরি করা হয়, সেগুলো কতখানি প্রকৃত অভাবী, অনাহারী ও সীমিত আয়ের মানুষের কাছে পৌঁছে, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। কারণ, প্রথমত নতুন করে যাঁরা কর্মহীন হয়ে

পড়েছেন, তাঁরা আগে থেকে হয়তো তালিকাভুক্ত ছিলেন না। দ্বিতীয়ত দলীয় সম্পৃক্ততাকে মাপকাঠি ধরে তালিকাভুক্ত করা হলে তা সত্যিকার প্রয়োজন না মিটিয়ে দলীয় উদ্দেশ্য হাসিলেই বেশি সহায়ক হয়। এ ক্ষেত্রে সাহায্য যাঁরা পাবেন, তাঁদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা যায়। নিজের এলাকার নামে ক্লিক করলে সবাই যেন দেখতে পারে, কার নাম আছে আর কার নেই। সে ক্ষেত্রে যদি কোনো ধনী পরিবার সেই তালিকায় থাকেন বা কোনো দরিদ্র পরিবার বাদ পড়েন, তা যেন তাঁরা অভিযোগ আকারে প্রকাশ করতে পারেন। এভাবে চেক অ্যান্ড ব্যালান্স একটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এখানে জবাবদিহি নিশ্চিত করা যেতে পারে।কয়েক দিন ধরে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ৫০০০ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ থেকে শ্রমিকদের বেতন দেওয়া নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রজ্ঞাপন জারি করেছে, প্রণোদনা পেতে হলে শ্রমিকদের পরিচয়পত্রসহ অ্যাকাউন্টে বেতন জমা দেওয়ার প্রমাণ দিতে হবে। কিন্তু সবার পরিচয়পত্র ও অ্যাকাউন্ট না থাকায় এই বেতনপ্রাপ্তি কীভাবে নিশ্চিত করা যাবে, তা প্রশ্ন রয়ে গেছে। অর্থাৎ এখন শুধু প্রণোদনা প্যাকেজ দিলেই নিশ্চিত হয়ে বলা যাচ্ছে না, সরকারের সহায়তা আসলে জায়গামতো পৌঁছাচ্ছে কি না, বরং সুষ্ঠু বিতরণপ্রক্রিয়া এখানে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রেও শ্রমিকদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা যায়। যেসব শ্রমিকের নাম থাকবে কিন্তু টাকা পাবেন না, তাঁরা যেন এসে দাবি করতে পারেন টাকা না পাওয়ার। এভাবে গণনজরদারির মেকানিজম তৈরি করে জবাবদিহি বাড়ানো যায়।সরকার ঘোষিত ৭২ হাজার ৭৫০ কোটির প্রণোদনা প্যাকেজটি করোনাভাইরাস দুর্যোগ মোকাবিলায় সময়োপযোগী নয়, জনবান্ধবও নয়। অনেকে জিডিপিতে এর শতকরা ভাগ)২.৫২ (%দেখে এটাকে খুব বড় কিছু হিসেবে উপস্থাপন করতে পারেন। কিন্তু দেখা উচিত ছিল সারা পৃথিবীতে সামাজিক সুরক্ষায় সরকার কীভাবে অবদান রাখছে। অর্থাৎ সংখ্যার বাইরে গিয়ে প্রণোদনার কার্যকারিতা বিশ্লেষণের প্রয়োজন ছিল। বর্তমান সংকট মোকাবিলায় জনগণের দুর্ভোগ কমানোয় প্রণোদনার কার্যকারিতাকে মাপকাঠি হিসেবে ধরলে নিশ্চয়ই এখানে সামাজিক সুরক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট প্যাকেজটি প্রথম ঘোষিত প্যাকেজ হিসেবেই পাওয়া যেত। তা হয়নি বলে এই প্যাকেজকে সময়োপযোগী ও জনবান্ধব বলা যাচ্ছে না।

মোশাহিদা সুলতানা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস ডিপার্টমেন্টের অর্থনীতির সহকারী অধ্যাপক

এপ্রিল ০৮, ২০২০

মার্চের বেতন হয়েছে ২৪৩টি পোশাক কারখানায়

দেশের ছয়টি শিল্পাঞ্চলে পোশাক খাতের মোট কারখানা আছে ২ হাজার ৯৮৩টি। শিল্প পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, এর মধ্যে গতকাল পর্যন্ত ২৪৩টি কারখানা মার্চের বেতন পরিশোধ করেছে। বাকি ২ হাজার ৭৪০টি কারখানায় বেতন পরিশোধ হয়নি। যদিও প্রচলিত শ্রম আইন অনুযায়ী প্রতি মাসের বেতন পরবর্তী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।শিল্পাঞ্চল আশুলিয়া এলাকায় বিজিএমইএ-
বিকেএমইএর সদস্য পোশাক কারখানা আছে মোট ৫০৬টি। এর মধ্যে গতকাল পর্যন্ত মোট ৩৪টি কারখানা বেতন পরিশোধ করেছে। গাজীপুরে বিজিএমইএ-
বিকেএমইএর সদস্য পোশাক কারখানা আছে ৯৬৮টি। এর মধ্যে গতকাল পর্যন্ত মার্চের বেতন পরিশোধ করেছে এমন কারখানার সংখ্যা ১১৬। চট্টগ্রামে বিজিএমইএ-
বিকেএমইএর সদস্য পোশাক কারখানা আছে মোট ৪০৮টি। এর মধ্যে গতকাল পর্যন্ত মার্চের বেতন পরিশোধ করেছে এমন কারখানার সংখ্যা ১৭।নারায়ণগঞ্জ এলাকায় পোশাক কারখানা আছে ১ হাজার ৪৬টি। এর মধ্যে গতকাল পর্যন্ত মার্চের বেতন পরিশোধ করেছে ৫৩টি কারখানা। ময়মনসিংহে বিজিএমইএর সদস্য মোট পোশাক কারখানার সংখ্যা ৫০। এর মধ্যে ১৮টি কারখানা গতকাল পর্যন্ত বেতন পরিশোধ করেছে। এ অঞ্চলে বিকেএমইএর সদস্য কোনো কারখানা নেই। খুলনায় পোশাক কারখানা আছে পাঁচটি। এ কারখানাগুলোর সবই বিজিএমইএর সদস্য। সব কারখানাই মার্চের বেতন পরিশোধ করেছে।মার্চের বেতন পরিশোধ পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাইলে বিজিএমইএ সভাপতি ড. রুবানা হক বলেন, চলতি মাসের ১৬ তারিখের মধ্যে সব বেতন পরিশোধ হয়ে যাবে।দেশের ছয়টি শিল্প এলাকায় বস্ত্র, পোশাক, চামড়া, ওষুধ, রি-
রোলিং, ফার্নিচার, মোবাইল সংযোজন, সিরামিকসহ সব খাত মিলিয়ে মোট শিল্প-
কারখানা আছে ৭ হাজার ৬০২টি। এর মধ্যে গতকাল বন্ধ ছিল ৭ হাজার ৫৬টি। বাকি ৫৪৬টি কারখানা খোলা ছিল। আর ৭ হাজার ৬০২টি কারখানার মধ্যে গতকাল পর্যন্ত বেতন পরিশোধ করেছে ১ হাজার ২৪টি। বাকি ৬ হাজার ৫৭৮টি কারখানায় বেতন পরিশোধ হয়নি। শিল্প এলাকাগুলোয় কর্মরত ৩০ লক্ষাধিক শ্রমিক।জানা গেছে, কোভিড-
১৯ বা নভেল করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের প্রেক্ষাপটে চলতি বছরের শুরুতেই দেশের পোশাক কারখানাগুলোর রফতানি কার্যক্রম ব্যাহত হতে শুরু করে। ক্রেতারা একের পর এক ক্রয়াদেশ বাতিল করায় কারখানায় কাজের সংকটও তৈরি হয়। এ প্রেক্ষাপটে মার্চের বেতন পরিশোধে হিমশিম খেতে হচ্ছে উদ্যোক্তাদের। সবচেয়ে বেশি বেগ পেতে হচ্ছে ক্ষুদ্র আকারের কারখানাগুলোকে। এ ধরনের কারখানা ১০-১৫ শতাংশ।পোশাক কারখানাগুলোর বেতন-
ভাতা পরিশোধসংক্রান্ত জটিলতা নিয়ে গতকাল বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বরাবর একটি চিঠিও দিয়েছে বিজিএমইএ। সংগঠনের সভাপতি রুবানা হক স্বাক্ষরিত চিঠিতে বলা হয়, আমাদের সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলোর সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার কারণে মার্চে উৎপাদন কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে, বাধাগ্রস্ত হয়েছে রফতানি।চিঠিতে বলা হয়, প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে শ্রমিক-

কর্মচারীদের মার্চের বেতনভাতা নির্বিঘ্নে পরিশোধ করতে পারে, সেজন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে বেতনভাতা প্রদানের বিষয়ে নিয়মনীতি সহজীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা আপনার দপ্তর থেকে দেয়া আবশ্যক। আপত্কালে ব্যাংকগুলো থেকে এমন সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অনুকূলে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছেন বিজিএমইএ সভাপতি।

০৮ এপ্রিল ২০২০,

করোনাকালের দুর্যোগ

এটা কি জ্ঞানহীনতার পরিচয় না—পোশাকশ্রমিক নাজমার প্রশ্নের জবাব কে দেবে

কুর্‌রাতুল-আইন-তাহ্‌মিনা

করোনার কালেও পেটে ভাত দিতে হয়। পেট অনেকগুলো। ‘দেশে’ দুটি ছোট মেয়ে, বুড়ো মা আর শ্বশুর। ঢাকায় নিজে আর স্বামী। ‘কামাইকাজের লোক’ শুধু স্বামী-স্ত্রী দুজন।

দুজন গাজীপুরের টঙ্গী বিসিক শিল্পনগরীতে একই কারখানায় কাজ করেন। গত ৩১ মার্চ কাজের শেষে শ্রমিকদের বেতন দিয়ে কারখানাটি বন্ধ হয়। তাঁরা সেদিনই দেশে চলে যান। চার বছরের মেয়েটি অসুস্থ ছিল, তার জন্য মন পুড়ছিল।

৫ এপ্রিল কারখানা খোলার কথা ছিল। মোসাম্মাত রাবেয়া বেগম সেদিন সকালে স্বামীর সঙ্গে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার নবীনর গ্রাম থেকে টঙ্গী ফিরে আসেন। এসে কারখানা বন্ধ পান।

সেদিনই দুপুর ১২টার দিকে পাগাড় সোসাইটির মাঠ এলাকায় তাঁদের ভাড়া বাসায় আমার সঙ্গে রাবেয়ার দেখা। তিনি তখন উঠানে এজমালি রান্নার চালাঘরে নতুন মাটির চুলা ঠিকঠাক করছেন। খরচাপাতি করে গ্যাসের চুলা কিনেছিলেন। কিন্তু গ্যাস কিনতে পারছেন না।

রাবেয়া অপারেটর, স্বামী প্যাকিং বিভাগে কাজ করেন। ওভারটাইমসহ দুজনে মিলে মাসে কমবেশি ২০ হাজার টাকা আয় করেন। বিদ্যুৎ বিলসহ ঘরভাড়া কখনো ৪ হাজার টাকা ছাড়িয়ে যায়। বাকি টাকায় গ্রামের আর এখানকার দুই সংসার চলে।

রাবেয়া বলেন, আগের রাতে বাস ছিল না। ট্রাকে করে, পায়ে হেঁটে, বহু কষ্টে ফিরেছেন। খরচ পড়েছে ২ হাজার টাকার মতো। রাস্তায় রাস্তায় পুলিশ গাড়ি থামিয়েছে। ড্রাইভার বাড়তি টাকা নিয়েছে। যাওয়ার সময়ও গাড়ির সংকট ছিল, বেশি টাকা লেগেছে।

কারখানার লোকজন ফোনে সবাইকে জানিয়েছে, ৫ তারিখ থেকে আবার খোলা। সুতরাং আসতে হতোই। রাবেয়া বলেন, 'এক দিন অ্যাবসেন্ট করলে যদি আমাদের বাইর কইরা দেয়, তয় তো করার কিছু নাই।'

ছুটি আরও বাড়বে জানলে এখন তাঁরা ফিরতেন না। মার্চের বেতন থেকে বাড়িতে টাকা দিয়েছেন। গাড়িভাড়া দিয়ে হাতে এখন টাকা নেই। রাবেয়া বলেন, 'আর তো খাওয়ার মতো তৌফিক নাই ঘরে।'

টঙ্গীরই পূর্ব গোপালপুর এলাকায় স্বামী আর ছোট ছেলেকে নিয়ে ভাড়া বাসায় থাকেন মোসাম্মাত নাজমা আক্তার। শিল্পনগরীর একটি কারখানায় তিনি কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর। তাঁর স্বামীও পোশাকশ্রমিক।

টিনচালা পাকা ঘরটির দরজায় দাঁড়িয়ে নাজমা বলেন, ২৪ তারিখ জেনেছিলেন, কারখানা ৪ এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। সেটা ছিল করোনাভাইরাস ঠেকাতে সরকারি-বেসরকারি অফিসে সাধারণ ছুটি ঘোষণার প্রথম দফা। তাঁরা তখন বগুড়ার শেরপুরে গ্রামের বাড়িতে চলে যান।

চলতি মাসের শুরুতে ১১ এপ্রিল পর্যন্ত ছুটি বাড়ার ঘোষণা এলে নাজমা ভেবেছিলেন, তাঁদের ছুটিও বাড়বে। তাঁর কথায়, 'একটা মসজিদে যদি ১০০ জন লোক একসঙ্গে যাইতে সরকার থেইকা নিষেধ করা হয়, তাইলে একটা গার্মেন্টসে দুই-তিন হাজার লোক কেমন করে কাজ করবে?'

নাজমা অবশ্য জানতেন, বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছিলেন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে পোশাক কারখানা খোলা রাখা যাবে। তবু তিনি ৩ মার্চ সন্ধ্যা পর্যন্ত তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ, সরকার অথবা কারখানার মালিকের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করেন।

আমাকে নাজমা বলেন, 'অফিসে যোগাযোগ করছি, স্যারেদের সাথে, বসেদের সাথে যে, আমাদের আসলেই ছুটিটা বাড়বে, নাকি নির্ধারিত সময়ে অফিসে যেতে হবে?' তাঁরা তাড়াতাড়ি ফিরতে বলেছেন।

হাজিরা না দিলে নাকি চাকরি চলে যেতে পারে অথবা এ কয়দিনের ছুটি আমলে না নেওয়া হতে পারে। ‘মালিক যদি খোলা রাখে, আর এই সময় যদি চাকরি চলে যায়, এই ভয়ে আমার বাধ্য হয়া, জীবনের ঝুঁকি নিয়াই আসছি’, বলেন নাজমা।

৪ এপ্রিল টঙ্গী ফেরার পর রাতে নাজমা শোনেন, বিজিএমইএ কারখানা বন্ধ রাখতে অনুরোধ করছে। তাঁর প্রশ্ন, ‘এই যে আমাদের একটা ভোগান্তি—গ্রামে যারা ছিল, তারা বাড়িতেই ছিল—লক্ষ লক্ষ মানুষ যে আবার ঢাকা শহরে আইল, এটা কি বিজিএমইএ কিংবা সরকারের একটা জ্ঞানহীনতার পরিচয় না?’

আমি ভাবি, প্রশ্নটা কি নিছক জ্ঞানহীনতার? প্রভাবশালী কারও হেলাফেলা আর স্বার্থচিন্তার চূড়ান্ত প্রকাশও কি এটা নয়?

বাণিজ্যমন্ত্রী পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি। গত প্রায় ২০ দিনে বিজিএমইএ ও নিট পোশাক মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএ একাধিকবার কারখানা খোলা রাখার পক্ষে সায় দিয়েছে। শ্রম মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকেও একাধিকবার এই বার্তা গেছে যে সুরক্ষা পোশাক)পিপিই(, মাস্ক, জীবাণুনাশক ইত্যাদি তৈরি করাসহ জরুরি প্রয়োজনে কড়াকড়িভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কারখানা খোলা রাখতে বাধা নেই।

ইতিমধ্যে সাধারণ ছুটি আরও দুদিন বেড়েছে। অবশেষে মালিকদের সংগঠন দুটিও ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত কারখানা বন্ধ রাখার সুস্পষ্ট যৌথ ঘোষণা দিয়েছে। তবে তারা বলেছে, সংগঠনকে জানিয়ে কেবল পিপিই বানানো আর জরুরি রপ্তানি ক্রয়াদেশের কাজ চলতে পারবে।

যাক। আমরা ধাপে ধাপে সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বিশ্বাসী। আজ মনে হলো এতটুকু করি, কাল মনে হলো কড়াকড়ি আরেকটু বাড়াই। ছুটি বাড়াই দুদিন করে করে। করোনাভাইরাসকে ধাপে ধাপে বরণ করি অথবা অল্পে অল্পে কুলার বাতাস দিয়ে তাড়াতে চাই।

এদিকে করোনা-বন্ধ বা লকডাউন না চললেও রাবেয়া এখন দেশে ফিরতে পারতেন না। মার্চের বেতন শেষ, দোকান বাকি দেবে কি না তা অনিশ্চিত। তিনি বলেন, ‘এই যে বন্ধের পর বন্ধ দিতাছে, সামনের স্যালারি পাব কি না, হের তো কোনো নিশ্চয়তা নাই।’

এসে থেকে শুনছেন, কারখানার কাজের আদেশ বাতিল হয়ে যাচ্ছে। কারখানা চলবে কি না, সেটা জানা তাঁর বড় দরকার। রাবেয়া বলেন, ‘এখন তো আমাদের কিছু করার নাই। আরও অসহায় হইয়ে গেলাম।’

চার-পাঁচ বছর হয় রাবেয়ারা গাজীপুর এসেছেন, ‘শুধু গার্মেন্টস করে খাইতেছি। গার্মেন্টস ছাড়া তো আমাদের কিছু নাই। বাড়ি যায়া করব কী?’ রাবেয়া বলেন, মালিকেরা কী করতে পারেন, সেই আশাতেই থাকতে হবে।

নাজমাও অপেক্ষা করছেন। প্রথমত মার্চের বেতনের জন্য। দ্বিতীয়ত, তিনি শুনেছেন, সরকার তিন মাসের বেতন-ভাতার জন্য সাহায্য দেবে। কীভাবে কখন তা পাবেন, সেটা জানতে চান।

বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ ১৬ এপ্রিলের মধ্যে মার্চের বেতন দিয়ে দিতে সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনুরোধ করেছে। টঙ্গী থেকে ফিরে রাতে ফোনে কথা বলেছিলাম বিজিএমইএর সহসভাপতি আরশাদ জামালের সঙ্গে। তিনি বললেন, বেশির ভাগ কারখানা শ্রম আইনের ১৬-এর ২ ধারায় কাজ বন্ধ করেছে।

এতে শ্রমিকেরা লে-অফের নিয়মে বন্ধের পর ৪৫ দিন পর্যন্ত বেতন-ভাতা পাবেন। বাড়িভাড়া, চিকিৎসাভাতা ও খাদ্যভাতা পুরোপুরি, আর মূল বেতনের অর্ধেক। কারখানা যদি আরও অন্তত ১৫ দিন বন্ধ থাকে, তবে শ্রমিকেরা মূল বেতনের এক-চতুর্থাংশ এবং ভাতাগুলো পাবেন। তবে আইন বলছে, সে ক্ষেত্রে মালিক আইনের ২০ ধারায় প্রাপ্য বুঝিয়ে দিয়ে ছাঁটাইও করতে পারবেন।

আরশাদ জামাল বলছেন, তখন কোনো কারখানা কাজ হারিয়ে পথে বসতে নিলে তেমন ছাঁটাই হতে পারে। তিনি আরও বলছেন, বন্ধ অত দিন গড়ালে কারখানাগুলোর কাজে অন্য রকম জট লেগে যাবে।

মালিকেরা কিন্তু আরও আগে থেকেই এসব সমস্যার কথা বলে সরকারের কাছ থেকে সুবিধা চেয়ে আসছেন। সরকার একাধিক আর্থিক প্রণোদনা ঘোষণাও করেছে। এগুলোর একটি হচ্ছে রাবেয়া নাজমাদের মতো শ্রমিকদের জুন পর্যন্ত তিন মাস বেতন দেওয়ার জন্য বাণিজ্যিক ঋণসুবিধা।এই ঋণ পেতে হলে প্রতিষ্ঠানকে নিয়মিত বেতন দেওয়ার এবং রপ্তানি চলমান থাকার প্রমাণপত্র দেখাতে হবে। ঋণদাতা ব্যাংক সরাসরি বেতনের টাকাটা শ্রমিকের ব্যাংক অথবা

মোবাইলের অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেবে। বেতন ধরা হবে আগের তিন মাসের গড় বেতনের নিরিখে।

কথাবার্তা বলে যা বুঝলাম, শিল্পমালিকেরা এই ঋণ ও বেতন দেওয়ার পথটি খুব সহজ বলে ভাবছেন না। পরিশোধ করতে হবে, সেটা একটা জটিলতা। লে-অফের নিয়মে আধা বেতন নাকি তিন মাসের গড় বেতনের সমপরিমাণ, সে নিয়েও একটা বাহাস লেগে যেতে পারে।

আরেকটা কথা। বদলি বা সাময়িক শ্রমিক, যাঁদের নাম মাস্টাররোলে নেই, তাঁরা কিন্তু এসব কোনো সুযোগের দাবিদার হবেন না। বিশেষক করে তেমন শ্রমিকদের এখনই ছাঁটাই হওয়ার অনেক ঘটনার কথা কানে এল।

টঙ্গীতে বিসিক শিল্পনগরীটি রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক আর বস্ত্র খাতের একটি বড় কেন্দ্র। বড় কারখানার পাশাপাশি ঠিকা ছোট কারখানাতেও অনেক শ্রমিক কাজ করেন। এই কারখানাগুলো বন্ধ হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকবে।

এটা ঠিক যে করোনার আসর মালিকদের রেয়াত দেবে না। তবে সরকারের কাছে দেনদরবার করার পথ তাঁদের সর্বদা খোলা থাকে। রাবেয়া বা নাজমার গলা কার কানেই–বা পৌঁছাবে?

সমকাল

প্রকাশ: ০৭ এপ্রিল ২০২০

১৬ এপ্রিলের মধ্যে পোশাক শ্রমিকদের বেতন

আগামী ১৬ এপ্রিলের মধ্যেই শ্রমিক-কর্মচারীদের মার্চ মাসের বেতন পরিশোধ করা হবে। সোমবার রাতে পোশাক খাতের দুই সংগঠন বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএর এক যৌথ ঘোষণায় এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কারখানা মালিকের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বিজিএমইএর সভাপতি ড. রুবানা হক এবং বিকেএমইএর সভাপতি সেলিম ওসমান যৌথভাবে এই ঘোষণা দেন।

এই ঘোষণায় বিশেষ জরুরি প্রয়োজনে কিছু কারখানা খোলা রাখার সুযোগ রাখা হয়েছে। যে সব কারখানায় জরুরি রপ্তানি আদেশের কাজ রয়েছে এবং যে সব কারখানায় করোনা থেকে সুরক্ষাসামগ্রী পিপিই, মাস্ক তৈরি হচ্ছে সে সব কারখানা বিশেষ ব্যবস্থায় খোলা রাখা যাবে।

তবে খোলা রাখার জন্য শ্রম মন্ত্রণালয়ের কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডিআইএফই) এবং স্ব স্ব সংগঠন বিজিএমইএ কিংবা বিকেএমইএর অনুমতি নিতে হবে।

প্রথম আলো

০৬ এপ্রিল ২০২০

পোশাক কারখানা বন্ধ করতে চাননি কেউই

শনিবার সকাল থেকে রাজধানী অভিমুখে ছিল শ্রমজীবী মানুষের ঢল। তাঁদের অধিকাংশ ছিল পোশাক কারখানার শ্রমিক। রোববার কারখানা খুলবে, তাই যে যেভাবে পেরেছে গন্তব্যে পৌঁছার চেষ্টা করেছে। ছবি: প্রথম আলো

করোনার ঝুঁকির মধ্যেও পোশাক কারখানা বন্ধ করতে চাননি শিল্পমালিকেরা। তাতে সায় ছিল সরকারেরও। মূলত মালিকদের পাশাপাশি সরকারের শ্রম এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্তহীনতা ও সমন্বয়হীনতার কারণেই ভয়াবহ পরিস্থিতির তৈরি হয়েছে। সামাজিক দূরত্ব না মেনে ঝুঁকি নিয়ে হাজার হাজার শ্রমিক ঢাকা ও আশপাশের শিল্পাঞ্চলে ফিরেছেন। এমনকি হাতে গোনা কয়েকটি ছাড়া অধিকাংশ শ্রমিক সংগঠনের নেতারা করোনার এই দুর্যোগে কারখানা বন্ধ রাখার বিষয়ে জোরালো দাবিই করেননি।

শনিবার সকাল থেকে রাজধানী অভিমুখে ছিল শ্রমজীবী মানুষের ঢল। তাঁদের অধিকাংশ ছিল পোশাক কারখানার শ্রমিক। রোববার কারখানা খুলবে, তাই যে যেভাবে পেরেছে গন্তব্যে পৌঁছার চেষ্টা করেছে। গণমাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের কর্মস্থলে ফেরার চিত্র দেখে সমালোচনার ঝড় ওঠে। সারা দেশের মানুষকে স্বাস্থ্যঝুঁকিতে ফেলে দেওয়ার জন্য পোশাকশিল্প মালিকদের কঠোর সমালোচনা করেন অনেকেই। দিনভর এই আলোচনা-সমালোচনার পর তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ রাত পৌনে ১০টায় কারখানা বন্ধ রাখতে সদস্যদের প্রতি

অনুরোধ করে। বিকেএমইএ কারখানা বন্ধের সিদ্ধান্ত দেয় রাত ১২টায়। এরপর গতকাল রোববার ঢাকায় প্রবেশ ও ঢাকা থেকে বের হওয়ার সব পথ বন্ধ করে দেয় পুলিশ।

গত ১৫ দিনে যা ঘটেছে

অনেকেই প্রশ্ন করেছেন কেন এ রকম হলো। জানা গেছে, গত ২১ মার্চ শ্রম ভবনে শ্রম প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ানের সভাপতিত্বে সরকার, মালিক ও শ্রমিকপক্ষের ত্রিপক্ষীয় সভা হয়। তাতে বিজিএমইএর বর্তমানে ও সাবেক দুই সভাপতি, বিকেএমইএর সভাপতি ও একজন সহসভাপতি, জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতিসহ শ্রম মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ছিলেন। সভায় অধিকাংশ পোশাকশিল্প মালিক প্রতিনিধি ও জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি কারখানা খোলা রাখার বিষয়ে তাঁদের মতামত দেন। তবে কারখানা খোলা বা বন্ধের বিষয়ে কথা বলার চেয়ে সভায় সংকট মোকাবিলায় মালিকেরা সরকারের কাছে আর্থিক অনুদান, প্রণোদনার অর্থ ছাড় করার বিষয়ে বেশি উচ্চকিত ছিলেন। সভা শেষে বিকেএমইএর একজন নেতা বলেন, শ্রমিকেরা যে পরিবেশে বসবাস করেন, তার চেয়ে কারখানা পরিবেশ অনেক ভালো। তা ছাড়া করোনা প্রতিরোধে প্রতিটি কারখানায় হাত ধোয়াসহ অন্যান্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেন।

পরদিন শ্রম ভবনে ২১টি শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে বৈঠক করেন শ্রম প্রতিমন্ত্রী। সেখানে ৯টি শ্রমিক সংগঠনের নেতারা করোনা প্রতিরোধে কারখানা বন্ধের দাবি জানান। তবে এর বিরোধিতা করে ১১টি সংগঠন। তখন শ্রম প্রতিমন্ত্রী জানিয়ে দেন, আপাতত কারখানা চলবে। আর কারখানা বন্ধের বিষয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান।

বৈঠকের দুই দিন পর কয়েকজন প্রভাবশালী পোশাকশিল্প মালিক জানান, তাঁরা কারখানা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত দেবেন না। তাঁরা চাইছেন সরকারের ওপর মহল থেকে ঘোষণা আসুক। তাতে মালিকদের দাবিদাওয়া আদায়ে কিছুটা সুবিধা হবে, এমন ইঙ্গিত দেন দু-একজন মালিক। সে কারণে ২৩ মার্চ সরকারের তরফ থেকে ১০ দিনের সাধারণ ছুটি ঘোষণা দিলেও মালিকদের দুই সংগঠন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ চুপ ছিল। সেদিন অবশ্য সংগঠন দুটির নেতারা বলেন, ভাষণে প্রধানমন্ত্রী যে নির্দেশনা দেবেন, সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ২৫ মার্চ জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে পোশাকসহ রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মজুরি দিতে ৫ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী। মালিকদের দুই সংগঠনই তাৎক্ষণিকভাবে এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায়।

সরকারের দেওয়া ছুটি শুরু হলে বিজিএমইএ ২৬ মার্চ কারখানা বন্ধ রাখতে সদস্যদের প্রতি অনুরোধ জানায়। পরদিন বিকেএমইএ একই রকম নির্দেশনা দেয়। তবে বিজিএমইএর সিদ্ধান্তে প্রভাবশালী কয়েকজন পোশাকশিল্প মালিক ক্ষুব্ধ হোন। তাঁরা সরকারের ওপর মহলকে বোঝানোর চেষ্টা করেন, কারখানা বন্ধ রাখলে পোশাক রপ্তানি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অবশ্য ২৬ মার্চ পর্যন্ত ৯৫৯ কারখানার ২৬৭ কোটি ডলারের পোশাকের ক্রয়াদেশ বাতিল ও স্থগিত হওয়ার তথ্য জানানো হয়য়।

গত ২৮ মার্চ শ্রম মন্ত্রণালয়ের কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডিআইএফই) এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, যেসব কারখানায় ক্রয়াদেশ আছে ও করোনা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় সামগ্রী পিপিই, মাস্ক, গ্লাভস, স্যানিটাইজার, ওষুধ ইত্যাদি উৎপাদন করছে, সেসব কলকারখানা বন্ধে সরকার কোনো নির্দেশনা দেয়নি। এই বিজ্ঞপ্তির পরপরই বিজিএমইএ নিজেদের অবস্থান থেকে কিছুটা সরে আসে। তারা ডিআইএফইর নির্দেশনা মানতে সংগঠনের সদস্য পোশাক কারখানা মালিকদের প্রতি অনুরোধ জানায়।

সমকাল

প্রকাশ: ২৬ মার্চ ২০২০

পোশাক শ্রমিকদের জন্য ঘোষিত টাকা তাদের ব্যাংক হিসাবে দিন :সিপিবি

প্রধানমন্ত্রীর জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে পোশাক শ্রমিকদের জন্য ঘোষিত বেতনবাবদ বরাদ্দকৃত পাঁচ হাজার কোটি টাকা করাখানা মালিকদের কাছে হস্তান্তর না করে সরাসরি শ্রমিক-কর্মচারীদের ব্যাংক হিসাবে জমা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)।বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে সিপিবি'র সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ শাহ আলম এই আহ্বান জানান। তারা বলেন, প্রধামন্ত্রীর বরাদ্দকৃত অর্থ সরাসরি শ্রমিক-কর্মচারীদের ব্যাংক হিসাবে জমা না দেওয়া হলে এ অর্থ প্রকৃত ভুক্তভোগীদের কাছে পৌঁছানোর সম্ভাবনা কম। শ্রমিকদের অর্থ যেন কেউ তসরুফ করতে না পারে সেদিকেও সরকারকে নজরদারি করতে হবে।আরেক বিবৃতিতে সিপিবি নেতারা করোনার মহাবিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে সম্ভাব্য ডেঙ্গু-চিকুনগুনিয়ার প্রাদুর্ভাব মোকাবিলার প্রস্তুতি শুরু করতে ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের মেয়রদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বিজ্ঞপ্তি।

প্রথম আলো

০৯ এপ্রিল ২০২০

দরিদ্রের জমা টাকায় টান দিয়েছে করোনা

কিছুদিন আগে রূপনগর বস্তিতে লেগেছে আগুন। এতে অনেকের ঘরবাড়ি পুড়ে হারিয়েছেন সবকিছু। এখন নেই কোনো উপার্জনের পথ। তীব্র কষ্টে দিন কাটাচ্ছে বস্তিবাসী। ছবিটি গতকাল তোলা। ছবি: সাজিদ হোসেন।

বাতাসে এখনো পোড়া গন্ধ। প্রান্তরজুড়ে ছড়িয়ে আছে আধপোড়া টিন, বাঁশের খুঁটি আর কয়লা হয়ে যাওয়া আসবাব। মাসখানেক আগেই রূপনগর আবাসিক এলাকার ঝিলপাড় বস্তিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে না–উঠতেই সেখানকার বাসিন্দাদের জীবন-জীবিকার সামনে রীতিমতো হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব।

বৈশ্বিক মহামারিতে রূপ নেওয়া করোনাভাইরাসের কারণে ঢাকা এখন কার্যত অচল। সেই সঙ্গে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন এই মহানগরের প্রান্তিক বাসিন্দারা। যাঁদের বেশির ভাগের বসবাস ঝিলপাড়ের মতো শহরের আনাচকানাচে গড়ে ওঠা বস্তিগুলোতে। তবে অন্য বস্তিগুলোতে বাসিন্দাদের মাথা গোঁজার শেষ আশ্রয়টুকু থাকলেও ঝিলপাড়ের চিত্র ভিন্ন। এখনো এই বস্তির বাসিন্দাদের অনেকের দিন-রাত কাটছে খোলা আকাশের নিচে ত্রিপল কিংবা পলিথিনে ঘেরা ছাউনিতে।

গত ১১ মার্চ ঝিলপাড় বস্তির পশ্চিম অংশে সংঘটিত এই অগ্নিকাণ্ডে কয়েক শ ঘর পুড়ে যায়। ফায়ার সার্ভিসের ২৫টি ইউনিট তিন ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এতে কোনো প্রাণহানির ঘটনা না ঘটলেও সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েন ঘরপোড়া বেশির ভাগ বাসিন্দা। এই ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে অনেকে চড়া সুদে বিভিন্ন এনজিও থেকে ঋণ নেন। কেউ কেউ টাকা ধার করেন নিকটাত্মীয়ের কাছ থেকে। কিন্তু প্রায় একই সময়ে করোনার প্রাদুর্ভাবের কারণে রোজগারের পথ একেবারেই বন্ধ হয়ে পড়ায় তাঁরা কীভাবে ঋণের টাকা শুধবেন, কীভাবেই–বা পরিবার-পরিজনের নিত্যকার খাবারের চাহিদা মেটাবেন, তা ভেবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

কিছুদিন আগে রূপনগর বস্তিতে লেগেছে আগুন। এতে অনেকের ঘরবাড়ি পুড়ে হারিয়েছেন সবকিছু। এখন নেই কোনো উপার্জনের পথ। তীব্র কষ্টে দিন কাটাচ্ছে বস্তিবাসী। ছবিটি গতকাল তোলা। ছবি: সাজিদ হোসেন।

বাতাসে এখনো পোড়া গন্ধ। প্রান্তরজুড়ে ছড়িয়ে আছে আধপোড়া টিন, বাঁশের খুঁটি আর কয়লা হয়ে যাওয়া আসবাব। মাসখানেক আগেই রূপনগর আবাসিক এলাকার ঝিলপাড় বস্তিতে ভয়াবহ

অগ্নিকাণ্ডের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে না–উঠতেই সেখানকার বাসিন্দাদের জীবন-জীবিকার সামনে রীতিমতো হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব।

বৈশ্বিক মহামারিতে রূপ নেওয়া করোনাভাইরাসের কারণে ঢাকা এখন কার্যত অচল। সেই সঙ্গে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন এই মহানগরের প্রান্তিক বাসিন্দারা। যাঁদের বেশির ভাগের বসবাস ঝিলপাড়ের মতো শহরের আনাচকানাচে গড়ে ওঠা বস্তিগুলোতে। তবে অন্য বস্তিগুলোতে বাসিন্দাদের মাথা গোঁজার শেষ আশ্রয়টুকু থাকলেও ঝিলপাড়ের চিত্র ভিন্ন। এখনো এই বস্তির বাসিন্দাদের অনেকের দিন-রাত কাটছে খোলা আকাশের নিচে ত্রিপল কিংবা পলিথিনে ঘেরা ছাউনিতে।

গত ১১ মার্চ ঝিলপাড় বস্তির পশ্চিম অংশে সংঘটিত এই অগ্নিকাণ্ডে কয়েক শ ঘর পুড়ে যায়। ফায়ার সার্ভিসের ২৫টি ইউনিট তিন ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এতে কোনো প্রাণহানির ঘটনা না ঘটলেও সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েন ঘরপোড়া বেশির ভাগ বাসিন্দা। এই ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে অনেকে চড়া সুদে বিভিন্ন এনজিও থেকে ঋণ নেন। কেউ কেউ টাকা ধার করেন নিকটাত্মীয়ের কাছ থেকে। কিন্তু প্রায় একই সময়ে করোনার প্রাদুর্ভাবের কারণে রোজগারের পথ একেবারেই বন্ধ হয়ে পড়ায় তাঁরা কীভাবে ঋণের টাকা শুধবেন, কীভাবেই–বা পরিবার-পরিজনের নিত্যকার খাবারের চাহিদা মেটাবেন, তা ভেবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

গতকাল বেলা ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত এই বস্তির অনেক বাসিন্দার সঙ্গে কথা হয় এই প্রতিবেদকের। তাঁদের অসহায় চাহনিই বলে দিচ্ছিল করোনার কারণে সৃষ্ট সংকটের কথা। তাঁদের অনেকের ঘরেই গত কয়েক দিনে হাঁড়ি চড়েনি। এত দিন জমানো যা সামান্য ছিল, তা শেষ হয়ে গেছে। এখন ত্রাণ আর চেয়ে নেওয়া সাহায্যে কোনোরকমে দিন কাটছে।

এদিন রূপনগর আবাসিকের ৯ নম্বর সড়কের শেষ প্রান্তে বস্তিতে ঢোকার মুখে কথা হয় ষাটোর্ধ্ব রওশন আরা বেগমের সঙ্গে। জানান, তিনি ও তাঁর মেয়ে বাসাবাড়িতে কাজ করে কোনোরকমে সংসারের হাল ধরে রেখেছিলেন। ঘরে দুই নাতির এখনো কাজ করে খাওয়ার বয়স হয়নি। আর বয়সজনিত নানা রোগে আক্রান্ত স্বামী কোনো কাজ করতে পারেন না। এই অবস্থায় আগুনে পুড়ে যাওয়া ঘর নতুন করে তুলতে তাঁরা একটা এনজিও থেকে ৩০ হাজার টাকা ঋণ নেন। কিন্তু এখন মা-মেয়ের দুজনেরই কাজ বন্ধ। রওশন আরা বেগম বলেন, ‘যে ট্যাকা ঋণ নিছিলাম, তা সব ঘরের পিছে ঢালছি। হাতে এখন কিছুই নাই। নিজেরা কষ্ট কইর্যা থাকলেও দুই নাতির মুখে তো কিছু দেওয়া লাগে। এখনই দিন চলে না, সামনের দিনে কী হইব ভাইবা পাই না।’

রূপনগর বস্তির আগুনে সব হারানোর পর এখন করোনাভাইরাসের কারণে বন্ধ হয়ে গেছে উপার্জনের পথ। ফলে কষ্টে আছে এই খেটে খাওয়া মানুষেরা। ছবিটি গতকাল তোলা। ছবি: সাজিদ হোসেন।

বস্তির আরেক বাসিন্দা মফিজুরেরও বিপদের শেষ নেই। তিনি রূপনগরের একটা প্লাস্টিক কারখানায় কাজ করতেন। করোনার কারণে গত মাসের ২৪ তারিখ থেকে কাজ বন্ধ। এদিকে ঘরে আগুন লাগার আগে গত বছরের অক্টোবর মাসে গ্যাস বেলুনের সিলিন্ডার বিস্ফোরণে একমাত্র ছেলে মুস্তাকিনের ডান চোখ গলে যায়। ছেলের চিকিৎসার খরচ মেটাতে শেষ সম্বল গ্রামের ভিটেটুকুও বিক্রি করে দেন তিনি। এখন সব হারানো কর্মহীন এই বাবা অসহায় কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'শহরে কাজ বন্ধ। বাড়ি ফেরার উপায়ও নাই। খায়া না–খায়া দিন কাটতাছে। পোলাডার মুখের দিকে চাইতে পারি না। আগুন লাগার পর করোনা আইলেও অনেকে টুকটাক সাহায্য পাইছে। আমি তা–ও পাই নাই। এখন তো চোখে অন্ধকারও দেখি না।'

একইভাবে বস্তির ভেতর বাবুল সরদার নামের আরেক ব্যক্তির পোড়া ঘরের কাছে গিয়ে দেখা গেল, চুলায় ভাত ফুটছে। তরকারি আছে কেবল মিষ্টিকুমড়া। উদাম গায়ে ছোট পাঁচটি ছেলেমেয়ে অপলক চেয়ে আছে চুলায় ফুটতে থাকা ভাতের দিকে। সিটি করপোরেশনের সাবেক পরিচ্ছন্নতাকর্মী বাবুল সরদার জানালেন, কয়েক বছর আগে স্বাস্থ্যগত কারণে তাঁর চাকরি চলে যায়। ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়ে বস্তিতে ঘর তুলেছিলেন। কাজ নিয়েছিলেন একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে। এখন কাজ নেই, ঘরও নেই। সকালে এক ব্যক্তি পাঁচ কেজি চাল দিয়েছেন। সেটাই চুলায় চড়িয়েছেন স্ত্রী। কাল কী হবে, তা আর জানা নেই বাবুল সরদারের।

প্রথম আলো

০৮ এপ্রিল ২০২০

পোশাক কারখানার তহবিলের টাকায় কর্মকর্তাদের বেতন নয়

সচল রপ্তানিমুখী কারখানার শ্রমিকদের বেতন দিতে যে পাঁচ হাজার কোটি টাকার তহবিল গঠন করা হয়েছে, তা থেকে কোনোভাবেই কর্মকর্তাদের বেতন দেওয়া যাবে না। বাংলাদেশ ব্যাংক আজ এক প্রজ্ঞাপনে ব্যাংগুলোকে এ নির্দেশনা দিয়েছে। আগের দেওয়া নীতিমালায় বিষয়টি স্পষ্ট না থাকায় আজ নতুন করে নির্দেশনা দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।এতে আরও বলা হয়েছে, এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার জন্য জাতীয় পরিচয়পত্রের

পাশাপাশি জন্মনিবন্ধন সনদও ব্যবহার করা যাবে। শ্রমিকদের বেতনের টাকা সরাসরি তাঁদের ব্যাংক হিসাব বা মোবাইল ব্যাংকিং হিসাবে পাঠাতে হবে। বেতন দিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়ার পর ব্যাংকগুলো প্রযোজ্য হলে আয়কর ও ভবিষ্য তহবিলের টাকা কেটে বাকি টাকা বেতন হিসাবে শ্রমিকের হিসাবে পাঠাবে। প্রতিটি ব্যাংককে বেতন প্রদানের জন্য শ্রমিকদের একটি ডেটাবেইস তৈরি করতে হবে।রপ্তানিমুখী কারখানার শ্রমিকদের বেতন দিতে পাঁচ হাজার কোটি টাকার তহবিল গঠন করেছে সরকার। ওই তহবিল পরিচালনার নীতিমালা দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। নীতিমালা অনুযায়ী, বেতনের টাকা সরাসরি শ্রমিকের হিসাবে পাঠিয়ে দেবে ব্যাংকগুলো। যাঁদের হিসাব নেই, তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) ও জন্মনিবন্ধন সনদের ভিত্তিতে মোবাইল ব্যাংকিং হিসাব (এমএফএস) খোলার উদ্যোগ নিতে হবে। শ্রমিকেরা চাইলে বিনা মাশুলে ব্যাংক হিসাবও খুলতে পারেন। ২০ এপ্রিলের মধ্যে সব শ্রমিকের হিসাব খোলা সম্পন্ন করতে বলেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বেতনের টাকা যেন সরাসরি শ্রমিকেরা পান, এ জন্যই এ উদ্যোগ।

প্রথম আলো
০৮ এপ্রিল ২০২০

কাঁচামাল খালাসের সুযোগ চান শিল্পমালিকেরা

দেশের নৌবন্দরে শিল্পের কাঁচামাল নিয়ে আটকে থাকা মাদার ভেসেল ও লাইটার জাহাজ থেকে পণ্য খালাসের সুযোগ চান শিল্পমালিকেরা। তাঁরা বলছেন, করোনা পরিস্থিতির কারণে দেশের বিভিন্ন বন্দরে শিল্পের কাঁচামাল নিয়ে কিছু মাদার ভেসেলের পাশাপাশি পাঁচ শতাধিক লাইটার ভেসেল আটকে আছে। প্রশাসনিক বাধা ও শ্রমিক স্বল্পতার কারণে কয়েক লাখ টন আমদানি করা কাঁচামাল খালাস করা যাচ্ছে না।শিল্পমালিকেরা বলছেন, একদিকে মাদার ভেসেল আটকে থাকায় আন্তর্জাতিক নৌ আইন অনুযায়ী বাড়তি মাশুল গুনতে হচ্ছে। অন্যদিকে পাঁচ শতাধিক লাইটার ভেসেল কাঁচামাল নিয়ে আটকে থাকায় জরুরি প্রয়োজনে নদীপথে জরুরি পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে জাহাজসংকট তৈরি হতে পারে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিসিএমএ) সভাপতি মো. আলমগীর কবির বলেন, শুধু শিল্পের কথা চিন্তা করে নয়, দেশের প্রয়োজনীয় মুহূর্তে যাতে মাদার ভেসেল ও লাইটার ভেসেলগুলো ব্যবহার করা যায়, সেই বিবেচনায় হলেও আটকে পড়া ভেসেলগুলো থেকে

কাঁচামাল খালাসের সুযোগ দেওয়া উচিত। সামনে রমজান আসছে। এ সময় খাদ্যপণ্যের বাড়তি চাহিদা তৈরি হয়। তখন পণ্য পরিবহনে জাহাজের চাহিদাও বাড়বে।

আলমগীর কবির আরও বলেন, সরকার কাঁচামাল খালাসের অনুমতি দিলে স্বাস্থ্যবিধি মেনেই খালাসের ব্যবস্থা করা হবে।

বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী
০৯, ২০২০

বিশেষ তহবিলের নীতিমালায় সংশোধন

এনআইডি না থাকলে জন্মনিবন্ধন সনদে মিলবে বেতন-ভাতা

রফতানিমুখী শিল্পের শ্রমিকদের বেতন-
ভাতা পরিশোধের জন্য গঠিত ৫ হাজার কোটি টাকার বিশেষ তহবিলের নীতিমালায় সংস্কার এনে ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, যেসব শ্রমিক-
কর্মচারীর জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) নেই, বিশেষ বিবেচনায় তাদের জন্মনিবন্ধন সনদের ভিত্তিতে বেতন
ভাতা পরিশোধ করা যাবে। গতকাল কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ নির্দেশনা দেয়া হয়। প্রজ্ঞাপনে বিশেষ তহবিল থেকে নেয়া ঋণের বিষয়ে আরো কয়েকটি শর্ত যুক্ত করা হ য়েছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক শিল্পপ্রতিষ্ঠান যে ব্যাংকের মাধ্যমে তাদের শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-
ভাতা প্রদান করে, সে ব্যাংকের কাছে ওই ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবে। কোনো শিল্পপ্রতি ষ্ঠান একাধিক ব্যাংকের মাধ্যমে শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-
ভাতা প্রদান করলে সেক্ষেত্রে ওই বেতন-
ভাতার বিপরীতে ঋণের জন্য সংশ্লিষ্ট একাধিক ব্যাংকের কাছে আবেদন করতে পারবে। এক্ষেত্রে শিল্পপ্রতিষ্ঠান চাইলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোর সমন্বয়ে সিন্ডিকেটেড ঋণ গ্রহণের জন্যও আবেদন করতে পারবে।

শিল্পপ্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ মঞ্জুর হওয়ার পর ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক কর্তনযোগ্য আয়কর ও ভ বিষ্য তহবিলের চাঁদা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট বেতন-ভাতা শ্রমিক-
কর্মচারীদের ব্যাংক হিসাব বা এমএফএস হিসাবে সরাসরি স্থানান্তর করবে। পরে ব্যাংক নিজ উ দ্যোগে কর্তনকৃত আয়কর নিয়ম অনুযায়ী সরকারি কোষাগারে জমা করে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা প্র তিষ্ঠানকে চালানের কপি সরবরাহ করবে। ভবিষ্য তহবিলের চাঁদা ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট হিসাবে স্থানান্তর করতে হবে। এক্ষেত্রে নগদ অর্থে কোনো লেনদেন করা যাবে না। বিশেষ তহবি

ল থেকে কোনোভাবেই শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের বেতন-
ভাতা দেয়া যাবে না বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে।

The Financial Express

REUTERS | Published: April 09, 2020

Coronavirus crisis could plunge half a billion people into poverty: Oxfam

The fallout from the coronavirus spread that has killed more than 83,000 people and wreaked havoc on economies around the world could push around half a billion people into poverty, Oxfam said on Thursday.

The report released by the Nairobi-based charity ahead of next week's International Monetary Fund (IMF)/World Bank annual meeting calculated the impact of the crisis on global poverty due to shrinking household incomes or consumption.

"The economic crisis that is rapidly unfolding is deeper than the 2008 global financial crisis," the report found.

"The estimates show that, regardless of the scenario, global poverty could increase for the first time since 1990," it said, adding that this could throw some countries back to poverty levels last seen some three decades ago.

The report authors played through a number of scenarios, taking into account the World Bank's various poverty lines - from extreme poverty, defined as living on $1.90 a day or less, to higher poverty lines of living on less than $5.50 a day.

Under the most serious scenario - a 20 per cent contraction in income - the number of people living in extreme poverty would rise by 434 million people to 922 million worldwide. The same scenario would see the number of people living below the $5.50 a day threshold rise by 548 million people to nearly 4.0 billion.

Women are at more risk than men, as they are more likely to work in the informal economy with little or no employment rights.

"Living day to day, the poorest people do not have the ability to take time off work, or to stockpile provisions," the report warned, adding that more than 2.0 billion informal sector workers worldwide had no access to sick pay.

The World Bank last week said poverty in East Asia and the Pacific region alone could increase by 11 million people if conditions worsened.

To help mitigate the impact, Oxfam proposed a six-point action plan that would deliver cash grants and bailouts to people and businesses in need, and also called for debt cancellation, more IMF support, and increased aid. Taxing wealth, extraordinary profits, and speculative financial products would help raise the funds needed, Oxfam added.

Calls for debt relief have increased in recent weeks as the fallout from the COVID-19 pandemic has roiled developing nations around the world.

In total, governments around the world would need to mobilise at least $2.5 trillion to support developing nations.

“Rich countries have shown that at this time of crisis they can mobilize trillions of dollars to support their own economies,” the report said.

“Yet unless developing countries are also able to fight the health and economic impacts the crisis will continue and it will inflict even greater harm on all countries, rich and poor.”

The Financial Express

FE ONLINE REPORT | : PublishedApril 10, 2020

RMG factories to remain closed until April 25

The readymade garment (RMG) factories would remain closed until April 25 in line with extended public holidays in a bid to slow the spread if corona virus.

The Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) and Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) announced the decision in a joint statement on Friday.

"If any factory office remains open to disburse wages and other payments during the period, the factory authorities will have to inform the respective trade bodies and industrial police about this," the statement added.

The Financial Express

Published: April 10, 2020

Asia's clothing makers give stark coronavirus warning

"If our workers don't die from coronavirus, they'd die of starvation."This is the stark assessment of how the pandemic is impacting the clothing industry from garment factory owner, Vijay Mahtaney, the chairman of Ambattur Fashion India.

In normal times, Vijay Mahtaney and his partners Amit Mahtaney and Shawn Islam employ a total of 18,000 workers in three countries - Bangladesh, India and Jordan. But the outbreak has forced them to shut down the majority of the business, with just one factory, in Dhaka, partially operational.

Coronavirus lockdowns aren't the only thing affecting their ability to pay their workers. They say their main problem is unreasonable demands from big clients - mainly in the US and the UK.

"Some brands are showing a true sense of partnership and high level of ethics in trying to ensure at least enough cash flow to pay workers," Amit Mahtaney, the chief executive of Tusker Apparel Jordan, told the BBC.

"But we've also experienced demands for cancellations for goods that are ready or are work in progress, or discounts for outstanding payments and for goods in transit. They are also asking for a 30 to 120 day extensions on previously agreed payment terms."

In an email obtained by the BBC, one US retailer has asked for a 30 per cent discount "for all payables - current or order", including those already delivered.

The reason they cite is to "get through this extraordinary period".

"Their attitude is one of protecting only shareholder value without any regard to the garment worker, behaving in a hypocritical manner, showing complete disregard to their ethos of responsible sourcing," Vijay Mahtaney said.

"Brand focus on share price, now means some of them don't have money for this rainy day, and are coming to the weakest link in the supply chain, asking us to help them out when they could be applying for a bailout from the US government stimulus package," Vijay added.

It comes as garment manufacturers have been hit hard by two major issues related to coronavirus lockdowns.

The problems started in February when factories couldn't get the raw materials they needed from China, the world biggest exporter of textiles, which accounted for some $118bn (£67bn) in 2018.

Then as China's textile factories reopened in recent weeks - giving garment manufacturers hopes of getting operations back on track - demand collapsed as retailers were forced to shut their doors after governments around the world imposed lockdowns.

Crucial industry

China may be known as the factory of the world, but when it comes to clothes, Bangladesh, Indonesia, Cambodia, Vietnam and Myanmar play a growing role.

"Garment manufacturing has been diversifying away from China for around ten years due to China's high costs," according to Stanley Szeto of apparel maker Lever Style which supplies premium brands including Hugo Boss, Theory, Vince, and Coach, as well as online names like Bonobos, Stitch Fix and Everlane.

It means that garment manufacturing is a crucial industry for many of Asia's developing economies, with World Trade Organization data showing that Bangladesh and Vietnam are amongst the world's four largest exporters of clothing. Bangladesh now accounts for 6.7 per cent of market share, followed by Vietnam with 5.7 per cent.

Bangladesh has more than four million garment workers, and textile and apparel products made up more than 90 per cent of the country's exports last year.

Cambodia and Sri Lanka also rely on the industry for more than 60 per cent of their exports, according to Sheng Lu at the University of Delaware's department of fashion and apparel studies.

The industry accounts for more than half of all manufacturing jobs in Bangladesh, and 60 per cent in Cambodia, with production being a particularly important employer of women.

Associate Professor Lu thinks the coronavirus pandemic could see countries such as Bangladesh, Vietnam, Cambodia and India cutting between 4 per cent to 9 per cent of garment sector jobs.

That is partly why the Bangladeshi government is trying to help the industry.

"It has offered a generous stimulus package to subsidise wages, convert loans to long-term debt and offer very reasonable interest rates," said Shawn Islam, managing director of Sparrow Apparel Bangladesh. "While it's not enough to weather the storm, it will help."

The Cambodian government has also announced tax holidays for textile factories and proposed a wage subsidy scheme for workers.

That is because this outbreak could result in a longer term impact like labour shortages, price increases of raw materials and a lack of production capacity, said Associate Professor Lu.

After growing criticism and pressure, some brands including H&M and Zara-owner Inditex have committed to paying in full for existing orders from clothing manufacturers.

"Brands have profited for many years from producing in low wage countries without social security systems and have in many cases built up huge empires through this business model," said Dominique Muller of Labour Behind the Label. "Decades of exploitation must now be paid back to care for their workers."

Factory owner Amit Mahtaney agrees.

"Retailers have to help out. Richer governments' bailouts of the industry are also critical," he said.

Without it, he claims, the industry could be wiped out completely.

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন
প্রকাশ : ১০ এপ্রিল, ২০২০

পোশাক কারখানা ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে আগামী ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত সরকারি-বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেছে সরকার। সরকারি ছুটির সঙ্গে সমন্বয় করে দেশের সব পোশাক কারখানা আগামী ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছে মালিকদের দুই সংগঠন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ। শুক্রবার গণমাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছেন বিকেএমইএ সভাপতি একেএম সেলিম ওসমান এমপি ও বিজিএমইএ সভাপতি ড. রুবানা হক। যৌথ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মহামারী করোনাভাইরাসের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরকারের ছুটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএর সদস্য প্রতিষ্ঠান সমূহ আগামী ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এ সময়ের মধ্যে বেতন দেওয়ার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের অফিস খোলা রাখার প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে নিজ নিজ এসোসিয়েশন এবং শিল্প পুলিশকে জানাতে হবে।

বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

এপ্রিল ০৯, ২০২০

স্বাস্থ্যবিধি মেনে কৃষি শ্রমিকদের হাওড়ে চলাচল নির্বিঘ্ন করার অনুরোধ

হাওড় এলাকায় বোরো ধান কাটার সময় হয়েছে। এ সময়ে উত্তরবঙ্গসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কৃষিশ্রমিকরা হাওড় এলাকায় আসতে শুরু করবেন। ধান কাটা মাড়াইয়ের এ শ্রমিকদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে হাওড় এলাকায় আগমন ও চলাচল নির্বিঘ্ন করতে সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানিয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয়।

আজ বৃহস্পতিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে ধান কাটাসহ সারাদেশে কৃষি উৎপাদন ও বিপণন অব্যাহত রাখতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়ন ও অনুসরণ করতে বলেছে কৃষি মন্ত্রণালয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, হাওড় এলাকায় ধান কাটা ও চলাচলকালে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঝুঁকি হ্রাসে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নিজের, কৃষকের ও শ্রমিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সরকারের নির্দেশনাগুলো যথাযথভাবে পালন করবেন।

উল্লেখ্য, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যানুসারে সারাদেশে এবছর বোরো ধান উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ২ কোটি ৪ লাখ ৩৬ হাজার টন। এ লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ২০ ভাগের যোগান দেয় হাওড়াঞ্চল। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসাব মতে, এবার হাওড়ের সাত জেলায় (কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়) বোরো আবাদ হয়েছে ৯ লাখ ৩৬ হাজার হেক্টর জমিতে এবং শুধু হাওড়ে ৪ লাখ ৪৫ হাজার হেক্টর জমিতে। হাওড়াঞ্চলে বোরো ধান উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩৭ লাখ ৪৫ হাজার টন।

বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

এপ্রিল ০৯, ২০২০

পায়রা তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রে বাংলাদেশী শ্রমিক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে পটুয়াখালীর পায়রা তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রে বাংলাদেশী শ্রমিক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। গতকাল থেকে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা ব লবৎ থাকবে বলে জানিয়েছে তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র কর্তৃপক্ষ।

পায়রা তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্বাহী প্রকৌশলী রেজওয়ান ইকবাল খান জানান, পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রতিদিন ১ হাজার ৭০০ বাংলাদেশী শ্রমিক কাজ করেন। গতকাল থেকে প্লান্টের ভেতরে এ শ্রমিকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। প্লান্টের ভেতরে বর্তমানে ১ হাজার ৩০০ চীনা নাগরিক কর্মরত। তারা মেডিকেল টিমের পর্যবেক্ষণে সুস্থ রয়েছেন।

তিনি আরো জানান, বাংলাদেশী শ্রমিকদের ভেতরে কাজের জন্য প্রবেশাধিকার বন্ধ থাকলেও কেন্দ্র থেকে জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাসহ অভ্যন্তরীণ অপারেশনাল কার্যক্রম চলবে। প্রতিদিন এ কেন্দ্র থেকে ৪৫০-৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হয়।

যুগান্তর

যুগান্তর রিপোর্ট ০৯ এপ্রিল ২০২০

করোনাভাইরাস মহামারী

কাজ না করলেও শতভাগ বেতন পাবেন সিঙ্গাপুরের বাংলাদেশি শ্রমিকরা

সিঙ্গাপুরে করোনাভাইরাস থেকে নিজেদের সুরক্ষার জন্য মাস্ক সংগ্রহ করছেন বাংলাদেশের শ্রমিকরা। ছবি: রয়টার্সসিঙ্গাপুরে ‘সার্কিটব্রেকার কর্মসূচি’র আওতায় সিঙ্গাপুরে সব ধরনের নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে বাংলাদেশি শ্রমিকদের সম্পূর্ণ বেতনসহ আনুষঙ্গিক সুবিধা বহাল রাখা হয়েছে। তাছাড়া সকল শ্রমিককে বিনা মূল্যে খাবার

ও চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে ।সিঙ্গাপুরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভিভিয়ান বালাকৃষনান বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেনের সঙ্গে ফোনে আলাপকালে এসব কথা বলেন।

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, সিঙ্গাপুরে ১৪৮১ জন করোয়ায় আক্রান্তের মধ্যে ২৪৪ জন বাংলাদেশি। আরও বেশকিছু সংখ্যক বাংলাদেশিকে কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে। তাদের চিকিৎসাসহ সার্বিক তত্ত্বাবধানে সবধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করছে সিঙ্গাপুর।
এসময় আরো জানানো হয়, সিঙ্গাপুরে প্রথম আক্রান্ত ৫ জনের মধ্যে ৪ জনই এখন সুস্থ। গুরুতর অসুস্থ একজনের অবস্থারও উন্নতি হয়েছে।

প্রথম আলো

১১ এপ্রিল ২০২০

কারখানা খোলার বিষয়ে কোস্ট টু কোস্ট গ্রুপের ব্যাখ্যা

বন্ধের মধ্যে গত ৮ এপ্রিল কারখানা চালু রাখা নিয়ে কোস্ট টু কোস্ট গ্রুপ বলেছে, তাদের কোস্ট টু কোস্ট নামের পোশাক কারখানাটির উৎপাদন গত ২৬ মার্চ থেকে বন্ধ রয়েছে। গত ৮ এপ্রিল কেবলমাত্র কিছু সংখ্যক শ্রমিকের মজুরি দেওয়ার জন্য কারখানা খোলা ছিল। ওই দিন কারখানায় কোনো প্রকার উৎপাদন হয়নি।

গত ৯ এপ্রিল প্রথম আলো অনলাইনে ‘বন্ধের মধ্যে চলছে ৬৭টি পোশাক ও বস্ত্র কারখানা’ শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনটিতে কোস্ট টু কোস্টসহ কয়েকটি কারখানার নাম উল্লেখ করে বলা হয়, কারখানাগুলো ৮ এপ্রিল উৎপাদনে ছিল। তবে কোস্ট টু কোস্ট গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আশরাফ উজ জামান প্রকাশিত প্রতিবেদনের বিষয়ে গতকাল শুক্রবার লিখিতভাবে প্রতিবাদ জানান।

কোস্ট টু কোস্ট গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আশরাফ উজ জামান বলেন, সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী ২৬ মার্চ কারখানা বন্ধ করা হয়। ৫ এপ্রিল পুনরায় কারখানা চালু হলে শ্রমিকের মজুরি পরিশোধের সিদ্ধান্ত নেওয়া ছিল। তবে তার আগেই ছুটি ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। শ্রমিকদের মধ্যে যাদের ব্যাংক হিসাব রয়েছে তাদের স্বয়ংক্রিয়ভাবে মজুরির অর্থ প্রেরণ করা হয়। কিছু সংখ্যক শ্রমিকের ব্যাংক হিসাব না থাকায় কারখানা না খুলে মজুরি দেওয়া সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে সরকার ও বিজিএমইএ থেকে শ্রমিকদের মজুরি যত দ্রুত সম্ভব দেওয়ার

নির্দেশনা দেওয়া হয়। সে জন্য সময় ক্ষেপণ না করে সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে গত ৮ এপ্রিল কারখানা খুলে শ্রমিকের মার্চ মাসের মজুরি পরিশোধ করা হয়। তবে সেদিন কোনো ধরনের উৎপাদন কাজ করা হয়নি কারখানায়।

এদিকে গাজীপুরের ফ্যাশন স্টেপ নামের পোশাক কারখানাও দাবি করেছে, গত ৮ এপ্রিল তারাও উৎপাদনে ছিল না। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মাসুদুর রহমান আজ শনিবার প্রথম আলোকে বলেন, শ্রমিকের মজুরি দিয়ে গত ২৫ মার্চ তাদের কারখানা বন্ধ ঘোষণা করা হয়। তারপর থেকে আর উৎপাদন কাজ চালানো হয়নি। তবে ক্রেতাদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য কারখানার পাশে তাদের অফিস খোলা রয়েছে।

বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

এপ্রিল ১১, ২০২০

বিসিক শিল্পনগরীতে সার্ভিস চার্জ আদায় তিন মাসের জন্য স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের (বিসিক) আওতাধীন শিল্পনগরিগুলোতে স্থাপিত শিল্প ইউনিটের সব ধরনের সার্ভিস চার্জ আদায় আগামী তিন মাসের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।গত বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) জারি হওয়া বিসিকের অফিস আদেশের এ তথ্য আজ শনিবার জানিয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়। উল্লেখ্য, বিশ্ব মহামারী করোনাভাইরাসের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দেশের শিল্পায়নের ধারাকে গতিশীল রাখতে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এর আওতায় বিসিক শিল্পনগরীতে অবস্থিত সকল শিল্প ইউনিটের ২০১৯ সালে বৃদ্ধিকৃত সার্ভিস চার্জসহ অন্যান্য চার্জ আদায় আগামী তিন মাস স্থগিত থাকবে।সারাদেশে বিসিকের ৭৬টি শিল্পনগরী রয়েছে। শিল্পনগরী কর্মকর্তাদের এ আদেশ বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। একই সাথে এটি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা বিভাগের আঞ্চলিক পরিচালকদের বলা হয়েছে। বিসিক কর্তৃপক্ষ শিল্পনগরীসমূহ থেকে তিন ধরনের সার্ভিস চার্জ নিয়ে থাকে; ভূমি উন্নয়ন ফি, পানির বিল এবং শিল্পনগরীসমূহের রাস্তা ঘাট, ড্রেনেজ, কালভার্ট (অবকাঠামো) জন্য সার্ভিস চার্জ।

কালের কণ্ঠ

১২ এপ্রিল, ২০২০

এই সময় শ্রমিক ছাঁটাই বেআইনি

► *৭০ শতাংশ কারখানা লে-অফ ঘোষণা করেছে : রুবানা*

► *৪০ বছরের শিল্প এক মাসেরও মজুরি দিতে পারে না, এটা অযৌক্তিক : নাজমা*

এম সায়েম টিপু

করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে সরকারের সাধারণ ছুটি ঘোষণার মধ্যে দেশের অনেক শিল্প-কারখানা অমানবিকভাবে শ্রমিক ছাঁটাই করছে। তবে সচেতন মহল বলছে, মানবিক বিপর্যয়ের এই সময় কোনো কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের মালিক শ্রমিক ছাঁটাইয়ের মতো কাজ করতে পারেন না। তারা মনে করে, এটা একই সঙ্গে বেআইনি। কেননা, সরকার নির্বাহী আদেশে বিশেষ পরিস্থিতিতে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে। এই সুযোগে শ্রমিক সংঘ বা কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে কোনো রকম আলোচনা না করেই কারখানা বন্ধ করে গণছাঁটাইয়ের একতরফা সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বেআইনি।সংশ্লিষ্টরা বলছেন, কোনো শ্রমিক ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রে দেশের তথা ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্প-কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক-কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬-এর বিধিবিধান প্রযোজ্য। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক এক বছরে সর্বোচ্চ ৪৫ দিন পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ পাবেন ১৬(৪) ধারা অনুসারে। এই সময় একজন শ্রমিক তাঁর মাসিক মূল মজুরির অর্ধেক ও বাড়িভাড়াসহ প্রযোজ্য অন্যান্য ভাতা পুরোপুরি পাবেন। তবে কারখানা লে-অফ রাখার মেয়াদ দীর্ঘ হলে নিয়োগকারী সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের শ্রম আইনের ২০ ধারা মতে ছাঁটাই করতে পারেন।সাধারণ ছুটির এই সময়ে এ বিষয়ে আইনের প্রযোজ্য বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইলে শ্রম আইন বিশেষজ্ঞ আইনজীবী ড. উত্তম কুমার দাস কালের কণ্ঠকে বলেন, সরকার যে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে এটা একটি নির্বাহী আদেশ। যা সরকারি-বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য। আইনের সাধারণ নীতি হলো—কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমন কোনো আদেশ কোনো ছুটির সময় ইস্যু বা জারি করা যায় না। আন্তর্জাতিক শ্রম আইন সংস্থার (আইএলও) সাবেক এই কর্মকর্তা বলেন, শ্রম আইনে কারো চাকরির অবসান (ছাঁটাই) উদ্দেশ্যমূলকভাবে করা যাবে না। সেহেতু বিদ্যমান পরিস্থিতিতে মালিক কর্তৃক একতরফা চাকরি অবসান উদ্দেশ্যমূলক বলে বেআইনি হবে। তিনি আরো বলেন, তবে এই মুহূর্তে কোনো মালিক যদি পরিস্থিতিমোকাবেলার জন্য পদক্ষেপ নিতে চান, তা বিদ্যমান ট্রেড ইউনিয়ন অথবা তার অবর্তমানে সাধারণ শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করে নিতে পারেন। ফলে মালিকরা এই মুহূর্তে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের যে হিড়িক তুলেছে এটা সম্পূর্ণ একতরফা।শ্রমিক নেত্রী নাজমা আক্তার কালের কণ্ঠকে বলেন, '৪০ বছরের এত বড় একটি খাতে কোনো সমস্যা তৈরি হলে মালিকরা এক মাসেরও মজুরি দিতে পারেন না— এটা একেবারে অযৌক্তিক। প্রকৃত অর্থে মালিকরা শ্রমিকদের জন্য মায়াকান্না করলেও কখনোই মানবিক হতে দেখা যায়নি। সরকারের কাছ থেকে সুবিধা নেওয়ার পর এবারও তাই করেছেন। এরই মধ্যে তাঁরা ১০ থেকে ১৫ হাজার শ্রমিক ছাঁটাই করেছেন। এ ছাড়া ৭০ শতাংশ কারখানা লে-অফ করেছেন। এসব কারখানায় যেসব শ্রমিক এক বছরের নিচে কাজ করেছে; এমন শ্রমিকরা কোনো সুবিধাই পাবে না। এমন শ্রমিক প্রায় ২০ থেকে ২৫ হাজার।'ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতিগুলোর ফেডারেশন— এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি মীর নাসির হোসেন বলেন, জাতীয় এই দুর্যোগের সময় মালিকদের কোনোভাবে কর্মী ছাঁটাই করা যাবে না। এমন অমানবিক হওয়া মোটেও ঠিক নয়। তিনি বলেন, 'তারা আমাদের কর্মী, তাদের সহযোগিতায়ই দেশ ও আমরা এগোচ্ছি। যেকোনোভাবে আগামী মে-জুন পর্যন্ত তাদের মজুরি চালিয়ে নিতে হবে। সেটা যেকোনো ফর্মেই হোক। তাদের নিয়মিত মজুরি আমাদের দিতে হবে।'সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান

বিআইডিএসের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. নাজনীন আহমেদ বলেন, 'কর্মী ছাঁটাই একেবারে অমানবিক। এই মুহূর্তে প্রয়োজনে মালিককে তাঁর সঞ্চয়ে হাত দিয়ে হলেও কর্মী বাঁচিয়ে রাখা উচিত। এ জন্য কম করে হলেও তিন মাসের মজুরি দিতে হবে। সে ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা যাঁরা মজুরি দিতে পারছেন না তাঁরা সরকারের সহযোগিতা নিতে পারেন। কারণ শ্রমিক না বাঁচলে শিল্প আর কখনো ঘুরে দাঁড়াবে না।বিজিএমইএ সভাপতি ড. রুবানা হক বলেন, 'অধিকাংশ কারখানার কাজ নেই। কাজ না থাকলে উদ্যোক্তারা কারখানা লে-অফ করবেন, এটাই স্বাভাবিক। এই মুহূর্তে ৭০ শতাংশ কারখানা লে-অফ ঘোষণা করেছে। এ সময় শ্রমিকরা মোট মজুরির ৬০ শতাংশ পাবে।' প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'কত কর্মী ছাঁটাই হয়েছে এই মুহূর্তে তার হালনাগাদ পরিসংখ্যান নেই আমাদের হাতে।'মার্চের মজুরি দেওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে রুবানা হক বলেন, 'প্রায় ২০ শতাংশ কারখানা মার্চের মজুরি পরিশোধ করেছে। ১৬ এপ্রিলের মধ্যে ৮০ শতাংশ এবং ২২ থেকে ২৫ এপ্রিলের মধ্যে শতভাগ মালিক মার্চের মজুরি পরিশোধ করবেন বলে আশা করি।'

সমকাল

প্রকাশ: ০৯ এপ্রিল ২০২

খোলা ছিল মাত্র ২৬ পোশাক কারখানা, ২৭৮ কারখানায় বেতন পরিশোধ

পোশাক কারখানা অধ্যুষিত গাজীপুরের প্রায় সব এলাকা এবং নারায়ণগঞ্জ জেলা পুরোপুরি লকডাউন থাকায় জরুরি রপ্তানি আদেশের কাজ থাকা অনেক কারখানা বৃহস্পতিবার খোলা রাখা সম্ভব হয়নি। সব মিলিয়ে মাত্র ২৬টি কারখানা খোলা ছিল। সাধারণ ছুটির মধ্যেও জরুরি রপ্তানি আদেশের কাজ এবং করোনাভাইরাস থেকে সুরক্ষায় পিপিই এবং মাস্ক তৈরির কাজে থাকা কারখানাগুলো এত দিন খোলা ছিল। পোশাক খাতের দুই সংগঠন বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিষ্ঠান কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ডিআইএফই এর অনুমতি নিয়ে বিশেষ ব্যবস্থায় এসব করাখানা এত দিন খোলা ছিল। এদিকে উৎপাদন বন্ধ থাকলেও অনেক কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের মার্চ মাসের বেতন পরিশোধ করেছেন। এ পর্যন্ত ২৭৮ টি কারখানার শ্রমিক কর্মচারীরা গেল মার্চ মাসের বেতন পেয়েছেন। বেতন পরিশোধের সময় সরকার ঘোষিত প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ফলে বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএর বেঁধে দেওয়া সময়ের আগেই বেতন পেলেন এসব কারখানার শ্রমিকরা।আগামী ১৬ এপ্রিলের মধ্যে মার্চের বেতন পরিশোধে সদস্য কারখানাগুলোর মালিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিজিএমইএর সভাপতি ড. রুবানা হক এবং বিকেএমইএর সভাপতি সেলিম ওসমান। তাদের ঘোষণা অনুযায়ী সাধারণ ছুটির পর কারখানা খোলার দুই দিনের মাথায় বেতন দেওয়ার কথা। সাধারণত মাসের প্রথম সাত কর্মদিবসের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের বেতন দেওয়া হয়

পোশাক কারখানাগুলোতে। আগামী ১৪ এপ্রিল কারখানা খোলা রাখার কথা রয়েছে। বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সাভারের আশুলিয়ায় ৬টি কারখানা খোলা ছিল। গাজীপুরে ১৩টি এবং চট্টগ্রামে ৭টি কারখানা খোলা ছিল। তবে বুধবারের মতো বৃহস্পতিবারও কোনো কারখানা খোলা রাখা হয়নি নারায়ণগঞ্জে। এদিকে করোনাভাইরাসের প্রভাবে ইউরোপ এবং আমেরিকার ঘোষিত অঘোষিত লকডাউনের কারণে শোরুম খুলতে না পারা ব্র্যান্ড এবং খুচরা ক্রেতাদের পক্ষ থেকে রপ্তানি আদেশ বাতিল কিংবা স্থগিতের ঘটনা অব্যাহত আছে। বুধবারও কয়েকটি ক্রেতা এবং ব্র্যান্ড তাদের রপ্তানি আদেশ বাতিল করেছে। এ নিয়ে গত কয়েক দিনে এক হাজার ১২৩টি কারখানার ৯৭ কোটি পিছ পোশাক পণ্যের রপ্তানি আদেশ বাতিল হলো। এসব পণ্যের মূল্য ধরা হয়েছিল ৩১১ কোটি ডলার। এই বাতিল কিংবা স্থগিতের কারণে ২০ লাখ ২৫ হাজার শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

প্রকাশ : ১২ এপ্রিল, ২০২০

পোশাক শ্রমিকদের দ্রুত বেতন পরিশোধ করার আহ্বান

তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন দ্রুত পরিশোধ করতে ব্যাংকগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে মালিকদের দুই সংগঠন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ। সংগঠন দুটি বলেছে- শ্রমিক ও কর্মচারীরা বেতন-ভাতা নিয়ে এক অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে। তাই যে কোনো পরিস্থিতিতে তাদের বেতন-ভাতা পরিশোধ করার ব্যবস্থা করুন। একসঙ্গে সমবেত না করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রুপে ভাগ করে এবং সময় ভাগ করে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বেতন পরিশোধ করুন।

রবিবার গণমাধ্যমে পাঠানো বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুত ও রফতানিকারক সমিতি- (বিজিএমইএ) ও বাংলাদেশ নিটওয়্যার প্রস্তুত ও রফতানিকারক সমিতি- (বিকেএমইএ) এক যৌথ ঘোষণায় কথা বলা হয়। সংগঠন দুটি বলেছে- পোশাক শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা দ্রুত প্রদানের জন্য ব্যাংক কর্মকর্তাদের বিনীত অনুরোধ করছি। শ্রমিকের বেতন প্রদানের ক্ষেত্রে সহজ শর্তে সহযোগিতা করুন। অনেক স্থানে লকডাউন থাকলেও শ্রমিকদের বেতনের টাকা দেয়ার জন্য ২ থেকে ৩ দিন কয়েক ঘণ্টা ব্যাংক খোলা রেখে বেতনের টাকা দেয়ার ব্যবস্থা করুন।পোশাক শিল্পের মালিকদের উদ্দেশ্য বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ বলেছে, আপনারা যারা এখনও মার্চ মাসের বেতন পরিশোধ করেননি যে কোনো পরিস্থিতিতে পরিশোধ করার ব্যবস্থা করুন। এক সঙ্গে সমবেত না করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রুপে ভাগ করে এবং সময় ভাগ করে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বেতন পরিশোধ করুন। যারা এখনও শ্রমিকদের ব্যাংক বা মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস) অ্যাকাউন্ট করতে পারেননি, তারা অতিদ্রুত তা সম্পন্ন করুন। এমএফএস প্রতিষ্ঠান সমূহ 'নগদ' 'রকেট' 'বিকাশ' অ্যাকাউন্ট করার জন্য সর্ব প্রকার

সহযোগিতা করতে প্রস্তুত রয়েছে। প্রয়োজনে বিজিএমইএ-বিকেএমইএ'র সহযোগিতা নিন। শ্রমিকদের মার্চ মাসের বেতন পরিশোধ করা হলে সরকারের দেয়া ঋণ সুবিধা পেতে বিজিএমইএ, বিকেএমইএ ও সরকারের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা পাবেন।

বিডি প্রতিদিন/আরাফাত

বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

এপ্রিল ০৮, ২০২০

মার্চের বেতন হয়েছে ২৪৩টি পোশাক কারখানায়

দেশের ছয়টি শিল্পাঞ্চলে পোশাক খাতের মোট কার খানা আছে ২ হাজার ৯৮৩টি। শিল্প পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, এর মধ্যে গতকাল পর্যন্ত ২৪৩টি কারখা না মার্চের বেতন পরিশোধ করেছে। বাকি ২ হাজার ৭৪০টি কারখানায় বেতন পরিশোধ হয়নি। যদিও প্রচলিত শ্রম আইন অনুযায়ী প্রতি মাসের বেতন প রবর্তী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করার বা ধ্যবাধকতা রয়েছে।

শিল্পাঞ্চল আশুলিয়া এলাকায় বিজিএমইএ-
বিকেএমইএর সদস্য পোশাক কারখানা আছে মোট ৫০৬টি। এর মধ্যে গতকাল পর্যন্ত মোট ৩৪ টি কারখানা বেতন পরিশোধ করেছে। গাজীপুরে বিজিএমইএ-
বিকেএমইএর সদস্য পোশাক কারখানা আছে ৯৬৮টি। এর মধ্যে গতকাল পর্যন্ত মার্চের বেতন পরিশোধ করেছে এমন কারখানার সংখ্যা ১১৬। চট্টগ্রামে বিজিএমইএ-
বিকেএমইএর সদস্য পোশাক কারখানা আছে মোট ৪০৮টি। এর মধ্যে গতকাল পর্যন্ত মার্চের বে তন পরিশোধ করেছে এমন কারখানার সংখ্যা ১৭।

নারায়ণগঞ্জ এলাকায় পোশাক কারখানা আছে ১ হাজার ৪৬টি। এর মধ্যে গতকাল পর্যন্ত মার্চের বেতন পরিশোধ করেছে ৫৩টি কারখানা। ময়মনসিংহে বিজিএমইএর সদস্য মোট পোশাক কার খানার সংখ্যা ৫০। এর মধ্যে ১৮টি কারখানা গতকাল পর্যন্ত বেতন পরিশোধ করেছে। এ অঞ্চলে বিকেএমইএর সদস্য কোনো কারখানা নেই। খুলনায় পোশাক কারখানা আছে পাঁচটি। এ কারখা নাগুলোর সবই বিজিএমইএর সদস্য। সব কারখানাই মার্চের বেতন পরিশোধ করেছে।

মার্চের বেতন পরিশোধ পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাইলে বিজিএমইএ সভাপতি ড. রুবানা হক বলেন, চলতি মাসের ১৬ তারিখের মধ্যে সব বেতন পরিশোধ হয়ে যাবে।

দেশের ছয়টি শিল্প এলাকায় বস্ত্র, পোশাক, চামড়া, ওষুধ, রি-
রোলিং, ফার্নিচার, মোবাইল সংযোজন, সিরামিকসহ সব খাত মিলিয়ে মোট শিল্প-
কারখানা আছে ৭ হাজার ৬০২টি। এর মধ্যে গতকাল বন্ধ ছিল ৭ হাজার ৫৬টি। বাকি ৫৪৬টি কারখানা খোলা ছিল। আর ৭ হাজার ৬০২টি কারখানার মধ্যে গতকাল পর্যন্ত বেতন পরিশোধ ক রেছে ১ হাজার ২৪টি। বাকি ৬ হাজার ৫৭৮টি কারখানায় বেতন পরিশোধ হয়নি। শিল্প এলাকাগু লোয় কর্মরত ৩০ লক্ষাধিক শ্রমিক।

জানা গেছে, কোভিড-
১৯ বা নভেল করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের প্রেক্ষাপটে চলতি বছরের শুরুতেই দেশের পোশাক কারখানাগুলোর রফতানি কার্যক্রম ব্যাহত হতে শুরু করে। ক্রেতারা একের পর এক ক্রয়াদেশ বাতিল করায় কারখানায় কাজের সংকটও তৈরি হয়। এ প্রেক্ষাপটে মার্চের বেতন পরিশোধে হিম শিম খেতে হচ্ছে উদ্যোক্তাদের। সবচেয়ে বেশি বেগ পেতে হচ্ছে ক্ষুদ্র আকারের কারখানাগুলো কে। এ ধরনের কারখানা ১০-১৫ শতাংশ।

পোশাক কারখানাগুলোর বেতন-
ভাতা পরিশোধসংক্রান্ত জটিলতা নিয়ে গতকাল বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বরাবর একটি চিঠিও দিয়েছে বিজিএমইএ। সংগঠনের সভাপতি রুবানা হক স্বাক্ষরিত চিঠিতে বলা হয়, আমাদের সদ স্য প্রতিষ্ঠানগুলোর সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার কারণে মার্চে উৎপাদন কার্যক্রম ব্যাপকভা বে বিঘ্নিত হয়েছে, বাধাগ্রস্ত হয়েছে রফতানি।

চিঠিতে বলা হয়, প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে শ্রমিক-কর্মচারীদের মার্চের বেতন-
ভাতা নির্বিঘ্নে পরিশোধ করতে পারে, সেজন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে বেতন-
ভাতা প্রদানের বিষয়ে নিয়মনীতি সহজীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা আপনার দপ্তর থে কে দেয়া আবশ্যক। আপত্কালে ব্যাংকগুলো থেকে এমন সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। এ প রিপ্রেক্ষিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অনুকূলে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের বি শেষ অনুরোধ জানিয়েছেন বিজিএমইএ সভাপতি।

প্রথম আলো

০৮ এপ্রিল ২০২০

প্রণোদনা প্যাকেজ কতটা জনবান্ধব?

করোনাভাইরাস বৈশ্বিক মহামারির এই সময়ে আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষতির প্রভাব স্বল্প মেয়াদে ও দীর্ঘ মেয়াদে দুইভাবে অনুভূত হবে। স্বল্প মেয়াদে আমরা দুটি বিষয় একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছি, একদিকে পণ্য উৎপাদন ও সেবা খাত স্থবির হয়ে পড়েছে, অন্যদিকে অনেক মানুষ আয়ের উৎস হারিয়ে ফেলায় দ্রুত ক্রয়ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছেন। শ্রমিক, মজুর ও বেতনভুক্ত কর্মচারী কাজ না করলে যেমন পণ্য ও সেবা দিতে পারছেন না এবং উৎপাদকেরা দিশেহারা বোধ

করছেন, তেমনি আবার আয় করতে না পারায় এই শ্রমিক, মজুর, বেতনভুক্ত অস্থায়ী কর্মচারীরা কেউ চাকরি হারিয়ে, কেউবা চাকরি হারানোর ভয়ে অসহায় হয়ে পড়েছেন।

ঋণসহায়তা কতটা কাজে দেবে?অন্যদিকে দীর্ঘ মেয়াদে, অর্থাৎ করোনা–পরবর্তী মন্দার সময় উৎপাদন পুনরায় শুরু হবে, তবে বর্তমান ক্ষতির কারণে বিনিয়োগ হ্রাস পাবে, উৎপাদন কমে যাবে, বেকারত্ব বাড়বে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাড়ানো কঠিন হয়ে যাবে এবং দ্রব্যমূল্য বাড়বে। এ রকম অবস্থায় যখন মন্ত্রীরা বলছেন যে এই আর্থিক প্রণোদনা, যা মূলত ঋণের সুবিধা, তা সব শ্রেণি–পেশার মানুষের কাছে পৌঁছাবে, তখন তাঁরা হয়তো আশা করছেন বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা এই বিপৎকালীন ঋণ নিয়ে উৎপাদনব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে শ্রমিক ও কর্মচারীদের বেতন দিলে এটা সব শ্রেণি–পেশার মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে। আর আমদানি–রপ্তানি সহজ হলে এর সুফলও সবাই সমানভাবে ভোগ করবেন বা ধরেন, সরকার আশাবাদী যে সেই ঋণের টাকাটা ব্যবসায়ীরা এখন না পেলেও ভবিষ্যতে পাবেন, যা বিপৎকালীন ক্ষতি–পরবর্তী সময়ে কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করবে। অর্থনীতিকে সচল রাখতে অর্থ সঞ্চালনের সম্প্রসারণবাদী এমন নীতি অনেক দেশই ব্যবহার করে, তবে এর মূল উদ্দেশ্য হয় সাধারণত দীর্ঘ মেয়াদে মন্দা মোকাবিলা। অর্থাৎ ঋণপ্রাপ্তির সুবিধা ব্যবসায়ীদের একধরনের নিশ্চয়তা দেয় যে তাঁরা এখন যে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছেন, তা তাঁদের সুরক্ষা দেবে ঋণের সুবিধা বাড়লে। এভাবে চিন্তা করলে সরকার তো আশাবাদী হবেই এই প্যাকেজ নিয়ে। তাহলে সমস্যা কোথায়?

প্রথম সমস্যা হলো, অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মহীন হয়ে পড়েছে লাখ লাখ দিনমজুর ও শ্রমিক, অস্থায়ী কর্মীরা, যাঁরা এখনো চাকরি হারাননি, তাঁরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। অনানুষ্ঠানিক খাতে যাঁরা কাজ করছেন, তাঁদের সংখ্যা তো পাঁচ কোটির ওপরে। এই খাতে যাঁরা এরই মধ্যে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন, তাঁদেরই–বা কী হবে? দ্বিতীয় সমস্যা হলো, সব ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়েছে। এই অনিশ্চয়তার মধ্যে ব্যবসায়ীদের ওপর সরকার ছেড়ে দিয়েছেন কোটি কোটি মানুষের আয়ের নিশ্চয়তা। এখন প্রশ্ন হলো, সব ব্যবসায়ীই কি ঋণ পাবেন? তাঁরা তো ঋণ না–ও পেতে পারেন, ঋণ পাওয়ার শর্ত পূরণ না–ও করতে পারেন। তাহলে কি সেসব ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বেতন দেবে না? তাহলে এই ঋণ কীভাবে সব শ্রেণি–পেশার মানুষের কাছে পৌঁছাবে বলে সরকার দাবি করতে পারে?

কিন্তু ক্রয়ক্ষমতা ফিরবে কি?এই প্যাকেজে যা নেই, তা হলো এই দুর্দিনে জরুরি ভিত্তিতে মৌলিক চাহিদা পূরণে ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে অর্থ সঞ্চালন।

চাকরি হারিয়ে, কাজ না থাকায়, মজুরি না পাওয়ায় যাঁরা মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হচ্ছেন, সেই শ্রেণির কাছে খাবার পৌঁছে দেওয়া, নগদ অর্থ পৌঁছে দেওয়া জরুরি হলেও সরকার এই পথ বেছে নেয়নি। কারণ, সরকার এটাকে জরুরি মনে করছে না। ক্ষুধার্ত মানুষ রাস্তায় নেমে এলে, ছিনতাই, ডাকাতি ও অন্যান্য অপরাধ বেড়ে গেলে হয়তো সরকার এটা জরুরি মনে করতে পারে। কিন্তু তখন আর এসব সামাজিক ক্ষতি পোষানো সম্ভব হবে না। এখন যেভাবে প্রণোদনা দেওয়া হলো, তাতে বেতনদাতা ও বেতনভুক্তর মধ্যে একটি স্থায়ী দ্বন্দ্ব উসকে দেওয়ার বন্দোবস্ত করে দেওয়া হলো। যেই ভুক্তভোগীরা সরাসরি সরকারের কাছ থেকে নগদ অর্থ ও খাদ্যসহায়তা পেয়ে এই আপৎকাল পার করতে পারতেন, তাঁদের সরাসরি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সঙ্গে লেনদেনে থেকে প্রতিনিয়ত দুই পক্ষের 'টাকা নাই' 'টাকা নাই' অস্থিরতা ও সংঘাতের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হলো। এর প্রথম প্রকাশ আমরা দেখলাম ৪ এপ্রিল থেকে করোনাভাইরাস উপেক্ষা করে শহরমুখী শ্রমিকদের ঢল দেখে।চাকরি হারানোর ভয়ে করোনাঝুঁকি উপেক্ষা করে লাখ লাখ শ্রমিকের বেপরোয়া যাত্রা প্রমাণ করে, মহামারির সময়ে সামাজিক সুরক্ষা দিতে ব্যবসায়ীবান্ধব প্যাকেজ আসলে কত বেশি অকার্যকর। কী হতো যদি এখনই সরাসরি নগদ অর্থ ও খাদ্যসহায়তা তাঁদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যেত? এই শ্রমিকেরা যদি নিজ নিজ এলাকায় থেকে নিশ্চিতভাবে জানতেন যে তাঁরা সাহায্য পাবেন, তাঁদের এভাবে বেপরোয়া হয়ে হেঁটে আসতে হতো না। শ্রমিকদের বেতন নিয়ে শুরু হয়েছে অসন্তোষ। আজও দুজন শ্রমিক বেতনের দাবিতে প্রতিবাদ করতে গিয়ে নিহত হয়েছেন ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে।**খাদ্য ও অর্থসহায়তাই অর্থনীতির জন্য উপকারী**

খাদ্য ও অর্থ প্রদান শুধু বর্তমানে করোনাদুর্গত ব্যক্তিদের সুরক্ষাই দেবে না, এর অর্থনৈতিক সুফলও রয়েছে, তা থেকে দীর্ঘ মেয়াদে পুরো অর্থনীতি উপকৃত হতে পারে। অর্থনীতির পুরোধা মানুষের একজন জন মেনার্ড কেইনসের মতে, মন্দার সময় ব্যয় সম্প্রসারণমূলক নীতি গ্রহণ করে মন্দা থেকে উত্তরণ সম্ভব। এর মধ্য দিয়ে দ্রব্যের কমে যাওয়া চাহিদা বাড়ানো সম্ভব। দুইভাবে মন্দাবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটানো সম্ভব—ব্যয় সম্প্রসারণ ও মুদ্রা সম্প্রসারণ। নগদ অর্থ প্রদান ও খাদ্যসহায়তা হচ্ছে ব্যয় সম্প্রসারণ নীতি। এর মাধ্যমে সরকার কোষাগার থেকে অর্থ ব্যয় বাড়িয়ে তা মানুষের কাছে এমনভাবে পৌঁছে দেয়, যেন তা সামাজিক সুরক্ষা ব্যয় বাড়িয়ে অথবা কর্মসংস্থান তৈরিতে অবদান রেখে তাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে পারে। এই বর্ধিত ক্রয়ক্ষমতার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে চাহিদার পতন ঘটে না।

অনেক ধরনের ব্যয় সম্প্রসারণের পাশাপাশি এটা হতে পারে মহামারির সময় স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বাড়ানো, খাদ্যসংকটে জরুরি সাহায্য প্রদান, কিংবা জনসুরক্ষা দেয় এমন খাতে ট্যাক্স কমানো ইত্যাদি। এই প্রক্রিয়ায় বিক্রেতার আয় যেমন অব্যাহত থাকে, তেমন এ ধরনের ব্যয় সম্প্রসারণ বাজার স্থিতিশীল করতেও ভূমিকা রাখে। এভাবে আপদকালীন অর্থ সঞ্চালন অব্যাহত থাকলে আসন্ন মন্দাকেও নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

আরেকটি পদ্ধতি হলো সুদ কমিয়ে ঋণসহায়তা বাড়িয়ে মুদ্রা সম্প্রসারণ। এর মাধ্যমে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হয়। বাংলাদেশের সরকার এই দ্বিতীয় পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। এই পদ্ধতি তাৎক্ষণিক সংকটকে মোকাবিলা করতে পারে না, বরং একধরনের প্রত্যাশা তৈরি করতে ভূমিকা পালন করে। এই প্রত্যাশা প্রতিটি সম্ভাব্য ঋণগ্রহীতার মধ্যে সমানভাবে তৈরি হয় না। যারা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী, তারা এই ঋণ প্রাপ্যতাকে ইতিবাচকভাবে নেয় এবং বাকিরা এই নীতিতে সাধারণত আস্থাশীল থাকে না। এতে বিনিয়োগকারীদের একটি অংশের মধ্যে সরকারের প্রতি অনাস্থা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

ব্যয় সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করলে কোষাগারে অর্থ না থাকলে সরকারকে ঋণ নিতে হয়। এই ঋণ সরকার পরিশোধ করে জনগণের দেওয়া ট্যাক্স ও ভ্যাট থেকে। কিন্তু মুদ্রা সম্প্রসারণ নীতি)সুদে ভর্তুকি (গ্রহণ করলে সরকার সুদের একটা অংশের জন্য ব্যয় করলেও উৎপাদক বা বিনিয়োগকারীর ওপর ঋণ পরিশোধের দায় থাকে। আমরা জানি ২০১৯–এর নভেম্বর পর্যন্ত খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯৬ হাজার ৯৮৬ কোটি ৩৮ লাখ টাকা। ২০১৯ সালের প্রাক্কলিত হিসাব অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশেই খেলাপি ঋণের হার সবচেয়ে বেশি—১১ দশমিক ৪ শতাংশ। করোনাভাইরাস দুর্যোগ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে সরকার ইতিমধ্যেই ঘোষণা দিয়েছে, ঋণ পরিশোধের অপারগতায় আগামী জুন মাস পর্যন্ত নতুন করে কোনো ঋণকে খেলাপি ঘোষণা করা যাবে না)১৯ মার্চ ২০২০, প্রথম আলো(। সরকার ঋণখেলাপিদের ব্যাপারে কঠোর না হওয়ায় ঋণের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। এই অবস্থায় নতুন করে ঋণ নিলে তা পরিশোধ করা না গেলে জিডিপিতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ আরও বাড়বে। এই অবস্থা অর্থনীতির জন্য দীর্ঘ মেয়াদে মোটেও সুখকর না হলেও মন্দা থেকে উত্তরণের জন্য সরকার ঋণ সম্প্রসারণ নীতির দিকেই বেশি জোর দিয়েছে। কিন্তু এই নীতি অবলম্বন করে সরকার যদি পাশাপাশি করোনাভাইরাসের সময় দুস্থ অসহায় মানুষদের জন্য অর্থসহায়তা নিয়ে এগিয়ে না আসে, তাহলে এই ব্যবসাবান্ধব নীতি থেকে ব্যবসায়ীরাই অসমভাবে উপকৃত হবেন।

সামাজিক সুরক্ষা তহবিল

ব্যক্তি ও সংগঠনের উদ্যোগে দেওয়া সাহায্য দিয়ে বেশি দিন পার করা সম্ভব নয়। সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের কাজটি সরকারের। এটাকে রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক কাজ হিসেবে দেখলে মনে হতে পারে এটি কোনো দয়া-দাক্ষিণ্য। অথচ এই দুঃসময়ে খাদ্য সরবরাহ পাওয়া জনগণের অধিকার। এই সাহায্য মোটেই অর্থনীতির বাইরের কোনো সাময়িক দান প্রকল্প নয়।

এ মুহূর্তে প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট সামাজিক সুরক্ষা তহবিল। বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন উৎস থেকে সহায়তা দেওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু তার সঠিক পরিমাণ এবং কাদের কীভাবে দেওয়া হবে, সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলও গঠন করা হয়েছে। আমরা শুনতে পাচ্ছি, সহায়তা দেওয়ার জন্য তালিকা তৈরি হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সাধারণত যেসব তালিকা তৈরি করা হয়, সেগুলো কতখানি প্রকৃত অভাবী, অনাহারী ও সীমিত আয়ের মানুষের কাছে পৌঁছে, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। কারণ, প্রথমত নতুন করে যাঁরা কর্মহীন হয়ে পড়েছেন, তাঁরা আগে থেকে হয়তো তালিকাভুক্ত ছিলেন না। দ্বিতীয়ত দলীয় সম্পৃক্ততাকে মাপকাঠি ধরে তালিকাভুক্ত করা হলে তা সত্যিকার প্রয়োজন না মিটিয়ে দলীয় উদ্দেশ্য হাসিলেই বেশি সহায়ক হয়। এ ক্ষেত্রে সাহায্য যাঁরা পাবেন, তাঁদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা যায়। নিজের এলাকার নামে ক্লিক করলে সবাই যেন দেখতে পারে, কার নাম আছে আর কার নেই। সে ক্ষেত্রে যদি কোনো ধনী পরিবার সেই তালিকায় থাকেন বা কোনো দরিদ্র পরিবার বাদ পড়েন, তা যেন তাঁরা অভিযোগ আকারে প্রকাশ করতে পারেন। এভাবে চেক অ্যান্ড ব্যালান্স একটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এখানে জবাবদিহি নিশ্চিত করা যেতে পারে।

কয়েক দিন ধরে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ৫০০০ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ থেকে শ্রমিকদের বেতন দেওয়া নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রজ্ঞাপন জারি করেছে, প্রণোদনা পেতে হলে শ্রমিকদের পরিচয়পত্রসহ অ্যাকাউন্টে বেতন জমা দেওয়ার প্রমাণ দিতে হবে। কিন্তু সবার পরিচয়পত্র ও অ্যাকাউন্ট না থাকায় এই বেতনপ্রাপ্তি কীভাবে নিশ্চিত করা যাবে, তা প্রশ্ন রয়ে গেছে। অর্থাৎ এখন শুধু প্রণোদনা প্যাকেজ দিলেই নিশ্চিত হয়ে বলা যাচ্ছে না, সরকারের সহায়তা আসলে জায়গামতো পৌঁছাচ্ছে কি না, বরং সুষ্ঠু বিতরণপ্রক্রিয়া এখানে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রেও শ্রমিকদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা যায়। যেসব শ্রমিকের নাম থাকবে কিন্তু টাকা পাবেন না, তাঁরা যেন এসে দাবি করতে পারেন টাকা না পাওয়ার। এভাবে গণনজরদারির মেকানিজম তৈরি করে জবাবদিহি বাড়ানো যায়।

সরকার ঘোষিত ৭২ হাজার ৭৫০ কোটির প্রণোদনা প্যাকেজটি করোনাভাইরাস দুর্যোগ মোকাবিলায় সময়োপযোগী নয়, জনবান্ধবও নয়। অনেকে জিডিপিতে এর শতকরা ভাগ)২.৫২ (%দেখে এটাকে খুব বড় কিছু হিসেবে উপস্থাপন করতে পারেন। কিন্তু দেখা উচিত ছিল সারা পৃথিবীতে সামাজিক সুরক্ষায় সরকার কীভাবে অবদান রাখছে। অর্থাৎ সংখ্যার বাইরে গিয়ে প্রণোদনার কার্যকারিতা বিশ্লেষণের প্রয়োজন ছিল। বর্তমান সংকট মোকাবিলায় জনগণের দুর্ভোগ কমানোয় প্রণোদনার কার্যকারিতাকে মাপকাঠি হিসেবে ধরলে নিশ্চয়ই এখানে সামাজিক সুরক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট প্যাকেজটি প্রথম ঘোষিত প্যাকেজ হিসেবেই পাওয়া যেত। তা হয়নি বলে এই প্যাকেজকে সময়োপযোগী ও জনবান্ধব বলা যাচ্ছে না।

মোশাহিদা সুলতানা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস ডিপার্টমেন্টের অর্থনীতির সহকারী অধ্যাপক

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

২২ এপ্রিল, ২০২০

সাধারণ ছুটি বাড়ল ৫ মে পর্যন্ত

অনলাইন ডেস্ক : করোনা ইস্যুতে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সাধারণ ছুটি আগামী ৫ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। আজ বিষয়টি নিশ্চিত করে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী মো. ফরহাদ হোসেন বলেন, আগামী ২৬ এপ্রিল হতে ৫ মে পর্যন্ত ছুটি বর্ধিত করা হয়েছে। বিকেলের মধ্যেই এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে। তবে কিছু ইনস্ট্রাকশন থাকবে যা আমাদের অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

উল্লেখ্য, গত ৮ মার্চ প্রথম করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী পাওয়ার পর গত ২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল এবং পরে ৫-৯ এপ্রিল, পরে ১৪ এপ্রিল এবং সর্বশেষ ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত ছুটি বাড়ানো হয়েছিল।

বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

এপ্রিল ২৩, ২০২০

বোরো ধান কাটতে দেশব্যাপী ১২০০ কৃষিযন্ত্র দেয়া হয়েছে—কৃষিমন্ত্রী

শ্রমিক সংকট মোকাবেলায় বোরো ধান কাটতে দেশব্যাপী ১ হাজার ২০০ কৃষিযন্ত্র দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক।গতকাল কৃষিমন্ত্রী টাঙ্গাইলের ধনবাড়ীর পাইস্কা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে দরিদ্র ও অসহায় পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণের সময় এ কথা জানান তিনি। নভেল করোনাভাইরাস থেকে নিরাপদে থাকতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মন্ত্রী ৩০০ দরিদ্র ও অসহায় পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন।

এ সময় কৃষিমন্ত্রী বলেন, বোরো ধান কাটার জন্য বিভিন্ন জেলা থেকে শ্রমিকের যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কৃষি শ্রমিকরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিভিন্ন জেলায় ধান কাটতে যাচ্ছেন। এরই মধ্যে সারা দেশে ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় ৮০০টি কম্বাইন্ড হারভেস্টার ও ৪০০টি রিপারসহ বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। আরো ১০০ কোটি টাকা দিয়ে সমপরিমাণ কৃষি যন্ত্রপাতি অচিরেই কৃষকের কাছে পৌঁছে দেয়ার কার্যক্রম চলছে।

করোনার এ দুর্যোগময় সময়ে মানবিক সহায়তা এবং ত্রাণের আওতার বাইরে কেউ নেই বলেও জানান কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক।

তিনি বলেন, সরকার সবার কাছে ত্রাণ পৌঁছে দিতে সাধ্যমতো চেষ্টা করছে। পর্যাপ্ত ত্রাণ রয়েছে। পর্যায়ক্রমে সবাই সহায়তা পাবেন। আপনাদের ধৈর্য্য ধরে সরকারকে সহযোগিতা করতে হবে। এ সরকার জনবান্ধব ও গণমুখী। সরকার সবসময় আপনাদের পাশে আছে।

এ সময় কৃষিমন্ত্রী ধনবাড়ী-মধুপুরের জনগণের উদ্দেশে বলেন, মহামারী করোনার কারণে সারা বিশ্বের মানুষ আজ আতঙ্কিত। ধনী-গরিব নির্বিশেষে সব মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। সরকারি নির্দেশনা ও স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে আপনারা সাবধানে থাকবেন যাতে করোনাক্রান্ত না হন। পরে কৃষিমন্ত্রী ধনবাড়ী পৌরসভার মেয়র খন্দকার মঞ্জুরুল ইসলাম তপনের উদ্যোগে কলেজ মাঠে আরো ৩০০ দরিদ্র ও অসহায় পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন। এছাড়া বিকালে কৃষিমন্ত্রী টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলায় ২ হাজার ৫০০ দরিদ্র ও অসহায় পরিবারের মাঝে মানবিক সহায়তা হিসেবে ত্রাণ বিতরণ করেন।

বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

এপ্রিল ২৩, ২০২০

তিন মাস ত্রাণ ও কর্মহীনদের নগদ অর্থ প্রদানের সুপারিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক : চলমান করোনা পরিস্থিতিতে দেশের সাধারণ মানুষের মাঝে তিন মাসব্যাপী ত্রাণ সরবরাহ ও কর্মহীনদের মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ করতে হবে। জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সরকারকে আট দফা প্রস্তাব দিয়েছেন বুদ্ধিজীবী ও বিশেষজ্ঞরা।

শিক্ষক, চিকিৎসক, লেখক, গবেষক ও শিল্পী সমাজের পক্ষ থেকে গতকাল দুপুরে অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে এসব প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন অর্থনীতিবিদ ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ।

এ সময় সরকারের নেয়া পদক্ষেপের বিভিন্ন ত্রুটি, অবহেলা ও সংকট পরিস্থিতি বিশদ আকারে তুলে ধরা হয়। সংবাদ সম্মেলনে মূল প্রস্তাবনা পাঠের পর আলোচনায় অংশ নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন-উত্তরের পাশাপাশি বর্তমান সংকট ও বিভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন শিক্ষক ও গবেষক অধ্যাপক তানজীম উদ্দিন খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মোশাহিদা সুলতানা, প্রাবন্ধিক ও সংগঠক ফিরোজ আহমেদ, উন্নয়ন ও অর্থনীতিবিষয়ক গবেষক মাহা মির্জা ও প্রকৌশলী ও গবেষক অনুপম সৈকত শান্ত। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সামিনা লুত্ফা।

লিখিত বক্তব্যে আনু মুহাম্মদ বলেন, আমরা লক্ষ করছি, যেসব দেশের সরকার করোনা মোকাবেলায় তড়িৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, দেশের নাগরিকদের ন্যূনতম খাদ্য আশ্রয়ের সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে ও যেসব দেশে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার দৃঢ় ভিত্তি আছে, এ সংকট মোকাবেলায় তারাই সাফল্য দেখিয়েছে। এ তিনটি ক্ষেত্রেই দুর্বলতা, শৈথিল্য, অমনোযোগ ও যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকার অভাবে বাংলাদেশ অনেক বেশি হুমকির সম্মুখীন। এ অবস্থায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি, স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে করণীয় বিষয়গুলো নির্ধারণ করে তা দেশের সর্বস্তরের মানুষ ও সরকারের কাছে উপস্থাপন করছি।

মাহা মির্জা বলেন, মানুষের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য, বাসস্থান এ ন্যূনতম চাহিদাগুলো আগে নিশ্চিত করতে হবে। অনেকে বলেন, আমাদের মতো দরিদ্র দেশের পক্ষে এসব কিছু সম্ভব না। কিন্তু যদি আমরা কিছু মেগা প্রজেক্টের খরচ দেখি, তাহলে অবাক হয়ে যাব। অথচ আমরা আমাদের বাজেটের এক শতাংশেরও কম জনস্বাস্থ্য খাতে খরচ করি। আমরা যদি বাঁচতে চাই তাহলে ভবিষ্যতে অগ্রাধিকারগুলো ঠিক করতে হবে। কৃষকের যে ফসল নষ্ট হচ্ছে, সরকার তা কিনে নিয়ে অসহায় কর্মহীন ও দুর্গতদের মাঝে বিতরণ করাই এখন অন্যতম জরুরি কাজ। তাদের আট দফা প্রস্তাবের মধ্যে কর্মহীন, মানুষদের (মজুর, বেকার, ক্ষুদে ব্যবসায়ী) ঘরে ঘরে খাদ্যসামগ্রী, নগদ অর্থ ও ত্রাণ পৌঁছানো। সব শিল্প ও প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারী, পেশাজীবীদের বকেয়া পরিশোধ করতে হবে, ছাঁটাই বন্ধ করতে হবে, ছুটিকালীন মজুরি দিতে হবে।

কোভিড-১৯সহ সব রোগের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে হবে। কভিড-১৯ চিকিৎসায় জেলা-উপজেলা পর্যায়ে স্বতন্ত্র বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন করতে হবে, প্রতি জেলায় ল্যাব স্থাপন

করে টেস্টের সংখ্যা বাড়াতে হবে। সব চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে, পর্যাপ্ত ও মানসম্মত পিপিই দিতে হবে। আবাসিক হোটেল, গেস্ট হাউজগুলোয় তাদের থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। স্বাস্থ্য খাতের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। সব কৃষক ও খামারির পণ্য বাজারজাত ও যুক্তিসংগত দামে পণ্য বিক্রি নিশ্চিত করতে হবে। সরাসরি কৃষক ও খামারির কাছ থেকে সরকারের খাদ্যপণ্য কেনার পরিধি বাড়াতে হবে। কৃষককে স্বল্প সুদে দেয়া ঋণের পরিধি ও পরিমাণ বাড়াতে হবে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত সরকার, ব্যাংক ও এনজিও প্রদত্ত ঋণের সব কিস্তি স্থগিত করতে হবে। মহাদুর্যোগ মোকাবেলায় অবাধ তথ্যপ্রবাহ এবং নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে হবে, বাজারে খাদ্যদ্রব্যসহ প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ অব্যাহত রাখতে হবে। মজুদদার, চোরাকারবারিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে, ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট ভেঙে ফেলতে হবে। সারা দেশের চাল চোর, ত্রাণ চোরদের কঠোরভাবে দমন করতে হবে। জাতীয় সক্ষমতা বিকাশে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ ও গবেষণা বাড়াতে হবে। দীর্ঘমেয়াদে উন্নয়ন দর্শনে মৌলিক পরিবর্তন আনা অপরিহার্য। জিডিপি প্রবৃদ্ধি এবং মুনাফামুখী তত্পরতা, জৌলুস ও ভবন, ব্যক্তিগত গাড়ি ও ভোগবিলাসকে উন্নয়ন হিসেবে দেখা যাবে না। জনগণের জীবন ও নিরাপত্তাকেই উন্নয়নের প্রধান শর্ত হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

প্রথম আলো

২৩ এপ্রিল ২০২০

ছুটিতে ১৮ অফিস খোলা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে কলকারখানা চালুর সুযোগ

করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সরকারি-বেসরকারি অফিসে সাধারণ ছুটির মেয়াদ ৫ মে পর্যন্ত বাড়িয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। তবে এবার অন্যান্য জরুরি সেবার পাশাপাশি ১৮টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কার্যক্রম ঢাকা ও সারা দেশে সীমিত পর্যায়ে খোলা থাকবে। এ ছাড়া ওষুধশিল্প, উৎপাদন ও রপ্তানিসহ সব কলকারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করে চালু রাখতে পারবে।

আজ বৃহস্পতিবার এ বিষয়ে দুটি পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। এতে বলা হয় সাধারণ ছুটিকালীন ঢাকাসহ সব বিভাগ এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ১৮টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ খোলা থাকবে। এই অফিসগুলো হলো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, কৃষি, বাণিজ্য, খাদ্য ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন, সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয় অন্য সব সরকারি অফিসের কর্মকর্তারা এই সময়ে আবশ্যিকভাবে নিজ নিজ কর্মস্থলে অবস্থান করবেন।

যা যা ছুটির আওতার বাইরেঅন্যদিকে ছুটির প্রজ্ঞাপনে বলা হয়,জরুরি সেবা যেমন ;বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানি, ফায়ার সার্ভিস, বন্দরগুলোর (স্থল, নদী ও সমুদ্র বন্দর) কার্যক্রম, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, টেলিফোন, ইন্টারনেট, ডাক সেবা এবং সংশ্লিষ্ট সেবাকাজে নিয়োজিত যানবাহন ও কর্মীরা এই ছুটির বাইরে থাকবেন। সড়ক ও নৌপথে সব ধরনের পণ্য পরিবহনের সঙ্গে নিয়োজিত যানবাহন (ট্রাক, লরি, কার্গো ভেসেল ইত্যাদি) চলাচল অব্যাহত থাকবে।এ ছাড়া কৃষিপণ্য, সার, কীটনাশক, খাদ্য, শিল্প পণ্য, রাষ্ট্রীয় প্রকল্পের মালামাল, কাঁচাবাজার, খাবার, ওষুধের দোকান, হাসপাতাল ও জরুরি সেবা এবং এসবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ক্ষেত্রে এই ছুটি প্রযোজ্য হবে না। চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত চিকিৎসক ও কর্মী, ওষুধসহ চিকিৎসা সরঞ্জামাদি বহনকারী যানবাহন ও কর্মী এবং গণমাধ্যমে (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক) নিয়োজিত কর্মীরা এই ছুটির আওতাবহির্ভুত থাকবেন।

এ ছাড়া ওষুধশিল্প, উৎপাদন ও রপ্তানিসহ সব কলকারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করে চালু রাখতে পারবে।

পরিস্থিতি বিবেচনা করে পরবর্তীতে শিল্প কারখানা, কৃষি ও উৎপাদন এবং সরবরাহব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলো ও গণপরিবহন পর্যায়ে উন্মুক্ত করা হবে। ছুটির সময় কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখা যাবে না। তবে জরুরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত অফিসগুলো খোলা থাকবে। এ ছাড়া মানুষের প্রয়োজন বিবেচনায় বাংলাদেশ ব্যাংক সীমিত আকারে ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু রাখার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেবে।

এবারের ছুটি নিয়ে পাঁচ দফায় ছুটি বাড়ানো হলো। করোনাভাইরাসের কারণে প্রথম দফায় ২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত ছুটি দেওয়া হয়েছিল। এরপর ছুটি বাড়িয়ে তা ১১ এপ্রিল করা হয়। ছুটি তৃতীয় দফা বাড়িয়ে করা হয় ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত। এরপর চতুর্থ দফায় ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত ছুটি বাড়ানো হয়। এবার পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে পঞ্চম দফায় ছুটি বাড়ল।

NEWAGE

Apr 20,2020

No stimulation for factories making layoffs

The government has decided that the exportoriented factories which have been announced layoff amid coronavirus outbreak would not get facility from the financial package of Tk 5,000 crore for the payment of workers' wages.In a circular issued by the finance division of finance ministry on Sunday said that the industrial units which export more than 80 per cent of its products would be entitled to get facility from the fund for

the payment of wages and allowances of workers.It said that if any industrial unit announced layoff it would not be entitled for financial support under the package.Prime minister Sheikh Hasina on March 25 announced a stimulus package of Tk 5,000 crore for export-oriented industries to fight the adverse impact of coronavirus on the country's economy saying that the fund could only be used for paying wages and allowances of workers and employees.Later on the finance ministry on April 1 revealed guidelines for disbursement of the financial package saying that industries could avail funds from the package with 2 per cent service charge to pay wages for up to three months.The guidelines also said that wages must be paid to either a bank or through mobile financial service account of workers and employees.Despite proving financial package for workers' wages from the government, many of the exportoriented industries especially owners of readymade garment factories are making layoffs using the pandemic as a pretext.Labour rights groups termed the layoff unlawful during public holiday amid coronavirus outbreak.The finance division issued the circular when trade unions raised their voices against factory layoffs and retrenchment of workers in RMG sector amid the coronavirus outbreak.The circular said that the 80 per cent export oriented industrial units (with scrutinising letter of credit documents) would get support from the package constituted for workers' wages.It also said that the deemed exporters would be entitled for working capital from the incentive package of Tk 20,000 constituted for the small and medium enterprises.They could pay their workers from the fund, the circular added. The prime minister on April 5 announced a package of Tk 20,000 crore for small and medium enterprises.She announced that the interest rate of this lending facility would be 9 per cent and the concerned industries and business organisations would pay 4 per cent while the government would provide the remaining 5 per cent as subsidy.BGMEA officials said all the factories that were shut down, had the option to follow the provisions related to layoff in labour law in this worldwide situation of pandemic.The trade body did not provide any number of factories which were made layoff during holiday.The Department of Inspection for Factories and Establishments on Friday asked its field offices to investigate whether the factory owners shut their units lawfully of not during the public holiday.

দৈনিক ইত্তেফাক

২০ এপ্রিল, ২০২০

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তরের কর্মকর্তাদের কর্মস্থলে উপস্থিত থাকার পুনঃনির্দেশ

করোনা পরিস্থিতিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাগণকে কর্মস্থলে সার্বক্ষণিক উপস্থিত থেকে অর্পিত দায়িত্ব পালনে পুনঃনির্দেশ দিয়েছে মন্ত্রণালয়।

আজ সোমবার এ সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি করেছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

ইতোপূর্বে মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা জারী করা হলেও করোনা সংকটকালীন এর কিছু ব্যত্যয় ঘটায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম এমপি'র নির্দেশে পুনরায় এ সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি করেছে মন্ত্রণালয়।

অফিস আদেশে কর্মকর্তাগণকে জরুরি চিকিৎসা, কৃত্রিম প্রজনন, টিকা প্রদান, পরামর্শ সেবা, জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কাজ এবং বিভিন্ন বয়সী হাঁস-মুরগী, গবাদিপশু, মাছের পোনা, মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, প্রাণিজাত পণ্য, পোল্ট্রি, পশু ও মৎস্য খাদ্য, কৃত্রিম প্রজননসহ প্রাণী চিকিৎসা কাজে ব্যবহৃত ঔষধ ও সরঞ্জামাদি নিরবিচ্ছিন্ন উৎপাদন, পরিবহন এবং বিপণনে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

একই আদেশে কর্মকর্তাগণকে মন্ত্রণালয়ের কন্ট্রোল রুমে যোগাযোগপূর্বক মাঠ পর্যায়ে উদ্ভূত সংকট সমাধান করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কোথাও কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটলে কন্ট্রোল রুমে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করার পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ে লিখিতভাবে জানানোরও নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে ওই অফিস আদেশে।

সমকাল

২১ এপ্রিল ২০২০

নির্মাণ শ্রমিকদের মানবেতর জীবন

আখাউড়ায় করোনার প্রভাবে কাজ নেই খাদ্যসংকট

আখাউড়ায় নির্মাণ শ্রমিকরা খেয়ে না-খেয়ে ঘরে বসে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে কাজের জন্য ঘরের বাইরে বের হতে পারছেন না উপজেলার প্রায় তিন হাজার নির্মাণ শ্রমিক। তারা নতুন বাড়িঘর নির্মাণসহ বিভিন্ন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করে দৈনিক মজুরিতে জীবিকা নির্বাহ করতেন। আরও কত দিন এভাবে কর্মহীন থাকতে হবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন নির্মাণ শ্রমিকরা।এদিকে সরকারি-বেসরকারি কোনো ত্রাণ সহায়তাও পৌঁছাইনি বলে অভিযোগ তাদের। উপজেলায় রাজমিস্ত্রি ও সহকারী মিস্ত্রি মিলিয়ে প্রায় তিন হাজার নির্মাণ শ্রমিক আছেন। এর মধ্যে পৌরশহরের দুর্গাপুর, খড়মপুর, তারাগন, নারায়ণপুর, দেবগ্রাম, উপজেলার দক্ষিণ ইউনিয়নের হীরাপুর, উত্তর ইউনিয়নের রামধননগর, আজমপুর

গ্রামে নির্মাণ শ্রমিক বেশি। এ ছাড়াও উপজেলার প্রতিটি ওয়ার্ডে কমবেশি নির্মাণ শ্রমিক রয়েছেন। তাদের আয়ের ওপর পরিবার-পরিজনসহ প্রায় ১০-১৫ হাজার মানুষ নির্ভরশীল। মূলত দৈনন্দিন আয়ের ওপরই তাদের সংসার চলে। কিন্তু করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধে সরকার গত ২৬ মার্চ থেকে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করায় আখাউড়ায় অঘোষিত লকডাউনে ঘরবন্দি হয়ে পড়েছেন তারা। বন্ধ হয়ে গেছে নতুন বাড়িঘর নির্মাণসহ উন্নয়নমূলক কাজ। কর্মহীন হয়ে আয়-উপার্জন না থাকায় অন্ধকার দেখছেন এসব নিম্ন আয়ের মানুষ। আখাউড়া পৌর এলাকার দুর্গাপুর গ্রামের রাজমিস্ত্রি খোকন মিয়া খাদেম জানান, দুর্গাপুর গ্রামে প্রায় ২০০ মিস্ত্রি ও সহকারী মিস্ত্রি আছেন। কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শ্রমিকরা না খেয়ে আছেন। যদি আরও কিছুদিন এভাবে চলতে থাকে তাহলে তাদের না খেয়েই মরতে হবে। এখন পর্যন্ত জনপ্রতিনিধি বা সরকারের পক্ষ থেকে ত্রাণ সহায়তা পাননি তারা।

আখাউড়া রাজশ্রমিক কল্যাণ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক তাহের মিয়া জানান, শ্রমিকরা দিন এনে দিনে খান। শ্রমিকরা যাতে পরিবার-পরিজন নিয়ে দু'বেলা খেতে পারেন, সেজন্য সরকারের কাছে কাজ করার সুযোগ দেওয়ার দাবি জানান তিনি।

আখাউড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাহমিনা আক্তার রেইনা জানান, নির্মাণ শ্রমিকসহ যারা জীবিকা হারিয়েছেন, তাদের তালিকা করা হচ্ছে। খুব দ্রুত তাদের সহায়তা করা হবে। এখনও যাদের নাম তালিকাভুক্ত হয়নি, তাদের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর বা ইউপি সদস্যের কাছে নাম অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দেন তিনি।

The Daily Star
Journalism Without Fear or Favour

April 21, 2020

DIFE launches telemedicine service for workers

The Department of Inspection for Factories and Establishment (DIFE) has started telemedicine healthcare services related to the coronavirus for workers in formal and informal sectors from today.Some 11 DIFE doctors will render treatment to workers, according to a statement from the DIFE.The DIFE doctors will prescribe treatment over phone during the government closure between 10am and 2pm.Workers can receive free-of-cost coronavirus related health treatment by communicating with the assigned doctors using their mobile phones.Doctors will give advice to workers and if necessary they will prescribe treatment through text messages.

DIFE doctors Nazmun Nahar from its head office can be reached at 01797011919, from Dhaka Dipa Dutta at 01714266843, Lutfun Nahar at 01972138530 and Tahmina Hossain at 01711240390.Bithi Biswas from Gazipur will provide health service at 01847129493, Rajib Chandra Dus from Narayanganj at 01722909122 and Jakia Rezwana Lotus at 01787386361, Nabin Kumar Hawlader from Barishal at 01936493427, Biswajit Roy from Chattogram at 01712383773, Md Soyaib Hossain from Khulna at 01749599797 and Md Shahidul Islam from Sylhet at 01914300917.

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

২১ এপ্রিল, ২০২০

লে-অফ' করতে যাচ্ছে চট্টগ্রামের ৬৯ কারখানা

কভিড-১৯ করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে চলমান লকডাউনের মধ্যে চট্টগ্রামের দুটি ইপিজেডের ৬৯টি কারখানা 'লে অফ' ঘোষণার উদ্যোগ নিয়েছে। কার্যাদেশ না থাকা, শিপমেন্ট না হওয়াসহ বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে দেশি-বিদেশি এসব কারখানা মালিকরা 'লে-অফ'র জন্য ইপিজেড কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছে।সোমবার পর্যন্ত চট্টগ্রাম ইপিজেডের ৪৬টি এবং কর্ণফুলী ইপিজেডের ২৩টি কারখানা এই আবেদন করেছে বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলো জানিয়েছে। সে হিসেবে ইপিজেড দুটির প্রায় ৩৫ শতাংশ কারখানা 'লে অফ'র দিকে যাচ্ছে।

কর্ণফুলী ইপিজেডে কারখানা আছে ৪১টি এবং শ্রমিক কাজ করে ৭৬ হাজারের মতো। অপরদিকে চট্টগ্রাম ইপিজেডে কারখানার সংখ্যা ১৫৮টি এবং শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় দুই লাখ।

চট্টগ্রাম ইপিজেডের জিএম খুরশিদ আলম গণমাধ্যমকে জানান, মোট ৪৬টি কারখানা কর্তৃপক্ষ লে অফের জন্য অনুমোদন চেয়েছে।

কর্ণফুলী ইপিজেডের জিএম মশিউদ্দিন বিন মেজবাহ জানান, গত ৫ এপ্রিল থেকে বিভিন্ন কারখানা কর্তৃপক্ষ লে অফের জন্য আবেদন করেছে। তাদের ইপিজেডে মোট ২৩টি কারখানা বিভিন্ন মেয়াদে লে অফের জন্য আবেদন করেছে।

এ বিষয়ে বেপজার মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) নাজমা বিনতে আলমগীর বলেন, কারখানাগুলো লে অফে গেলেও নিয়ম অনুযায়ী শ্রমিকদের সকল পাওনা পরিশোধ করতে হবে।

শ্রম আইন অনুযায়ী, লে-অফ চলাকালে প্রথম ৪৫ দিনের ক্ষেত্রে পূর্ণকালীন শ্রমিকের মোট মূল মজুরি, মহার্ঘ ভাতার অর্ধেক দিতে হয় মালিককে। পরের ১৫ দিনের জন্য শ্রমিক পাবে পাবে ২৫ শতাংশ মূল বেতন এবং বাড়ি ভাড়া।

লে-অফ ঘোষণার উদ্যোগে উদ্বেগ জানিয়েছেন শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা। তারা বলছেন, করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের মধ্যে লে অফ ঘোষণা কাম্য নয়। সরকার সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে, তার মধ্যে লে অফ শ্রমিকদের আরও 'বেশি ঝুঁকিতে ফেলে দেবে'

প্রথম আলো

২১ এপ্রিল ২০২০

করোনা: মৎস্য, পোলট্রি ও দুগ্ধ খাতে করণীয়

সমগ্র বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও কৃষি উৎপাদনব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়ায় খাদ্য-পুষ্টি নিরাপত্তার বিষয়টি সামনে চলে এসেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাণিজ্যিক কৃষির গুরুত্বপূর্ণ উপখাত, যেমন: মৎস্য, পোলট্রি ও দুগ্ধ উৎপাদন ও বিপণনব্যবস্থার ওপর করোনার কী প্রভাব পড়েছে ও পড়তে পারে এবং তা মোকাবিলায় কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে, এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এই লেখায় আলোচনার সারসংক্ষেপ ও পরামর্শগুলো তুলে ধরা হলো। ১. দেশের ডেইরি, পোলট্রি ও মৎস্য খাতে করোনাভাইরাসের কারণে বড় ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যেই সাপ্লাই চেইন ও বিপণনব্যবস্থা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হওয়ায় মাছ, মাংস, ডিম ও দুধের উৎপাদন হুমকির মুখে পড়েছে। তাই সরকারের যে প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে, তাতে ডেইরি-পোলট্রি-ফিশারিজ সেক্টরকেও জরুরি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সময়োচিত উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও মৎস্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে প্রণোদনা-সুবিধাদির সুসমন্বয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে, এটা আশা করা যায়।

২. যোগাযোগ ও বিপণনব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়ার কারণে যেহেতু এই মুহূর্তে উৎপাদিত মাছ যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রয় করা সম্ভব হচ্ছে না, তাই মৎস্যখামারিরা বেশ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। এ অবস্থায় আরও কিছুদিন চাষের মাছ পুকুরেই রেখে দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে। এ জন্য মাছ চাষের বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ চালু রাখা ও খামারিদের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে মাছের খাবারের দামের ওপর ভর্তুকি ও সহজ শর্তে ঋণসুবিধা দেওয়া দরকার।

৩. সীমিত আকারে হলেও যাতে খামারিরা মাছ বিক্রয় করে যেতে পারেন, সে বিষয়ে মৎস্য

অধিদপ্তর পরিবহন, বিপণন সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। সেই সঙ্গে যেসব উদ্যোক্তা প্রক্রিয়াজাত মাছ রপ্তানি করেন, তাঁরা খামারিদের কাছ থেকে মাছ কিনে তা বেশি করে প্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্যোগ নিতে পারেন। এই প্রক্রিয়াজাত মাছ দেশে ও দেশের বাইরে বাজারজাত করা যায়। বাংলাদেশের মতো পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও মৎস্য উৎপাদনে সম্ভাব্য ঘাটতির কারণে বিশ্বব্যাপী মাছের ব্যাপক চাহিদা তৈরি হবে। আমাদের মৎস্য রপ্তানিকারকেরা এ সুবিধা নিতে এগিয়ে আসতে পারেন। তার জন্য সরকারি প্রণোদনার ব্যবস্থা থাকতে পারে।

৪. চলাচলে বিধিনিষেধের কারণে অনেক জেলে নদীতে ও সাগরে মাছ ধরতে পারছেন না। সেই সঙ্গে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে তাঁদের জন্য জীবিকা অর্জনে যে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হচ্ছে, তাতে প্রান্তিক এসব জনগোষ্ঠী খুবই বিপদে পড়ে যাচ্ছে। তাই এই জেলেদের সরকারি সহায়তার আওতায় আনা খুবই জরুরি।

৫. এ মুহূর্তে ডেইরি ফার্মগুলোয় উৎপাদিত দুধের বাজারজাতকরণ একটি বড় সমস্যা। তা ছাড়া দুধ একটি পচনশীল দ্রব্য। তাই যথাসম্ভব এর প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার। দুভাবে খামারিদের উৎপাদিত দুধ প্রক্রিয়াজাত করা যেতে পারে: (ক) খামারিদের দেশে তৈরি ও স্বল্পমূল্যে প্রাপ্য ক্রিম সেপারেটর সরবরাহের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে, যাতে তারা নিজেরাই খামারে ঘি, মাখন প্রভৃতি বানিয়ে সংরক্ষণ করে রাখতে পারে; (খ) ঘোষ/গোয়ালা/ময়রাদের ঘি-মাখন তৈরিতে ব্যবহৃত সনাতন প্রযুক্তিগুলো ব্যবহারে দুগ্ধখামারিদের উদ্‌বুদ্ধ করার ব্যবস্থা নেওয়া যায়। (গ) দেশের বড় বড় দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য প্রস্তুতকারী কোম্পানিকে সরকারের উদ্যোগে উদ্‌বুদ্ধ করে খামারিদের উৎপাদিত দুধ থেকে যত বেশি পরিমাণ সম্ভব দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাত পণ্য (যেমন: গুঁড়ো দুধ, ঘি, মাখন ইত্যাদি) তৈরি করার প্রযুক্তি ও বিনিয়োগ সহায়তা দেওয়া যেতে পারে।

৬. বিঘ্নিত বাজারব্যবস্থার কারণে যেহেতু উৎপাদিত সব দুধ বিক্রয় সম্ভব হচ্ছে না, তাই বাছুরকে পর্যাপ্ত দুধ (সাধারণত প্রতিদিন ২-৩ লিটার) খাওয়ানোর জন্য খামারিদের পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে। এতে বাছুরগুলো, বিশেষ করে বকনা বাছুরগুলো, তাড়াতাড়ি বড় হবে ও প্রজননক্ষম হয়ে উঠবে। এভাবে দ্রুততম সময়ে দুগ্ধবতী গাভি পাওয়ার মাধ্যমে খামারিরা ক্ষতি অনেকটা পুষিয়ে নিতে পারবেন। বিজ্ঞানসম্মত এ তথ্যগুলো দুগ্ধখামারিদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

৭. পোলট্রি খাত আগে থেকেই বার্ডফ্লু রোগের ঝুঁকিতে রয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে তা আরও প্রকট হয়ে দেখা দিতে পারে। সরকার ইতিমধ্যেই এইচ৯-এন২ (H9-N2) ভ্যাকসিন আমদানির অনুমতি দিলেও তা খামার পর্যায়ে ব্যবহারের প্রয়োজনীয় অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এ ব্যাপারে সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে অবিলম্বে ওই এইচ৯-এন২ ভ্যাকসিনটি খামার পর্যায়ে ব্যবহারের ব্যবস্থা করা দরকার। এ ছাড়া এর আগে অনুমোদিত

এইচ৫-এন১ (H9-N1) ভ্যাকসিনসহ অন্যান্য পোলট্রি ভ্যাকসিনেরও খামারি পর্যায়ে সরবরাহ নিশ্চিত করা দরকার।

৮. প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উদ্যোগে খামারি প্রতিনিধি ও পোলট্রি-ডেইরি খাতের বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ে ত্রিপক্ষীয় সমন্বয় সভা করা প্রয়োজন। এর ফলে খামারিদের উৎপাদিত পণ্য বিপণনের জন্য এই খাতের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর পরিবহন, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের অবকাঠামোসমূহ কীভাবে খামারিদের কল্যাণে কাজে লাগানো যায়, সে বিষয়ে কার্যকর উপায় বের হয়ে আসবে বলে আশা করা যায়।

৯. বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) উদ্যোগে দুর্যোগের এই সময়ের জন্য ভেটেরিনারি ক্লিনিকের নেতৃত্বে একটি টেলিমেডিসিন সেন্টার গড়ে তোলা যেতে পারে। এই সেন্টারে সংযুক্ত হটলাইন নম্বরে ফোন করে খামারিরা তাঁদের প্রাণিসম্পদ-সম্পর্কিত জরুরি চিকিৎসাসেবা ও খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কীভাবে উৎপাদন খরচ কমানো যায়, সেসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবেন। এ ছাড়া বাকৃবি চত্বরে অবস্থিত বেতারকেন্দ্রের সঙ্গে সম্ভাব্য সমন্বয়ের মাধ্যমে কৃষকদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

১০. তথ্যপ্রযুক্তি (যেমন: ইউটিউব, ফেসবুক) ব্যবহার করে কৃষির বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক পরামর্শ ও নির্দেশিকা (যেমন, কীভাবে দুধ থেকে সহজে ঘি তৈরি করা যায়) বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করে প্রচারের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

১১. সরকারের স্বল্পমূল্যে খাদ্য বিতরণ কর্মসূচির আওতায় চাল-ডালের পাশাপাশি ডিম, দুধ, মাছ, মাংসও অন্তর্ভুক্ত করা যায় কি না, তার সম্ভাব্যতা বিবেচনা করা যেতে পারে।

১২. ডেইরি-পোলট্রি-ফিশারিজ সেক্টরের জরুরি প্রয়োজনে সব ধরনের উপকরণ ও পণ্যের পরিবহন যাতে নির্বিঘ্ন রাখা যায়, সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট খাতের ব্যবসায়ী ও কোম্পানিগুলোকে তাদের নিজস্ব পরিবহন ও ডেলিভারি সুবিধাদির সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া সরকারি নিয়ন্ত্রণে বিআরটিসিরি পরিবহন ব্যবস্থাকে কাজে লাগানো যায় কি না, তাও বিবেচনা করা যেতে পারে।

[আলোচনার উদ্যোক্তা ও সমন্বয়কারী: ড. এম এ সাত্তার মণ্ডল, ইমেরিটাস প্রফেসর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

আলোচকবৃন্দ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক: প্রফেসর ড. সচ্চিদানন্দ দাস চৌধুরী (পোলট্রিবিজ্ঞান বিভাগ), প্রফেসর ড. এম এ ওহাব (ফিশারিজ ম্যানেজমেন্ট বিভাগ), প্রফেসর ড. মো. রফিকুল ইসলাম (প্যাথলজি বিভাগ), প্রফেসর ড. এমদাদুল হক চৌধুরী (প্যাথলজি বিভাগ), প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাহফুজুল হক (একোয়াকালচার বিভাগ), প্রফেসর ড.

হারুনুর রশীদ (ফিশারিজ ম্যানেজমেন্ট বিভাগ), প্রফেসর ড. মো. সাইদুর রহমান (কৃষি অর্থনীতি বিভাগ), ড. মোহাম্মদ মহিউদ্দিন (সহযোগী প্রফেসর, পশুপুষ্টি বিভাগ)।

কালের কণ্ঠ

২১ এপ্রিল, ২০২০

উদ্যোক্তাদের হতাশা

শর্তের বেড়াজালে কঠিন গার্মেন্ট শ্রমিকদের প্রণোদনা তহবিল

শুরুতে ছিল প্রণোদনা। এরপর এটাকে ২ শতাংশ সুদে প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ হিসেবে দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হলো। সেই ঋণে বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগের কারখানার শ্রমিকদের বাদ দেওয়া হলো। সর্বশেষ গত ২০ এপ্রিল লে-অফ ঘোষণা করা কারখানাগুলোকেও এই প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ সুবিধা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এভাবে একের পর এক শর্ত আরোপ করায় শ্রমিকদের সুরক্ষায় ঘোষিত প্রণোদনা তহবিল নিয়ে হতাশা ব্যক্ত করেছেন উদ্যোক্তারা। যে উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী আপদকালীন তহবিলটি গঠণ করেছেন সেটির সুফল শ্রমিক-কর্মচারীরা পাবেন কিনা সেটা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন ব্যবসায়ীরা। বিশেষ করে সর্বশেষ লে-অফ করা কারখানাকে প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ না দেওয়ার সিদ্ধান্তটিতে হতাশা ব্যক্ত করেছেন তারা।

বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন-২০১৯ এর ১১ ধারা অনুযায়ী, অগ্নিকাণ্ড, মহামারী, মারাত্মক দৈব ঘটনা ও দাঙ্গা হাঙ্গামার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজন হলে লে-অফের সুযোগ আছে। লে-অফ থাকাকালীন বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইনের ১৫ ধারা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হবে। শ্রম আইনে লে-অফের ক্ষতিপূরণ হিসেবে মূল বেতনের অর্ধেকের পাশাপাশি বাড়ি ভাড়ার পুরো অংশ পাবে শ্রমিকরা। একই সাথে বোনাসও পাবে পুরোটাই। তবে আনুষঙ্গিক ভাতা যেমন চিকিৎসা ভাতা, যাতায়াত ভাতা পাবে না শ্রমিকরা। এক ক্যালেন্ডারর বর্ষের একটানা সর্বোচ্চ ৪৫ দিনের সাথে আবেদনের প্রেক্ষিতে আরো ১৫ দিন লে-অফ রাখা যাবে কারখানা। এরপরেও সমস্যা থেকে উত্তোরণ না হলে শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ সাপেক্ষে আইন অনুযায়ী ছাঁটাই করতে পারবে। তবে যাদের চাকরির বয়স ১ বছর হয়নি তারা কোনো সুবিধাই পাবে না। কার্যত এই শ্রমিকরা বেকারই হয়ে যাচ্ছে।

ব্যবসায়ীরা জানান, লে-অফ সম্পূর্ণ শ্রম আইন মেনে। এখন যদি এমন হয় যে আইন মানার কারণে তহবিল থেকে ঋণ পাওয়া যাবে না তাহলে সেই আইন করা কেন? এ কারণে তারা

উদ্যোগের কথা জানাচ্ছে বিজিএমইএকে। সরকারের সাথে দেনদরবার করছে শর্তটি বাতিল করার জন্য।

গত রবিবার বেপজা চেয়ারম্যান নিয়ন্ত্রণাধীন সব ইপিজেডের সাথে ভিডিও কনফারেন্স করেন। সেখানে গত ১৫ এপ্রিল বাংলাদেশ ব্যাংকের জারি করা সার্কুলার নিয়ে নিজেদের অসহায়ত্ব প্রকাশ করেন। ওই সার্কুলারে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড), অর্থনৈতিক অঞ্চল (ইজেড) ও হাইটেক পার্কে সি-টাইপ কারখানা (সম্পূর্ণ বাংলাদেশি মালিকানাধীন) কভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সরকার ঘোষিত বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ থেকে বেতন-ভাতা পরিশোধ করতে পারবে। অথচ দেশের ৮ ইপিজেডের চালু থাকা ৪৭৩টি কারখানার মধ্যে ৩২৫টি 'এ-টাইপ' (সম্পূর্ণ বিদেশি) ও 'বি-টাইপ' (দেশি-বিদেশি যৌথ মালিকানাধীন) এবং এসব কারখানায় প্রায় ৪ লাখ শ্রমিক কাজ করে যার শতভাগ বাংলাদেশি। কিন্তু এসব শ্রমিক অধ্যুষিত কারখানাকে শ্রমিকদের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজের বাইরে রাখায় নিজেদের আশঙ্কার কথা জানান। এই ব্যাপারে বেপজা চেয়ারম্যান সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলার আশ্বাস দেন।

এর সাথে গত ১৯ এপ্রিল অর্থমন্ত্রণালয়ের অর্থবিভাগের জারি করা আরেক সার্কুলারে লে-অফ ঘোষণা করা কারখানাগুলোকেও এই প্রণোদনা প্যাকেজ থেকে আর্থিক ঋণ ও বিনিয়োগ সুবিধার বাইরে রাখার রাখা হয়েছে। এই ঘোষণাটি মূলত দুশ্চিন্তায় ফেলেছে বেপজাকে। কারণ ইপিজেডে অনেক কারখানাকে বেপজা কর্তৃপক্ষ অনেকটা পুশ করে লে-অফ করতে বাধ্য করেছে মূলত মালিকরা যেন একটু রিলিফ পায় এবং শ্রমিকদের চাকরি যেন ঝুঁকিতে না পড়ে। সবচেয়ে বিপদে পড়েছে এখন সেই সব কারখানা।

ইপিজেডের একজন উধ্বর্তন কর্মকর্তা কালের কণ্ঠকে বলেন, 'মার্চ মাসের বেতন দিতেই হিমশিম খেতে হয়েছে অনেক কারখানায়। এখন এপ্রিল মাসের বেতনের সাথে ঈদের বোনাস পরিশোধ নিয়ে আগামী মাসে চরম অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। এ ও বি টাইপ কারখানা আগেই বাদ দেওয়া হয়েছে এর সাথে যদি লে-অফ কারখানাকেও প্রণোদনা সুবিধা না দেওয়া হয় তাহলে ইপিজেডের অন্তত ৯৫ শতাংশ কারখানা আপদকালীন সময়ের এ তহবিল সুবিধা পাবে না। অথচ এসব কারখানায় অন্তত সাড়ে ৪ লাখের বেশি বাংলাদেশী শ্রমিক কাজ করে।'

কখনও বাংলাদেশ ব্যাংক আবার কখনও অর্থমন্ত্রণালয় থেকে একের পর এক শর্তারোপ করে পেচিয়ে কঠিণ করে ফেলা হচ্ছে দাবি করে বিজিএমইএ'র সাবেক ১ম সহ-সভাপতি ও ইস্টার্ন

অ্যাপারেলসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাছির উদ্দিন চৌধুরী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'সুনির্দিষ্ট কারণে শ্রম আইন অনুযায়ী লে-অফ করা মালিকের অধিকার। এটা আইনসিদ্ধ। এখন আইন মেনে কোন সিদ্ধান্তের জন্য আপদকালীন ঋণ থেকে বঞ্চিত করা হয় তারচেয়ে এমন ঋণ না দেওয়ায় ভাল। এটা যদি প্রণোদনা হতো তাহলেও কথা ছিল।'

তিনি বলেন, 'আমার ধারণা নীতি নির্ধারকরা প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করতে পারছেন না। আমলারা একতরফাভাবে একের পর এক শর্ত আরোপ করে প্রধানমন্ত্রীর মহৎ উদ্দেশ্যটিকে কঠিণ করে ফেলছেন।'

শ্রমিকদের প্রণোদনা তহবিলে লে-অফের শর্ত আরোপ করে শ্রমিকদের চাকরিকে আরো ঝুঁকির মধ্যে ফেলা হয়েছে দাবি করে চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের পরিচালক ও প্যাসিফিক জিন্স গ্রুপের পরিচালক সৈয়দ মোহাম্মদ তানভীর বলেন, 'যারা চিন্তা করেছিল তহবিল থেকে স্বল্পসুদে টাকা ঋণ নিয়ে লে-অফ চলাকালীন শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করবেন তারা সমস্যায় পড়ে যাবেন। এতেকরে শ্রমিকদের চাকরি আরো ঝুঁকির মধ্যে পড়বে। কারণ লে-অফ স্থগিত করে কারখানা খুললে উদ্যোক্তারা আরো ক্ষতির সম্মূখীন হবেন।'

তিনি বলেন, 'বিদেশি ও যৌথ মালিকানার কারখানার পাশাপাশি লে-অফ কারখানাও তহবিলের আওতার বাইরে থাকলে তাহলে সর্বোচ্চ ২০ থেকে ২৫ শতাংশ গার্মেন্ট এই সুযোগ নিতে পারবেন। ৫ হাজার কোটি টাকার তহবিলও অব্যবহৃত পড়ে থাকবে। তাতে প্রধানমন্ত্রী যেই উদ্দেশ্যে আপদকালীন ফান্ডটি গঠন করেছেন সেই উদ্দেশ্যই সফল হবে না।'

বিজিএমইএ পরিচালক ও মদিনা গার্মেন্টসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মুসা বলেন, 'আপদকালীন তহবিলের এসব শর্ত নিয়ে আমাদের নের্তৃবৃন্দ কাজ করছেন। সরকারকে প্রকৃত অবস্থা বুঝতে হবে। শ্রমিকদের জন্য দিয়েছে তাহলে সেই তহবিলে কর্মকর্তাদের বেতন দেওয়া যাবে না কেন? এটাতো ঋণ প্রণোদনা না। আইন মেনে লে-অফের পর সেই আইন মানার জন্য যদি ঋণ বঞ্চিত করা হয় তবে সেটা হবে দ্বৈত নীতি।'

প্রথম আলো

২১ এপ্রিল ২০২০

১৫ দিনে মোবাইল ব্যাংকিং হিসাব খুলেছেন ২৬ লাখ শ্রমিক

বেতন-ভাতা পেতে নতুন করে প্রায় ২৬ লাখ শ্রমিক মোবাইল ব্যাংকিং হিসাব খুলেছেন। গত ১৫ দিনে এসব হিসাব খোলা হয়েছে। নতুন করে শ্রমিকের হিসাব খেলায় শীর্ষে রয়েছে দেশের সবচেয়ে বড় মোবাইলে আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান (এমএফএস) বিকাশ। এরপর ডাচ্–বাংলা ব্যাংকের 'রকেট' ও ডাক বিভাগের আর্থিক সেবা 'নগদ'–এ বেশি হিসাব খোলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে খোঁজ নিয়ে এ তথ্য পাওয়া গেছে।রপ্তানিমুখী কারখানার শ্রমিকদের বেতন দিতে পাঁচ হাজার কোটি টাকার তহবিল গঠন করেছে সরকার। ওই তহবিল পরিচালনার নীতিমালা দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। নীতিমালা অনুযায়ী, বেতনের টাকা সরাসরি শ্রমিকের হিসাবে পাঠিয়ে দেবে ব্যাংকগুলো। যাঁদের হিসাব নেই, তাঁদের জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) ও জন্মনিবন্ধন সনদের ভিত্তিতে মোবাইল ব্যাংকিং হিসাব খোলার উদ্যোগ নিতে বলা হয়। আবার শ্রমিকেরা চাইলে বিনা মাশুলে ব্যাংক হিসাবও খুলতে পারবেন বলে নীতিমালায় বলা হয়।

নীতিমালা অনুযায়ী, মজুরির টাকা সরাসরি শ্রমিকের ব্যাংক হিসাব বা মোবাইল ব্যাংকিং হিসাবে পাঠিয়ে দেবে ব্যাংক। এ জন্য এমএফএস প্রতিষ্ঠানগুলোকে ২০ এপ্রিলের মধ্যে রপ্তানিমুখী কারখানার শ্রমিকের হিসাব খুলতে বলা হয়। এরপর এমএফএস প্রতিষ্ঠান ও কারখানাগুলো হিসাব খোলার উদ্যোগ নেয়। ৬ থেকে ২০ এপ্রিলের মধ্যে বিকাশে সাড়ে ১২ লাখ নতুন হিসাব খোলা হয়।

বিকাশের যোগাযোগ বিভাগের প্রধান শামসুদ্দিন হায়দার প্রথম আলোকে বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনার পর প্রায় নতুন করে সাড়ে ১২ লাখ হিসাব খোলা হয়েছে, এর বড় অংশই পোশাক খাতের শ্রমিকের। আমরা নিজেরা অনেক হিসাব খুলেছি। আবার কারখানাগুলোর উদ্যোগে এবং অনেক শ্রমিক নিজ উদ্যোগে হিসাব খুলেছেন।

বেসরকারি খাতের ডাচ্–বাংলা ব্যাংকের সেবা রকেট প্রায় ৭ লাখ নতুন হিসাব খুলেছে। আগে থেকে দেশের প্রায় সাড়ে ৬০০ প্রতিষ্ঠানের বেতন-ভাতা পরিশোধ করা হয় রকেট হিসাবের মাধ্যমে। এর বেশির ভাগই পোশাক খাতের প্রতিষ্ঠান। প্রতি মাসে রকেটের মাধ্যমে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা বেতন দেওয়া হয়।

ডাচ্–বাংলা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবুল কাশেম মোহাম্মদ শিরিন প্রথম আলোকে বলেন, 'নতুন করে ৭ লাখ শ্রমিকের মোবাইল ব্যাংকিং হিসাব খোলা হয়েছে। এর ফলে আমাদের মোট হিসাব সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১ কোটি ৯০ লাখ। হিসাব খোলা এখনো অব্যাহত আছে।'

এদিকে সরকারের ডাক বিভাগের সেবা 'নগদ' নতুন করে ৬ লাখ ৯৭ হাজার ২০০ হিসাব খুলেছে। এর মধ্যে বিজিএমইএ সদস্যভুক্ত কারখানার ৪ লাখ ৬৮ হাজার ২০০ ও বিকেএমইএ সদস্য কারখানার ২ লাখ ২৯ হাজার।

নগদের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তানভীর আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, 'কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনার পর আমরা নতুন করে প্রচার প্রচারণা চালিয়েছি। শ্রমিকদের হিসাব খোলার জন্য নানাবিধ উদ্যোগ নিয়েছি। এর ফলে প্রায় ৭ লাখ নতুন করে হিসাব খোলা সম্ভব হয়েছে। এখনো হিসাব খোলা

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

২৩ এপ্রিল, ২০২০

পরিস্থিতি বিবেচনা করে গণপরিবহন উন্মুক্ত করা হবে

সাধারণ ছুটিতে পরিস্থিতি বিবেচনা করে পরবর্তীতে শিল্প-কারখানা, কৃষি এবং উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলো ও গণপরিবহন পর্যায়ক্রমে উন্মুক্ত করা হবে। বৃহস্পতিবার দুপুরে সাধারণ ছুটি বাড়িয়ে ৫ মে পর্যন্ত করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন জারি করে। সেখানেই এই নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

এছাড়া ছুটিকালে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা রাখা যাবে না বলেও জানানো হয়েছে। তবে, বিভাগ/জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত সব কর্মকর্তা/কর্মচারীকে দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে নিজ নিজ কর্মস্থলে অবস্থান করতে হবে।

বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, ফায়ার সার্ভিস, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, টেলিফোন, ইন্টারনেট ইত্যাদি জরুরি পরিসেবার ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে না। কৃষি পণ্য, সার, কীটনাশক, জ্বালানি, সংবাদপত্র, খাদ্য, শিল্পপণ্য, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, জরুরি ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য পরিবহন এবং কাঁচা বাজার, খাবার, ওষুধের দোকান ও হাসপাতাল এ ছুটির আওতা বহির্ভূত থাকবে।

করোনা সংক্রমণ রোধে প্রথমে ২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়। এরপর ৪ এপ্রিল থেকে ১১ এপ্রিল ও পরে তা বাড়িয়ে ১৪ এপ্রিল এবং চতুর্থ দফায় ১৪ এপ্রিল থেকে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত ছুটি বাড়ায় সরকার।

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

২৩ এপ্রিল, ২০২০

সংরক্ষণ করা যাচ্ছে না পাহাড়ের আনারস, ক্ষতির মুখে চাষীরা

কাউখালী (রাঙ্গামাটি) সংবাদদাতা: **পার্বত্য চট্টগ্রামের আনারসের রাজধানীখ্যাত রাঙ্গামাটির নানিয়াচর উপজেলায় এবারও সর্বোচ্চ আনারস চাষ হয়েছে। চাষীরা বলছেন, ব্যাপক ফলন হলেও সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হবে তাদের ক্ষেতের ফসল। দীর্ঘদিনের দাবি সত্ত্বেও কোল্ডস্টোরেজ না থাকায় প্রতি বছর লাখ টাকা লোকশান গুনতে হচ্ছে।**

এদিকে জেলার হাট-বাজারগুলোতে আনারসের মিষ্টি গন্ধে মুখরিত। জেলার নানিয়ারচরসহ পাহাড়ের বিভিন্ন এলাকা থেকে নৌকা বোঝাই করে শহরের বিভিন্ন হাট-বাজারগুলোতে আনারস নিয়ে আসছেন বাগান চাষীরা। তবে নিরানন্দ তাদের মুখগুলো।

রাঙ্গামাটি জেলা সদরের কয়েকটি পাইকারি বাজার ঘুরে দেখা গেছে, প্রতিটি আনারস বিক্রি হচ্ছে দুই থেকে তিন টাকায়। শহরের বনরূপা বাজারের সমতাঘাটে পাইকারি আনারস ব্যবসায়ী বশির মিয়া বলেন, আমি এখান থেকে আনারস কিনছি চট্টগ্রামে অক্সিজেন নিয়ে যাবো। প্রতিটি আনারস আমার ৭-৮ টাকা করে কিনতে হচ্ছে। চট্টগ্রাম পর্যন্ত নিতে গাড়ি ভাড়াসহ আমার প্রতিটি আনারসের দাম পড়বে ১২-১৫ টাকা। এরমধ্যে কিছু পঁচে নষ্ট হয়ে যাবে। তিনি আরও বলেন, গাড়ি প্রতি কোনো সময় দুই থেকে চার হাজার টাকা লাভ হয় আবার কোনো গাড়িতে ৭-৮ হাজার টাকা লোকসান হচ্ছে।

সরেজমিনে, বাজারগুলোতে আনারসসহ মৌসুমি ফলমূলে ভরপুর থাকলেও বাজারগুলো ক্রেতা শূন্য। করোনা ভাইরাসের কারণে মানুষ এখন ঘরবন্দি। বিক্রিবাট্টা নেই বললেই চলে।

বেশ কয়েকজন আনারস চাষীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, নানিয়ারচরসহ জেলার বিভিন্ন পাহাড়ি এলাকায় আনারসের ব্যাপক চাষাবাদ হচ্ছে। উৎপাদিত আনারস বর্তমানে জেলা সদর, রাজধানী ঢাকা, শরীতপুর, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন বাজারে বেচাকেনা হচ্ছে। স্থানীয় বাজার ছাড়িয়ে রাঙ্গামাটির আনারস যাচ্ছে বিভিন্ন জেলায়। তারা আরও জানান, এবছর আনারসের বাম্পার ফলন হলেও ন্যায্য দাম পাওয়া যাচ্ছে না। ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় আনারসের চাহিদা থাকলেও করোনা ভাইরাসের কারণে অনেকটাই কমে গেছে। তবে বাগানে আনারস পেঁকে যাওয়ায় এবং পচে নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় কম দামে বিক্রি করে দিতে হচ্ছে। এবছর বাগানের খরচ পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে না।

রাঙ্গামাটি কৃষি স¤প্রসারণ অধিদফতরের উপ-পরিচালক পবন কান্তি চাকমা বলেন, আনারসের উৎপাদন হয় সাধারণত বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে। কিন্তু বর্তমানে যে আগাম আনারসের উৎপাদন হচ্ছে, সেগুলো বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিতে হরমোন জাতীয় রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারে করে। এবছর দুই হাজার ১৫০ হেক্টর জমিতে আনারস চাষ হয়েছে। গত বছরের তুলনায় এবছর চাষ বেশি এবং ফলন ভালো হয়েছে। তবে চাষীরা দাম পাচ্ছেন না। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে কৃষি সম্প্রসারণের ব্যবস্থাপনায় রাঙ্গামাটিতে কৃষকদের জন্য ৪ হাজার বিঘা জমিতে আউশ বীজ ধানের প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে। যদি কোনো আনারস চাষী আউশ ধানের চাষ করতে চায় তাকেও প্রণোদনা আওয়তায় আনা হবে।

কালের কণ্ঠ

২৩ এপ্রিল, ২০২০

সতর্কতার সঙ্গে কারখানা খোলা যেতে পারে

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ এখন আমাদের দেশে বাড়ছে। মৃত্যুর হারও বেশি মনে হচ্ছে। এই অবস্থায় সংক্রমণ রোধে সবার ঘরে থাকা প্রয়োজন। সরকারও সাধারণ ছুটির মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটি ভালো পদক্ষেপ, কিন্তু একই সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে। কিছু কিছু দেশ ইতিমধ্যেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে ‘লকডাউন’ শিথিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমাদের দেশেও সতর্কতার সঙ্গে এ বিষয়টি নিয়ে ভাবার প্রয়োজন আছে।

ধান কাটার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এক এলাকার শ্রমিকদের অন্য এলাকায় নেওয়ার ক্ষেত্রে এখন তেমন বাধা নেই। ছাত্রলীগ এ বিষয়ে সহযোগিতা করছে। এটি প্রশংসনীয়। কিন্তু কৃষক লীগ কী করছে? যাদের কৃষকদের নিয়ে বেশি চিন্তা করার কথা তাদেরই মাঠে দেখা যাচ্ছে না।

আমি নিজেও প্রায় ঘরবন্দি অবস্থায়। সংবাদমাধ্যম থেকেই খবরাখবর পাচ্ছি। সামাজিক দূরত্ব রক্ষা, ‘লকডাউন’ বাস্তবায়ন—এসব নিয়ে পুলিশ প্রশাসন যথেষ্ট তৎপর বলেই মনে হয়। তার পরও অনেক লোক বাইরে বের হচ্ছে। ঘরবন্দি থাকার সামর্থ্য তো সবার নেই। এই অবস্থায় যারা জরুরি প্রয়োজনে বাইরে বের হচ্ছে তাদের নিজে থেকেই সচেতন থাকতে হবে। আর অর্থনৈতিক বিপর্যয় কমিয়ে আনতে কিছু কিছু খাত, কিছু কিছু কলকারখানা খুলে দেওয়ার বিষয়টি চিন্তা করা যেতে পারে। স্বাস্থ্যবিধি মেনেই এগুলো করা যেতে পারে।

লেখক : তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা

কালের কণ্ঠ

২৩ এপ্রিল, ২০২০

জনপ্রশাসনের প্রজ্ঞাপন
দুই শর্তে সকল কারখানা খোলার অনুমতি দিল সরকার

বাহরাম খান : শর্ত সাপেক্ষে সকল কলকারখানা খোলার অনুমতি দিল সরকার। শ্রমিকদের নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করে ঔষধ, উৎপাদন ও রপ্তানিমুখী শিল্পসহ সকল কারাখানা খোলা রাখা যাবে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিধি-৪ শাখা থেকে জারি করা প্রজ্ঞাপনের ২ (ঙ) নং শর্তে বলা হয়েছে, 'ঔষধশিল্প, উৎপাদন ও রপ্তানিমুখী শিল্পসহ সকল কলকারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করে চালু রাখতে পারবে।' তবে কবে থেকে কলকারখানা খোলা রাখা যাবে সে বিষয়ে প্রজ্ঞাপনে কিছু বলা হয়নি।এ বিষয়ে মন্তব্য জানতে চাইলে জনপ্রশাসন সচিব শেখ ইউসুফ হারুন বৃহস্পতিবার বেলা সোয়া তিনটার দিকে কালের কণ্ঠ'কে বলেন, 'হ্যাঁ, সরকার শর্ত সাপেক্ষে সকল কলকারখানা খোলার সুযোগ দিয়েছে।' এ বিষয়ে পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,' আপনি যা বুঝেছেন, আমিও তাই বুঝতে পেরেছি।' অর্থ্যাৎ শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করে সকল কলকারখানা খোলা রাখতে পারবে।

এছাড়া প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, দেশব্যাপী সাধারণ ছুটি থাকাকালীন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা যাবে না। এ সময় সীমিত আকারে ১৮টি মন্ত্রণালয় খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এসব সিদ্ধান্তের বিষয়ে পৃথক দুইটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। উভয় প্রজ্ঞাপনে একটিতে ছুটি বাড়ানোর সঙ্গে নতুন কিছু শর্ত যোগ করা হয়েছে। অন্যটিতে সীমিত আকারে যে ১৮ টি মন্ত্রণালয় খোলা থাকবে সে বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে জরুরী কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য অফিস ও পরিবহণও ছুটির আওতামুক্ত থাকবে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে প্রথম দফা জারি করা প্রজ্ঞাপনে ছুটির বিষয়ে বলা হয়েছে, সাপ্তাহিক ছুটি ও সাধারণ ছুটির ধারাবাহিকতায় আগামী ২৬ এপ্রিল হতে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত এবং ৩ মে হতে ৫ মে পর্যন্ত ছুটি থাকবে। এই ছুটির সঙ্গে ১ ও ২ মে সাপ্তাহিক ছুটি যুক্ত থাকবে। তবে ছুটিকালীন সময়ে জরুরি পরিষেবা, যেমন-বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানী, ফায়ার সার্ভিস, বন্দরসমূহের (স্থলবন্দর, নদীবন্দর ও সমুদ্রবন্দর) কার্যক্রম, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, টেলিফোন ও ইন্টারনেট, ডাক সেবা এবং এ সংশ্লিষ্ট সেবা কাজে নিয়োজিত যানবাহন; সড়ক ও নৌ পথে সকল প্রকার পণ্য পরিবহনের কাজে নিয়োজিত যানবাহন (ট্রাক, লরি, কার্গো ভেসেল প্রভৃতি) চলাচল করবে। এছাড়া কৃষি পণ্য, সার, কীটনাশক, খাদ্য শিল্প পণ্য, রাষ্ট্রীয় প্রকল্পের মালামাল, কাঁচা বাজার, খাবার, ঔষধের দোকান, হাসপাতাল ও জরুরি সেবা এবং এ সবের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ক্ষেত্রে এ ছুটি প্রযোজ্য হবে না।

একইসঙ্গে চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত চিকিৎসক ও কর্মী এবং ঔষধসহ চিকিৎসা সরঞ্জামাদি বহনকারী যানবাহন ও কর্মী, গণমাধ্যমে (ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া) নিয়োজিত কর্মীগণ এ ছুটির আওআবহির্ভুত থাকবে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে পরবর্তীতে শিল্প- কারখানা, কৃষি এবং উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলো ও গণপরিবহন পর্যায়ক্রমে উন্মুক্ত করা

হবে। আর ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালুর বিষয়ে সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেবে বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে আজ বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় দফা জারি করা প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে সীমিত আকারে ১৮টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ খোলা থাকবে। এর মধ্যে রয়েছে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, জননিরাপত্তা বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মৎস ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

২৩ এপ্রিল, ২০২০

চলনবিলে বোরো ধান কাটতে আসবে ১৪ হাজার শ্রমিক

নাটোর প্রতিনিধি : চলমান করোনাভাইরাস দুর্যোগে কৃষি প্রধান চলনবিল অঞ্চলে বোরো ধান কাটতে কোন শ্রমিক সংকট হবে না। স্থানীয় শ্রমিক ছাড়াও প্রতি বছরের চাহিদা অনুযায়ী এবছরেও নাটোরের সিংড়া উপজেলায় বোরো ধান কাটতে পাবনা, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, বগুড়া ও গাইবান্ধাসহ ১৬টি জেলা থেকে প্রায় ১৪ হাজার শ্রমিক আসবেন। এরই মধ্যে এই অঞ্চলে আগাম জাতের বোরো ধান কাটতে বিভিন্ন জেলা থেকে শ্রমিকরা এসে ধান কাটা শুরু করেছেন। ধান কাটা মৌসুম শুরু হলে সঠিক সময়ের মধ্যেই শ্রমিকরা এসে প্রতিবছরের মত ধান কেটে কৃষকের ঘরে তুলে দিবেন। এমনটাই তথ্য জানালেন সিংড়া উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিস।

এ বিষয়ে কৃষি অফিসার মো. সাজ্জাদ হোসেন বলেন, সিংড়া উপজেলায় প্রতি বছর বোরো ধান কাটার এই মৌসুমে স্থানীয় শ্রমিক ছাড়াও চাহিদা অনুযায়ী ১৬টি জেলা থেকে প্রায় ১৪ হাজার শ্রমিক আসেন। এবছর করোনার কারণে যাতে শ্রমিক সংকট না হয় সেজন্য গত ১ সপ্তাহ আগে থেকেই প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের সহযোগিতায় সংশ্লিষ্ট জেলার প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। শ্রমিকদের চলাচলের সমস্যা হবে না। শ্রমিকরা প্রশাসনের সহযোগিতাই ধান কেটে নিরাপদে বাড়ি ফিরবেন। কাজেই সিংড়ার চলনবিল এলাকায় ধান কাটা নিয়ে কোনও শ্রমিক সংকট হবে না আশা করি।

এদিকে জমিতে আধা পাকা ধান রেখে যতই দিন যাচ্ছে ততই শঙ্কা বাড়ছে কৃষকদের। একদিকে করোনার আতঙ্কে শ্রমিক সংকটের শঙ্কা অন্যদিকে ঝড়-বৃষ্টিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের শঙ্কায় নির্ঘুম
রাত কাটছে তাদের। ইতিমধ্যে এই অঞ্চলে আগাম জাতের কিছু মিনিকেট ধান কাটা শুরু হয়েছে। আর এই আগাম জাতের ধান কাটতে বিভিন্ন জেলা থেকে কিছু শ্রমিক দলও এসেছে। এসব

কৃষকদের সাথে যোগাযোগ করা হলে তার জানান, প্রতি বছর যে সকল শ্রমিকরা আসেন তারাই এসে ধান কাটছেন।

উপজেলার ডাহিয়া ইউনিয়নের পূর্বভেংরী গ্রামের কৃষক হাবিব দুলাল বলেন, গত তিনদিন আগে থেকে ধান কাটা শুরু করেছি। আমার বাড়িতে জয়পুরহাট থেকে ৬৫ জন শ্রমিক এসেছেন। তারা প্রতি বছরই আসেন। প্রায় ২০০ বিঘা মিনিকেট ধানের মধ্যে তিন দিনে ৩০ বিঘা কাটা হয়েছে। বাকি ধান কাটতে ১০ থেকে ১২ দিন সময় লাগবে।

চৌগ্রাম ইউনিয়নের হুলহুলিয়া সামাজিক উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পরশ তৌফিক বলেন, আমার গ্রামে প্রায় দুইশ' শ্রমিক এসে ছেন। এরা বেশির ভাগ লালপুর, বাগাতি পাড়া ও রাজশাহীর চারঘাট এলাকা থেকে এসেছেন। করোনাভাইরাস রোধে গ্রামবাসীর সিদ্ধান্ত অনুয়ায়ী বিশেষ ব্যবস্থায় জমির কাছে পুকুর পাড়ে শ্রমিকদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারা নিজেরাই রান্না করে খাচ্ছেন। এতে গ্রামের লোকজনের সাথে সামাজিক দূরত্ব বজায় থাকছে।

উপজেলা কৃষি অফিসের তথ্য মতে চলতি মৌসুমে উপজেলায় বোরো ধানের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৩৪ হাজার ৫শ' হেক্টর জমি। সেখানে লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে বোরো ধানের চাষ হয়েছে ৩৬ হাজার ৬শ' ৫০ হেক্টর।

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

২৩ এপ্রিল, ২০২০

শ্রমিকদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করলেন নৌ প্রতিমন্ত্রী

করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় প্রায় এক মাস ধরে অঘোষিত লকডাউন চলছে সারাদেশে। এমন পরিস্থিতিতে কষ্টে জীবন যাপন করছেন খেটে খাওয়া মানুষগুলো। তাই সরকারের পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগেও অনেকে এসেছেন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে।

ঢাকার সদরঘাট টার্মিনাল এলাকায় নৌ-পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী দুই হাজার নৌ শ্রমিককে চাল, ঢাল, আলু, তেল পিয়াজ ও লবণসহ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে।

এ সময় প্রতিমন্ত্রী বলেন চলমান পরিস্থিতিতে দেশে কোন মানুষ না খেয়ে থাকবেনা। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী দেশে সকল ঘরে ঘরে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া অব্যাহত থাকবে।

এসময় বিআইডব্লিউটিএর চেয়ারম্যান কমান্ডো গোলাম সাদেক ও ঢাকা নদী বন্দর যুগ্ম পরিচালক একেএম আরিফ উদ্দিন সহ নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিমন্ত্রী এর আগে, ঢাকার উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকাবাসীর জন্য এক হাজার প্যাকেট খাদ্যসামগ্রী মেয়র আতিকুল হক চৌধুরী হাতে তুলে দিয়েছেন এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এডভোকেট আসাদুজ্জামান খান এমপির এলাকাবাসী জন্য দুই হাজার পরিবারকে খাবার প্যাকেট দেওয়া হয়েছে।

কালের কণ্ঠ

২৪ এপ্রিল ২০২০

রানা প্লাজা ধসের সাত বছর আজ
পোশাকশিল্পের আবার দুর্দিন

এম সায়েম টিপু : ২০১৩ সালে রানা প্লাজা ধসের পর পোশাকশিল্পে দুর্দিন দেখা দেয়। ওই সময় সংকটে পড়ে দেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান উৎস পোশাকশিল্প। তবে কমপ্লায়েন্স ইস্যুতে বৈশ্বিক ক্রেতাদের নানামুখী শর্ত পূরণ করে গত সাত বছরে আবারও ঘুরে দাঁড়িয়েছিল পোশাক খাত। তবে এই ঘুরে দাঁড়ানো স্থায়ী হয়নি। বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাস পোশাক খাতকে আবারও অস্থির করে তুলেছে। বিদেশি বড় ক্রেতারা একের পর এক চাহিদা বাতিল ও স্থগিত করছেন।

বাংলাদেশে করোনাভাইরাস সংক্রমণ হওয়ার পর কারখানা বন্ধ ও লোকসানের অজুহাতে পোশাক খাতে এখন পর্যন্ত ২৫ হাজার শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন শ্রমিক নেতারা। গতকাল বৃহস্পতিবার বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত এক ভার্চুয়াল আলোচনায় শ্রমিক নেতারা আরো অভিযোগ করেন, পোশাক খাতে এখনো যেসব শ্রমিকের চাকরির মেয়াদ এক বছর হয়নি, তাঁদের মালিকদের পক্ষ থেকে ফোন করে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে। অনেক শ্রমিক এখনো মার্চ মাসের বেতন পাননি। তা ছাড়া অনেক কারখানার মালিক কারখানা লে-অফ করতে যাচ্ছেন।

প্রশ্ন উঠেছে, বিদেশি ক্রেতাদের চাহিদামতো নানামুখী শর্ত পালন করেছেন পোশাক কারখানার মালিকরা। কিন্তু নতুন করে সংকট তৈরি হলেও বৈশ্বিক ক্রেতারা পাশে নেই কেন। ওয়ালমার্ট, গ্যাপ, টার্গেট, মার্ক অ্যান্ড স্প্যাসারসহ বিশ্বের বড় বৈশ্বিক ক্রেতারা যেসব পণ্য বিশ্ববাজারে সরবরাহ করেন তার বড় অংশের জোগান দেন বাংলাদেশের সাধারণ খেটে খাওয়া শ্রমিকরা।

এসব শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি দিয়ে ক্রেতারা তাঁদের পুঁজিকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে অনেক বড় আকারে নিয়ে গেলেও শ্রমিকরা এখন কপর্দকশূন্য।

শ্রমিকদের বর্ণনা মতে, বেতন-ভাতা যথাসময়ে না পাওয়ায় অনেক রাতে তাঁদের ঘুমাতে যেতে হয় খালি পেটে। অথবা এক মুঠো মুড়ি বা চিঁড়া খেয়ে। তাই সবাই যখন করোনার সংক্রমণ থেকে নিজেদের সুরক্ষা দিতে নিরাপদ বাড়িতে অবস্থান করছেন, তখন গার্মেন্ট শ্রমিকরা করোনার ঝুঁকি নিয়ে রাস্তায় নেমেছেন মজুরির দাবিতে। বাড়িওয়ালারা তাঁদের ঘর থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন।

২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল সাভারে রানা প্লাজা ধসের ঘটনা ঘটে। ওই ভবন ধসে প্রায় ১১০০ শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছেন। এরপর গত সাত বছরে পোশাক খাতের কারখানা অবকাঠামো, কর্মপরিবেশ ও বৈদ্যুতিক সংস্কারসহ প্রায় আড়াই শ কোটি ডলার ব্যয় করেন পোশাক খাতের উদ্যোক্তারা। এর ফলে গত সাত বছরে আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে এ খাত। তবে করোনার কারণে আবারও ধ্বংসযজ্ঞের মুখে পড়েছে পোশাক খাত।

পোশাক খাতের উদ্যোক্তারা বলছেন, মার্চের বেতন দিতে পারেনি বেশ কিছু কারখানা। মূলত বিদেশি ক্রেতাদের ক্রয়াদেশ বাতিল হওয়ায় এমন সংকট সৃষ্টি হয়েছে। প্রায় দুই থেকে আড়াই শ কারখানা মালিক শ্রমিকদের মজুরি পরিশোধ করতে পারছেন না। ফলে ওই সব কারখানার শ্রমিকরা মাঠে নামছেন মজুরির দাবিতে। করোনা সংকটময় পরিস্থিতিতে পোশাক খাতের জন্য সরকার প্রণোদনা ঘোষণা করেছে, কিন্তু এই টাকা কবে পাওয়া যাবে জানেন না ব্যবসায়ীরা।

তাঁরা আরো বলেন, রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর গত সাত বছরে সামর্থ্য না থাকলেও ক্রেতাদের চাপে ব্যবসা ও শ্রমিক স্বার্থরক্ষায় কারখানা সংস্কার করা হয়েছে। কয়েক হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছেন মালিকরা। অন্যদিকে ক্রেতারা পণ্যের এক টাকাও দাম বাড়াননি। এর মধ্যে করোনার প্রভাব ও ক্রেতারা উৎপাদিত পণ্য নিতে কোনো সাড়া দিচ্ছেন না। অনেক ক্রেতাই নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে ক্রয়াদেশ বাতিল করছেন। ফলে তাঁদের পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে।

পোশাক খাতের উদ্যোক্তাদের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএ সভাপতি রুবানা হক কালের কণ্ঠকে বলেন, ক্রেতাদের এমন আচরণে গত মার্চ মাসে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি আয় কমেছে ৩০.১৯ শতাংশ। মার্চ থেকে মে পর্যন্ত এই তিন মাসে প্রায় ৫০০ কোটি ডলার (৪.৯ বিলিয়ন ডলার) রপ্তানি আয় কম হওয়ার আশঙ্কা করছেন তিনি।

বাণিজ্য বিশ্লেষকরা বলেন, দুর্যোগের এই সময় শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকার পাশে না দাঁড়িয়ে পেছন থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন ক্রেতারা। এতে করে ৬৫ শতাংশ নারী পোশাক শ্রমিক, যাঁদের বয়স ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে, তাঁরা মজুরি না পেয়ে গ্রামে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন। ১৫৮টি ছোট কারখানার শ্রমিকরা বেতন না পাওয়ায় মাঠে নেমেছেন মজুরির দাবিতে। ক্রেতারা আদেশ বাতিল করায় এই মুহূর্তে পুরো পোশাক খাত ভয়ংকর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি।

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলওর পরিচালক টুমো পটিআইনেন কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘করোনাভাইরাসের এই সংকটের সময় ব্র্যান্ড, উৎপাদক, সরকার, শিল্প ও এর শ্রমিক সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। সংকট কাটিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে আইএলও কাজ করছে। শুধু পোশাক খাতই নয়, সব খাতের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলছি। আশার কথা, পোশাক

খাতের কিছু ক্রেতা সম্প্রতি পাওনা দিয়ে তাঁদের তৈরি পোশাক নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অন্যদের এ বিষয়ে দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান সানেমের নির্বাহী পরিচালক ড. সেলিম রায়হান কালের কণ্ঠকে বলেন, করোনার এই সংকট থেকে উত্তরণে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। বৈশ্বিক ক্রেতারাও এর দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। কার্যাদেশ বাতিল বা ডিসকাউন্ট সুবিধা চাওয়ার চেয়ে আমাদের শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকার দায়িত্ব নিতে হবে যৌক্তিকভাবে।' তিনি আরো বলেন, তাঁরা ক্রয়াদেশ বাতিল করতে পারেন না। বাংলাদেশের পোশাক খাত ক্ষতিগ্রস্ত হলে বৈশ্বিক বাজারেও এর প্রভাব পড়বে। পোশাকের মূল্য বেড়ে যাবে। বাংলাদেশেই কম দামে পোশাক সরবরাহ করতে হবে। এ ছাড়া এসব বৈশ্বিক ক্রেতারা আমাদের এই শ্রমিকদের দিয়ে বিপুল পরিমাণ মুনাফা করেছেন বিশ্ব বাজার থেকে।

শ্রমিক নেতা আমিরুল হক আমিন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ক্রেতাদের এই অন্যায় ও বেআইনি আচরণ বন্ধ হওয়া উচিত। রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর ক্রেতারা শ্রমিকপক্ষে যেভাবে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, আমরা চাই করোনা দুর্যোগের সময়ও তাঁরা পাশে থাকবেন। আমাদের উদ্যোক্তাদের প্রাপ্য পাওনা দ্রুত পরিশোধ করতে হবে।' তিনি বলেন, যুক্তরাজ্যের ডেবেনহাম গ্রুপ দেশের চারটি কারখানা থেকে পণ্য নিলেও এখনো পাওনা পরিশোধ করছে না। এ ছাড়া এখনো অনেক উদ্যোক্তা পণ্য তৈরি হয়ে যাওয়ার শিপমেন্ট বাতিল করেছেন। কাটিং করা মাল স্থগিত করছেন। কেউ কেউ ডিসকাউন্ট সুবিধা চান। এটা মোটেও উচিত নয়। বেআইনি।'

বিজিএমইএ জানায়, এরই মধ্যে ক্রেতারা ৩১৫ কোটি ডলারের পণ্য ক্রয়াদেশ বাতিল বা স্থগিত করেছেন। এসব কারখানায় প্রায় ২২ লাখের বেশি শ্রমিক কাজ করে। বিজিএমইএ নেতারা কালের কণ্ঠকে বলেন, 'রানা প্লাজা দুর্ঘটনা যেহেতু আমাদের দেশের অভ্যন্তরে ঘটেছে তাই এর প্রাথমিক দায়ভার আমাদেরই বহন করতে হয়েছে। সে সময় আন্তর্জাতিক ক্রেতারা তাঁদের ব্যবসায়িক সুনাম রক্ষাসহ নানাবিধ কারণে আমাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পেরেছেন, তবে নিরাপত্তার বিষয়টিতে আমরাও যথেষ্ট সোচ্চার হয়েছিলাম, তা না হলে নিজস্ব অর্থায়নে আড়াই শ কোটি ডলার (২.৫ বিলিয়ন) খরচ করে এত বড় একটি শিল্পে এত অল্প সময়ে নিরাপদ কর্মপরিবেশ তৈরির যে নিদর্শন সৃষ্টি হয়েছে তা নজিরবিহীন।'

বিজিএমইএ সহসভাপতি এস এম মান্নান কচি কালের কণ্ঠকে বলেন, এপ্রিল মাস যেন পোশাক খাতের দুর্যোগের মাসে পরিণত হয়েছে। ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল রানা প্লাজা ধসে প্রায় ১১০০ শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছেন। অনেক কষ্টে এ খাতের উদ্যোক্তারা ঘুরে দাঁড়ালেও গত সাত বছর পর এই সময় করোনার আঘাতে আবারো ক্ষতবিক্ষত। তিনি বলেন, এ সময় তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিক, ট্রেড ইউনিয়ন, বেসরকারি সংস্থা এবং সরকার ও মালিক মিলে সম্মিলিত উদ্যোগ না নিলে দেশের অর্থনীতির লাইফ লাইন পুরো ঝুঁকিতে পড়বে। তৈরি পোশাক খাতের ৪০ লাখেরও বেশি শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়ার পাশাপাশি সামাজিক সুরক্ষা ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

আইনি বিষয়ে জানতে চাইলে শ্রম আইন বিশেষজ্ঞ ও আইএলওর সাবেক কর্মকর্তা ড. উত্তম কুমার দাস কালের কণ্ঠকে বলেন, ক্রেতারা অর্ডার মতো দাম পরিশোধ করছেন না, তখন দেখা দরকার ক্রেতাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উৎপাদনকারী কারখানার চুক্তির বিষয়বস্তু কী। এমন বৈরী পরিস্থিতিতে ক্রেতাদের চুক্তিগত ও আইনগত দায় কী? কোন দেশের আইনে উদ্‌ভূত বিরোধের

নিষ্পত্তি হবে। উৎপাদনকারীরা ক্রেতাদের মানবিক দায় নিয়ে কথা বললেও এবং তা নিয়ে আবেদন-নিবেদন করা হলেও চুক্তিতে কী আছে সেগুলো নিয়ে কথা বলছেন না। উৎপাদনকারীদের উচিত হবে সংশ্লিষ্ট চুক্তি পর্যবেক্ষণ করা, ক্রেতারা চুক্তিগত বা আইনগত দায় এড়িয়ে গেলে তার ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৪ এপ্রিল ২০২০

সতর্কতার সঙ্গে কারখানা খোলার সিদ্ধান্ত নিন

রানা প্লাজার বর্ষপূর্তিতে সিপিডির আলোচনায় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ

করোনা ভাইরাসের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা এবং সরকারি ছুটির মধ্যেই গার্মেন্টস কারখানা চালু করার আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সতর্কতার সঙ্গেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। কারখানা খোলা ইস্যুতে গঠিত কমিটিকে এ বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তারা।

অন্য দিকে শ্রমিক নেতারা বিদ্যমান পরিস্থিতিতে কারখানা না খোলার পক্ষে মত দিয়েছেন। ইতিমধ্যে বেশ কয়েক জন শ্রমিকের করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার তথ্য জানিয়ে তারা বলেছেন, এ অবস্থায় কারখানা চালু করা হলে অনেক শ্রমিক সংক্রমিত হতে পারে।

অন্য দিকে মালিক পক্ষ বলছেন, দীর্ঘ সময় কারখানা বন্ধ রাখা হলে অনেক শিল্প বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। এ পরিস্থিতিতে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে কীভাবে কারখানা চালু করা যায়, সে উপায় খুঁজছেন তারা।

গতকাল বৃহস্পতিবার গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) উদ্যোগে রানা প্লাজার সপ্তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ‘কোভিড-১৯: সংকটের মুখে শ্রমিক ও মালিক-সরকারি উদ্যোগ ও করণীয়’ শীর্ষক এক ভার্চুয়াল আলোচনা অনুষ্ঠানে এ মতামত উঠে আসে।

আলোচনায় সরকারি ছুটির মধ্যেও শ্রমিক ছাঁটাই ও কারখানা লে অফ (সাময়িক বন্ধ) করার প্রসঙ্গ উঠে আসে। শ্রমিক নেতারা এটিকে আইন বিরোধী বলে উল্লেখ করেন। অন্য দিকে রানা প্লাজা দুর্ঘটনার সাত বছরে কারখানার নিরাপত্তার মানে অনেক অগ্রগতি হলেও এখনো শ্রমিক

মালিক দূরত্ব কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কমেনি। বক্তারা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান।

মূল প্রবন্ধে সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, মহামারির কারণে দেশে লকডাউন থাকায় পোশাক কারখানার শ্রমিকরা তাদের জীবন-জীবিকা নিয়ে অনিশ্চয়তায় পড়েছেন। এমন পরিস্থিতিতে তারা যাতে আগামী মাসের বেতন ঠিকমতো পান তা নিশ্চিত করতে হবে। গার্মেন্টসে ছয় মাসের বেতন নিশ্চিতে সমন্বিত উদ্যোগের আহ্বান জানান তিনি।

সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, যদিও চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি সাময়িক টানাপড়েন চলছে, কিন্তু তাতে করে এই দুই দেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে তেমন কোনো প্রভাব ফেলবে বলে মনে হয় না। বর্তমানে রপ্তানিখাতে যে স্থিতাবস্থা বিরাজ করছে, ভবিষ্যতে তা কাটিয়ে উঠে ব্যবসার সুযোগ ধরে রাখার প্রতি উদ্যোক্তাদের মনোযোগী হতে হবে।

সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন ভার্চুয়াল আলোচনাটি সঞ্চালনা করেন। তিনি বলেন, বৈশ্বিক এই মন্দার মাঝে পোশাক খাতের কার্যাদেশগুলো যেন অন্য দেশগুলোতে চলে না যায় সেক্ষেত্রে উদ্যোক্তা ও ক্রেতাদের দরকষাকষি অব্যাহত রাখতে হবে। বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা কাজে লাগিয়ে আপাতত এই সংকট কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সকল পক্ষকেই সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।

বাংলাদেশ পোশাক উত্পাদক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)-এর সহসভাপতি আরশাদ জামাল দীপু বলেন, উদ্যোক্তা ও কারখানার মালিকগণ বৈশ্বিক এই মহামারির ফলে সৃষ্ট সংকট গভীরভাবে বিশ্লেষণ করছে। এই অভিজ্ঞতা সবার জন্য নতুন। রানা প্লাজার মতো ট্র্যাজেডি ছিল জাতীয় পর্যায়ের সংকট কিন্তু এখন আমরা একটি বৈশ্বিক সংকটের মুখে পড়েছি। এজন্য হয়তো কিছু সমন্বয়ের ঘাটতি দেখা গিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে উদ্যোক্তা ও কারখানা মালিকগণ দেশের আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের পর্যাপ্ত সহযোগিতা করবে।

যুগান্তর

২৪ এপ্রিল ২০২০

৪ মাস বেতন পাচ্ছেন না ৭৫ হাজার শিক্ষক

*অনাহারে-অর্ধাহারে মানবেতর জীবন * এবার তারাবির হাদিয়া থেকেও বঞ্চিত হবেন হাফেজ, ইমাম, মোয়াজ্জিন ও খাদেমরা*

উবায়দুল্লাহ বাদল: চার মাস ধরে বেতন-ভাতা পাচ্ছেন না ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মসজিদভিত্তিক গণশিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষকরা।

গত ডিসেম্বরে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের ‘মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম’ প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ায় সারা দেশের মোট ৭৪ হাজার ৭৭৮টি কেন্দ্রের প্রায় ৭৫ হাজার শিক্ষকের বেতন বন্ধ রয়েছে।

বেতন না পাওয়া এসব শিক্ষক বিদ্যমান করোনা পরিস্থিতিতে অনাহারে-অর্ধাহারে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। এই শিক্ষকদের বেশির ভাগই মসজিদের ইমাম, মোয়াজ্জিন ও খাদেম।

করোনার কারণে মসজিদ বন্ধ থাকায় বেতনও প্রায় অনিশ্চিত। প্রতি বছরের মতো ঘটা করে রমজানের তারাবি না হওয়ায় বাড়তি হাদিয়া থেকেও বঞ্চিত হবেন হাফেজ, ইমাম, মোয়াজ্জিন-খাদেমরা। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

বেতন না পাওয়ার বিষয়টি সত্যতা স্বীকার করে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের (ইফা) মহাপরিচালক আনিস মাহমুদ বলেন, ‘শিগগিরই এই সমস্যার সমাধান হবে। গত ডিসেম্বরে প্রকল্পটির মেয়াদ শেষ হয়েছে।

প্রকল্পের মেয়াদ বাড়াতে এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাবের সার-সংক্ষেপ অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রস্তাবটিতে সম্মতি দিয়েছে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি)।

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) আগামী বৈঠকে প্রস্তাবটি অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে। অনুমোদন পাওয়া সাপেক্ষে প্রকল্পটির সমস্যার সমাধান হবে ইনশাআল্লাহ। করোনা পরিস্থিতির সৃষ্টি না হলে এতদিন এই সমস্যার সমাধান হতো।’

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শিক্ষক জানান, ‘মসজিদে ইমামতির পাশাপাশি একটি কেন্দ্রে পড়াই। মসজিদ থেকে বেতন পাই সাড়ে তিন হাজার টাকা।

কেন্দ্র থেকে পাই সাড়ে চার হাজার টাকা। এছাড়া তিনটি টিউশনি করে পাঁচ হাজার টাকা পাই। এই ১৩ হাজার টাকায় ৬ জনের সংসার টেনেটুনে চলে। করোনার কারণে মসজিদ ও সব টিউশনি বন্ধ।

মসজিদের বেতন হবে কিনা জানি না। চার মাস ধরে শিক্ষকতার বেতন পাই না। কিভাবে সংসার চলছে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। সন্তানদের মুখের দিকে তাকাতে পারি না।

ছোট দুই বছরের বাচ্চার জন্য দুধ কেনার ও দু’মুঠো খাবারের জন্য কোনো টাকা নেই হাতে। ইতোমধ্যে স্ত্রীর গহনা বন্ধক রেখে কিছু টাকা নিয়েছি। তাতেই চলছে সংসার। কারো কাছে কিছু চাইতেও পারছি না।’

ওই শিক্ষক জানান, এই প্রকল্পের বেশির ভাগ শিক্ষকই হয় মসজিদের ইমাম, নয়তো মোয়াজ্জিন অথবা খাদেম। তারা এসব ছাড়াও আরবি টিউশনি করে কোনো রকমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন।

প্রকল্পের বেতন বন্ধ হওয়ার পাশাপাশি করোনার কারণে মসজিদ ও সব টিউশনি বন্ধ হয়ে গেছে। এখন এসব শিক্ষক না পারছেন কারো কাছে বলতে, না পারছেন কোনো সাহায্য চাইতে।

সূত্র জানায়, মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বৃহৎ প্রকল্প। ১৯৯৩ শুরু হওয়া এ কার্যক্রমের ইতোমধ্যে ৬টি পর্যায় শেষ করে এটিকে ৭ম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

এ প্রকল্পে মসজিদের ইমামগণ মসজিদকেন্দ্রে শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার্থীদের বাংলা, অংক, ইংরেজি, আরবি, নৈতিকতা ও মূল্যবোধসহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দান করছেন।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সুবিধাবঞ্চিত স্থানে এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার ও কোর্স সম্পন্নকারীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হচ্ছে। এ প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের বেশির ভাগই সমাজের অবহেলিত, দরিদ্র ও নিরক্ষর জনগোষ্ঠী।

ধারাবাহিকভাবে চলমান এ প্রকল্পটির আওতায় প্রথম পর্যায়ে মোট ৯৪ হাজার ৫৯০ জন, দ্বিতীয় পর্যায়ে মোট সাত লাখ ২৩ হাজার ৮৮০ জন, তৃতীয় পর্যায়ে মোট ১৬ লাখ ৪৩ হাজার ৪০ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করা হয়।

একই ধারাবাহিকতায় চতুর্থ পর্যায়ে প্রকল্পের মাধ্যমে ২৯ লাখ ৩৭ হাজার ৬০০ জন শিক্ষার্থীকে প্রাক-প্রাথমিক ও পবিত্র কুরআন শিক্ষা দান করা হয়। পঞ্চম পর্যায়ে ২০০৯ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ৬৫ লাখ ৩৫ হাজার ২০০ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করা হয়েছে, যার অগ্রগতি শতভাগ।

২০১৪ সালের ৩০ ডিসেম্বর একনেকে এক হাজার ৫৯৩ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ রেখে ২০১৫ হতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছর মেয়াদে 'মসজিদভিত্তিক শিশু গণশিক্ষা কার্যক্রম' শীর্ষক ষষ্ঠ পর্যায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৯৭ শতাংশ বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

জানতে চাইলে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সচিব কাজী নূরুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, 'প্রকল্পটি সরকারের বিশেষ বিবেচনায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সপ্তম পর্যায়ে প্রকল্প অনুমোদনের পূর্ব পর্যন্ত প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়সহ জেলা ও উপজেলা শিক্ষাকেন্দ্র, দারুল আরকাম মাদ্রাসা এবং রিসোর্স সেন্টারের কাযর্ক্রম চলমান রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

আশা করছি সপ্তম পর্যায়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পের সঙ্গে পাবলিক সেন্টিমেন্ট বা জনগণের অনুভূতি জড়িত। ইচ্ছা করলেই প্রকল্প বন্ধ করা যাবে না। বর্তমানে শিক্ষকদের মাসে সাড়ে চার হাজার টাকা বেতন দেয়া হচ্ছে। সামনে তা বাড়িয়ে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা করার প্রস্তাব রয়েছে।'

যুগান্তর

২৪ এপ্রিল ২০২০

৫ মে পর্যন্ত ছুটির প্রজ্ঞাপন

স্বাস্থ্যবিধি মেনে সব কলকারখানা চালুর সুযোগ

*খোলা থাকবে ১৮ মন্ত্রণালয় * পর্যায়ক্রমে উন্মুক্ত হবে গণপরিবহন*

যুগান্তর রিপোর্ট: করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধে দেশের সরকারি-বেসরকারি অফিসে সাধারণ ছুটির মেয়াদ ৫ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। তবে এবার অন্যান্য জরুরি সেবার পাশাপাশি ১৮টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কার্যক্রম ঢাকাসহ সারা দেশে সীমিত পর্যায়ে খোলা থাকবে। এ ছাড়া শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করে ঔষধ শিল্প, উৎপাদন ও রফতানিমুখী শিল্পসহ সব কলকারখানা চালু রাখতে পারবে কর্তৃপক্ষ। পরিস্থিতি বিবেচনা করে পরবর্তী সময়ে শিল্পকারখানা, কৃষি এবং উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলো এবং গণপরিবহন পর্যায়ক্রমে উন্মুক্ত করা হবে। বৃহস্পতিবার এ সংক্রান্ত দুটি পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

প্রসঙ্গত, গত সোমবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলো খুলে দেয়ার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, পরিস্থিতি অনুকূলে থাকলে এবং স্বাস্থ্য অধিদফতরের স্বাস্থ্য নির্দেশিকা কঠোরভাবে মেনে শ্রমিকদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারলে রোজার মাসের মধ্যে সীমিত আকারে কিছু গার্মেন্ট ও শিল্পকারখানা চালু করা যেতে পারে।

জেলা প্রশাসকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে তিনি আরও বলেছিলেন, সামনে রমজান। আমরা সবাইকে একেবারে বন্ধ করে রাখতে পারব না। আমাদের কিছু কিছু জায়গা আস্তে আস্তে উন্মুক্ত করতেই হবে। ৫ মে পর্যন্ত ছুটি বাড়ানোর প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, দেশব্যাপী করোনাভাইরাস মোকাবেলা এবং এর ব্যাপক বিস্তার রোধকল্পে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৪ মার্চ, ১, ৫ ও ১০ এপ্রিল প্রজ্ঞাপনে ঘোষিত সাধারণ ছুটি ও সাপ্তাহিক ছুটির ধারাবাহিকতায় ২৬ থেকে ৩০ এপ্রিল এবং ৩ থেকে ৫ মে পর্যন্ত সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। সাধারণ ছুটির সঙ্গে ১ ও ২ মের সাপ্তাহিক ছুটিও যুক্ত হবে।

সাধারণ ছুটিকালীন ঢাকাসহ সব বিভাগ এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ১৮টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ খোলা থাকবে। এই অফিসগুলো হল : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, কৃষি, বাণিজ্য, খাদ্য ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্যসেবা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন, সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশুবিষয়ক এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়- অন্য সব সরকারি অফিসের কর্মকর্তারা এই সময়ে আবশ্যিকভাবে নিজ নিজ কর্মস্থলে অবস্থান করবেন।

ছুটির আওতার বাইরে যা থাকবে : জারি করা প্রজ্ঞাপনে বলা হয়- জরুরি সেবা যেমন: বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানি, ফায়ার সার্ভিস, বন্দরগুলোর (স্থল, নদী ও সমুদ্রবন্দর) কার্যক্রম,

পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, টেলিফোন, ইন্টারনেট, ডাক সেবা এবং সংশ্লিষ্ট সেবা কাজে নিয়োজিত যানবাহন ও কর্মীরা এই ছুটির বাইরে থাকবেন।

সড়ক ও নৌপথে সব ধরনের পণ্য পরিবহনের সঙ্গে নিয়োজিত যানবাহন (ট্রাক, লরি, কার্গো ভেসেল ইত্যাদি) চলাচল অব্যাহত থাকবে। এ ছাড়া কৃষিপণ্য, সার, কীটনাশক, খাদ্য, শিল্পপণ্য, রাষ্ট্রীয় প্রকল্পের মালামাল, কাঁচাবাজার, খাবার, ওষুধের দোকান, হাসপাতাল ও জরুরি সেবা এবং এসবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ক্ষেত্রে এই ছুটি প্রযোজ্য হবে না।

চিকিৎসাসেবায় নিয়োজিত চিকিৎসক ও কর্মী, ওষুধসহ চিকিৎসা সরঞ্জামাদি বহনকারী যানবাহন ও কর্মী এবং গণমাধ্যমে (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক) নিয়োজিত কর্মীরা এই ছুটির আওতাবহির্ভূত থাকবেন। এ ছাড়া ঔষধ শিল্প, উৎপাদন ও রফতানিসহ সব কলকারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করে চালু রাখতে পারবে।

পরিস্থিতি বিবেচনা করে পরবর্তী সময়ে শিল্পকারখানা, কৃষি ও উৎপাদন এবং সরবরাহ ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলো ও গণপরিবহন পর্যায়ে উন্মুক্ত করা হবে। ছুটির সময় কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা রাখা যাবে না। তবে জরুরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত অফিসগুলো খোলা থাকবে। এ ছাড়া মানুষের প্রয়োজন বিবেচনায় বাংলাদেশ ব্যাংক সীমিত আকারে ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু রাখার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেবে।

প্রসঙ্গত, এবারের ছুটি নিয়ে পাঁচ দফায় ছুটি বাড়ানো হলো। করোনাভাইরাসের কারণে প্রথম দফায় ২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত ছুটি দেয়া হয়েছিল। এরপর ছুটি বাড়িয়ে তা ১১ এপ্রিল করা হয়। ছুটি তৃতীয় দফা বাড়িয়ে করা হয় ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত। এরপর চতুর্থ দফায় ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত ছুটি বাড়ানো হয়। এবার পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে পঞ্চম দফায় ছুটি বাড়ল। এর ফলে করোনার কারণে দেশে টানা ৪১ দিন ছুটি থাকবে।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৫ এপ্রিল, ২০২০

রবিবার থেকে খুলছে গার্মেন্টস কারখানা, যা বলছে বিজিএমইএ

ইত্তেফাক রিপোর্ট : করোনা ভাইরাসের ঝুঁকির মধ্যেই রবিবার থেকে ধাপে ধাপে খুলছে গার্মেন্টস কারখানা। আজ শনিবার ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইতে এক সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর পর সন্ধ্যায় গার্মেন্টস কারখানা খোলার বিষয়টি অবহিত করে তৈরি পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ শ্রম ও

কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিবকে চিঠি পাঠিয়েছেন। একই সিদ্ধান্ত নিয়েছে পোশাক শিল্প মালিকদের অপর সংগঠন বিকেএমইএ। এর পর শ্রম মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য বিধি মেনে কারখানা চালু করার জন্য একটি নির্দেশনা জারি করে।

বিজিএমইএ'র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী কাল রবি ও সোমবার ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকা ছাড়াও নারায়ণগঞ্জ এলাকার নিটিং, ডায়িং ও স্যাম্পলিংয়ের কারখানা চালু হবে। ২৮ থেকে ৩০ এপ্রিল আশুলিয়া, সাভার, ধামরাই ও মানিকগঞ্জের কারখানা, ৩০ এপ্রিল রূপগঞ্জ, নরসিংদী, কাঁচপুর এলাকা, ২ ও ৩ মে গাজীপুর ও ময়মনসিংহ এলাকার কারখানা চালু করা হবে। কারখানা খোলার ক্ষেত্রে শুরুতে উৎপাদন ক্ষমতার ৩০ শতাংশ চালু করা হবে। পর্যায়ক্রমে তা বাড়ানো হবে।

কারখানার আশে পাশে থাকা শ্রমিকদের নিয়ে কারখানা চালু এবং এপ্রিল মাসে সকল শ্রমিককে বেতন পরিশোধের অনুরোধ জানায় বিজেএমইএ। কারখানা এলাকার থেকে অনেক দূরে থাকা শ্রমিকদের এখন কর্মস্থলে না ডাকা এবং কর্মী ছাঁটাই না করার অনুরোধ জানানো হয়।

বিজেএমইএ আরো জানায়, প্রটোকল অনুসারে কারখানা খোলা না হলে এবং শ্রমিকরা সার্বিক সহায়তা ছাড়া ঢাকায় প্রবেশ করলে সংগঠনের পক্ষ থেকে কারখানাগুলোকে সহায়তা প্রদান করা সম্ভব হবে না।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

২৫ এপ্রিল, ২০২০

রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে গেলো কুমিল্লায় আটকে পড়া ৪৬ জন শ্রমিক

কুমিল্লা প্রতিনিধি : কুমিল্লায় আটকে পড়া শ্রমিকদের দ্বিতীয় দফায় বাসযোগে রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রেরণ করা হয়েছে। শনিবার জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশের ব্যবস্থাপনায় ৪৬ জন শ্রমিককে নগরীর শাসনগাছা থেকে প্রেরণ করা হয়।
এ সময় জেলা প্রশাসক মো. আবুল ফজল মীর ও পুলিশ সুপার সৈয়দ নুরুল ইসলামসহ জেলা পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে তাদেরকে সামাজিক দূরত্ব বজায়

রেখে জীবাণুনাশক স্প্রে করে বাসে উঠানোসহ করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে সতর্ক থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়। এছাড়া প্রত্যেক শ্রমিককে থার্মাল স্ক্যানার দিয়ে তাপমাত্রা নির্ণয় করা হয়। মাস্ক ও শুকনো খাবারের প্যাকেট প্রদান করা হয়।

পুলিশ সুপার সৈয়দ নুরুল ইসলাম জানান, এসব শ্রমিকরা কৃষিকাজ ও শ্রমভিত্তিক বিভিন্ন কাজ করে জীবিকা নির্বাহের জন্য বিভিন্ন সময়ে কুমিল্লায় আসেন। তারা প্রতি বছর ধান কাটার মৌসুমে রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের বরেন্দ্র এলাকায় ধান কাটার শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। কিন্তু করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে লকডাউন ঘোষণার পর গণপরিবহন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তারা কুমিল্লায় আটকা পড়েন।

উল্লেখ্য, গত ২৩ এপ্রিল জেলা পুলিশের ব্যবস্থাপনায় প্রথম দফায় ৪৩ জন শ্রমিককে রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের বরেন্দ্র এলাকায় প্রেরণ করা হয়েছিল। এ নিয়ে ৮৯ জন শ্রমিককে কুমিল্লা থেকে সেখানে প্রেরণ করা হল।

বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

এপ্রিল ২৫, ২০২০

করোনা পরিস্থিতিতে কোন শ্রমিক ছাঁটাই করা যাবে না: শ্রম প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক : করোনা পরিস্থিতির মধ্যে কোন শ্রমিককে ছাঁটাই করা যাবে না বলে শিল্প মালিকদের জানিয়ে দিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান। সেই সঙ্গে ঈদের আগেই শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধ করারও আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

আজ রাজধানীর বিজয়নগরে শ্রম ভবনের সম্মেলনকক্ষে সরকার, মালিক-শ্রমিক ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের (টিসিসি) ৬৪তম সভায় সভাপতির বক্তৃতায় তিনি এ আহ্বান জানান। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, টিসিসির সদস্যগণ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এসভায় অংশগ্রহণ করেন।

শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, করোনা পরিস্থিতির মধ্যে কোন শ্রমিককে ছাঁটাই করা যাবে না। কোন কারখানা লে-অফ করা যাবে না।

তিনি বলেন, অর্থনীতির গতি সচল রাখতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক মালিকগণ কারখানা চালু করতে চাইলে অবশ্যই কঠোরভাবে স্বাস্থ্য বিধিমালা প্রতিপালন করতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তর, সংস্থা যেমন- শিল্প পুলিশ, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

তিনি শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, কারখানা চালু রাখার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি আগে দেখতে হবে।

শ্রম মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. রেজাউল হকের সঞ্চালনায় সভায় মন্ত্রণালয়ের সচিব কে এম আলী আজম, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক শিবনাথ রায়, শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ কে এম মিজানুর রহমান এবং জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু উপস্থিত ছিলেন।

অন্য দিকে ভিডিও কনফারেন্সে সংযুক্ত ছিলেন বাংলাদেশ এমপ্লোয়ারস ফেডারেশন এর সভাপতি কামরান টি রহমান, বিজিএমইএ এর সভাপতি ড. রুবানা হক, বিকেএমইএ এর সিনিয়র সহ-সভাপতি হাতেম আলী, বাংলাদেশীয় চা সংসদের চেয়ারম্যান শাহ আলম, গ্রামীণফোন লি. এর প্রধান মানবসম্পদ কর্মকর্তা তানভির হোসাইন, আইএলও প্রতিনিধি মুনিরা সুলতানা, বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক জোট এর সভাপতি শিরিন আখতার এমপি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সভাপতি মো. আনোয়ার হোসেন, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতন, বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট দেলোয়ার হোসেন খান, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান এবং বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘের সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী আশিকুল আলম প্রমুখ।

বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

এপ্রিল ২৫, ২০২০

ত্রাণ দিয়ে সংসার চলছে পরিবহন শ্রমিকদের

বণিক বার্তা প্রতিনিধি মিরসরাই : নভেল করোনাভাইরাস সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে দেশজুড়ে বন্ধ রয়েছে সব ধরনের যাত্রীবাহী যানবাহন চলাচল। এ কারণে আয়-রোজগার পুরো বন্ধ হয়ে গেছে চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার হাজারো পরিবহন শ্রমিকের। এ অবস্থায় ত্রাণ সংগ্রহ করেই সংসার চালাতে হচ্ছে তাদের। তাও আবার পর্যাপ্ত নয়। এ কারণে ত্রাণের চাল শেষ হওয়ার আগেই নতুন ত্রাণের খোঁজে নামতে হচ্ছে তাদের। এসব শ্রমিকের অভিযোগ, যান চলাচল স্বাভাবিক থাকাকালীন বেশকিছু সংগঠন নিয়মিত চাঁদা আদায় করলেও এখন তাদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না। তবে শ্রমিক নেতাদের দাবি, তারা সাধ্যমতো শ্রমিকদের সাহায্যের চেষ্টা করছেন।

স্থানীয় শ্রমিক ও পরিবহন মালিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মিরসরাই উপজেলার বারইয়ারহাট-চট্টগ্রাম রুটে চয়েজ পরিবহনের প্রায় ১২০টি গাড়ি নিয়মিত চলাচল করে থাকে। এসব গাড়িতে শ্রমিক রয়েছে ২৪০ জন। একই

রুটে উত্তরা পরিবহনের গাড়ি চলে ১০০টি। প্রতি গাড়িতে তিনজন করে এসব গাড়িতে ৩০০ শ্রমিক রয়েছেন। বারইয়ারহাট-ফেনী রুটে চলাচল করে ৫০টি আনন্দ সুপার বাস। এসব যানবাহনে শ্রমিক রয়েছেন ১৫০ জন এবং ট্রাক, মিনি ট্রাক, মাইক্রোবাস শ্রমিক রয়েছেন প্রায় ৩০০। এছাড়া বারইয়ারহাট-সীতাকুণ্ডু রুটে নিয়মিত চলাচল করে ১০০টি হিউম্যান হলার। এসব হিউম্যান হলারে শ্রমিক রয়েছেন ২০০ জন। নভেল করোনাভাইরাসের কারণে প্রায় এক মাস ধরে সব ধরনের যাত্রীবাহী যানবাহন চলাচল বন্ধ। এতে উপজেলার হাজারো পরিবহন শ্রমিকের আয়-রোজগার বন্ধ হয়ে গেছে।

শ্রমিকরা জানান, শুরুতে জমানো টাকা দিয়ে সংসারের খরচ মেটালেও এখন তাও ফুরিয়ে এসেছে। এ কারণে ত্রাণ বা সাহায্য নিয়েই সংসার চালাতে হচ্ছে। কিন্তু শ্রমিক সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ যান চলাচল যখন স্বাভাবিক ছিল, তখন এসব সংগঠনকে নিয়মিত চাঁদা দিতে হতো। এর মধ্যে বারইয়ারহাট-চট্টগ্রাম রুটে চলাচলরত ১২০টি চয়েজ পরিবহনের প্রতিটি গাড়ি থেকে দৈনিক ৫০ টাকা শ্রমিক সংগঠনের জন্য কেটে রাখা হতো। উত্তরা পরিবহনের প্রতিটি গাড়ি থেকে শ্রমিক-মালিকের জন্য দৈনিক ১২০ টাকা এবং প্রতিটি হিউম্যান হলার থেকে ১০০ টাকা চাঁদা হিসেবে দিতে হতো।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক চয়েজ পরিবহনের এক চালক জানান, সম্প্রতি উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ২০০ জন শ্রমিককে ১০ কেজি করে চাল দেয়া হচ্ছে। কিন্তু শ্রমিক সংগঠনগুলো থেকে কেউ কিছুই পায়নি। এ কারণে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে খুব কষ্টে আছি।

এ বিষয়ে চট্টগ্রাম বাস-মিনিবাস-হিউম্যান হলার শ্রমিক ইউনিয়ন বারইয়ারহাট শাখার সাধারণ সম্পাদক আরিফ উদ্দিন মাসুক জানান, আমরা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বরাবর আবেদন করে ২০০ জন শ্রমিকের জন্য চালের ব্যবস্থা করেছি। এছাড়া ব্যক্তিগতভাবেও হিউম্যান হলারের চালকদের আর্থিক সহায়তা করেছি। জোরারগঞ্জ থানার পক্ষ থেকে ৫০ জন পরিবহন শ্রমিককে চাল দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন চট্টগ্রাম জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মো. অলী আহম্মদ জানান, ফেডারেশনের আওতায় লক্ষাধিক শ্রমিক রয়েছেন। এত শ্রমিককে একসঙ্গে সহায়তা দেয়া বেশ কঠিন। এরই মধ্যে প্রায় ৮০০ শ্রমিককে ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আর্থিক সহযোগিতা করা হয়েছে।

মিরসরাইয়ের ইউএনও রুহুল আমিন জানান, সম্প্রতি উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে শ্রমিকদের মাঝে চাল বিতরণ করা হয়েছে। আগামীতেও দেয়া হবে।

প্রথম আলো

২৫ এপ্রিল ২০২০

বেতন হচ্ছে না শত শত সরকারি চিকিৎসকের

সামছুর রহমান, ঢাকা: ঝুঁকি নিয়ে রোগীদের সেবা দিলেও বেতন পাচ্ছেন না সরকারি হাসপাতালের এক হাজারের বেশি চিকিৎসক। পর্যাপ্ত বাজেট না থাকায় উপজেলা পর্যায়ের চিকিৎসকদের এক থেকে তিন মাস পর্যন্ত বেতন বকেয়া পড়েছে। গত ডিসেম্বরে নিয়োগ পাওয়া ৩৯তম বিসিএসের চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে এমন ঘটনা বেশি।

বেতন বকেয়া রয়েছে, এমন ৬০০ চিকিৎসকের তালিকা *প্রথম আলোর* কাছে রয়েছে। তবে বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারদের সংগঠন হেলথ ক্যাডার অ্যাসোসিয়েশন বলেছে, এই সংখ্যা দুই হাজারের বেশি। অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এ এম সেলিম রেজা বলেন, করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে চিকিৎসকেরা সম্মুখসারির যোদ্ধা। এই সময়েও চিকিৎসকদের বেতন হচ্ছে না, এটি অমানবিক ও দুঃখজনক। সবার পরিবার রয়েছে, খরচ আছে। মন্ত্রণালয়ের উচিত, দ্রুত এ সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করা।

অন্তত ২০ জন ভুক্তভোগী চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গত জানুয়ারি থেকে দেশের সব সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের বেতন হচ্ছে 'আইবিএস++' নামক একটি সফটওয়্যারের মাধ্যমে। এ সফটওয়্যারে প্রত্যেক চিকিৎসকের নিজস্ব অ্যাকাউন্ট থাকে। নিজস্ব অ্যাকাউন্ট থেকে প্রতি মাসের বেতন বিল জমা দিতে হয়।

চিকিৎসকেরা বলেছেন, দেশের অনেক উপজেলা থেকে সফটওয়্যারে বেতন বিল জমা দেওয়া যাচ্ছে না। বেতন বিল জমা দিতে গেলে 'ইনসাফিশিয়েন্ট বাজেট বা অপর্যাপ্ত বরাদ্দ' লেখা আসছে। উপজেলার হিসাব বিভাগ বলছে, চিকিৎসকদের বেতন বাবদ বরাদ্দ না আসায় এমন সমস্যা হচ্ছে।

কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সাতজন চিকিৎসকের দু–তিন মাসের বেতন বকেয়া। সেখানকার একজন চিকিৎসক বলেন, 'বরাদ্দ এলে বেতন পাব। কিন্তু কবে পাব জানি না। ব্যাপক পরিসরে এভাবে চিকিৎসকদের বেতন হচ্ছে না, এটি মেনে নেওয়া যায় না।'

বুড়িচং উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (ইউএইচএফপিও) মীর হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, চিকিৎসকদের বেতন বকেয়ার বিষয়টি লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। কোনো সমাধান হয়নি। যাঁরা ৩৯ বিসিএস দিয়ে নতুন নিয়োগ পেয়েছেন, তাঁদের প্রায় সবার তিন মাসের বেতন বকেয়া।

৩৯ বিসিএসে নিয়োগ পাওয়া উপজেলা পর্যায়ের চিকিৎসকদের এক থেকে তিন মাস বেতন বকেয়া।

চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ১২ জন চিকিৎসকের দুই–তিন মাসের বেতন বকেয়া। সেখানকার একজন চিকিৎসক *প্রথম আলো*কে বলেন, করোনার এ দুর্যোগে যাঁরা সামনে থেকে লড়ছেন, তাঁরাই বঞ্চিত হচ্ছেন, এটা হতাশাজনক। প্রণোদনা পাওয়ার বিষয় পরে, আগে যেন বেতনের মতো ন্যায্য পাওনা নিশ্চিত করা হয়।

চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, কেন বেতন বকেয়া পড়েছে, তা চিকিৎসকদের অনেকেই স্পষ্টভাবে জানেন না। বেতন না পেলেও চিকিৎসাসেবা দিয়ে যাচ্ছেন। কর্তৃপক্ষ তাঁদের আশ্বস্ত করেছে, কিছুদিনের মধ্যে এ সমস্যা কেটে যাবে।

দুই থেকে তিন মাস বেতন বকেয়া রয়েছে খাগড়াছড়ির মহালছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ১০ জন, কুমিল্লার চান্দিনা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ১৯, রাজশাহী গোদাগাড়ীর ১৪, জামালপুর সদরের ৫, কুমিল্লার দাউদকান্দির ৮, নরসিংদীর রায়পুরার ৫ এবং ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ের ৫ জন চিকিৎসকের।

চিকিৎসকদের সংগঠন বাংলাদেশ ডক্টরস ফাউন্ডেশনের তথ্যমতে, গতকাল পর্যন্ত দেশের ২৮৭ জন চিকিৎসক করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের অধিকাংশই সরকারি হাসপাতালে কর্মরত। চিকিৎসকেরা বলেছেন, কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও তাঁরা রোগীদের সেবা দিচ্ছেন। তাঁদের বেতন বকেয়া থাকা অমানবিক।

এ বিষয়ে ১৮ এপ্রিল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে উপজেলা পর্যায়ে একটি চিঠি দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়, বেতন-ভাতা বকেয়া পড়ার তিনটি সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে। ‘আইবিএস++’ একটি সংবেদনশীল সফটওয়্যার। মাঠপর্যায়ের বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান থেকে চাহিদা পাঠানোর সময় সতর্কতা অবলম্বন না করা এবং নিয়মিত বরাদ্দ থেকে অন্যান্য বিল পরিশোধ করা।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওই চিঠিতে বলা হয়, ১৫ এপ্রিল থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত বেতন-ভাতা ও সরবরাহ খাতে তৃতীয় কিস্তির বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধৈর্য ধরতে এবং নিয়মিত আইবিএস++ চেক করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে, বেতনের কোনো একটি খাতেও বরাদ্দ না থাকলে আইবিএস++ সফটওয়্যার বেতন বিল জমা নেয় না। মাঠপর্যায় থেকে অর্থ চাহিদা পাঠানোর সময় সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি হলেও তাই বেতন আটকে যাচ্ছে। উপজেলা থেকে চাহিদা পাঠানোর ক্ষেত্রে অসতর্কতার কারণেও কিছু সমস্যা হয়েছে।

৩৯তম বিসিএসের মাধ্যমে ৪ হাজার ১৬১ জন চিকিৎসক গত ডিসেম্বরে নিয়োগ পান। তাঁদের বেতন-ভাতা বাবদ ১৩৮ কোটি টাকা প্রয়োজন হয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ অর্থ বরাদ্দের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে এ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হবে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (অর্থ) শেখ মনজুর রহমান *প্রথম আলো*কে বলেন, এপ্রিল থেকে জুনের বেতন-ভাতা বরাদ্দ দেওয়া শুরু হয়েছে। সংশোধিত বাজেটে ৩৯তম বিসিএসের চিকিৎসকদের অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যাবে। মাঠপর্যায়ে জানানো হয়েছে, কিছুদিনের মধ্যে বেতনসংক্রান্ত জটিলতা থাকবে না।

২৫ এপ্রিল ২০২০

কেইপিজেড খুলছে কাল, আতঙ্ক-দ্বিধায় ২৫ হাজার শ্রমিক

প্রতিনিধি, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম: করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সরকারের সাধারণ ছুটি ও গণপরিবহন বন্ধের মধ্যেই আগামীকাল রোববার আবারও খুলতে যাচ্ছে চট্টগ্রামের কোরীয় রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল (কেইপিজেড)। বর্তমান পরিস্থিতিতে করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকিতে শ্রমিকেরা একদিকে যেমন আতঙ্কিত, অন্যদিকে কাজে যোগ দেওয়া না দেওয়া নিয়ে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছেন।

এর আগে গত ২৮ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত সাধারণ ছুটি শেষে ৫ এপ্রিল কেইপিজেড খোলায় সমালোচিত হয় কর্তৃপক্ষ। ওই দিন কাজ করিয়ে কেইপিজেড আবারও বন্ধ ঘোষণা করা হয়। তবে বন্ধের মধ্যেও কেইপিজেড সামান্য পরিসরে খোলা আছে।

গণপরিবহন বন্ধ থাকার পাশাপাশি সড়কে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কড়াকড়ির মধ্যে কীভাবে কর্মস্থলে আসা–যাওয়া করবেন, তা নিয়ে দোটানায় পড়েছেন শ্রমিকেরা। কেইপিজেড খোলার খবরে দোটানায় পড়েছে আনোয়ারা উপজেলা ও পুলিশ প্রশাসনও। কারণ, আনোয়ারা ছাড়াও কর্ণফুলী, বাঁশখালী, সাতকানিয়া, চন্দনাইশ, পটিয়া ও চট্টগ্রাম শহর থেকে আসা–যাওয়া করেন এসব শ্রমিক। সড়কে মানুষের চলাচল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হলেও শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কী হবে তা নিশ্চিত নয়।

স্থানীয় ও কেইপিজেড সূত্র জানায়, কেইপিজেডের ২১টি কারখানায় ২৫ হাজার শ্রমিক কাজ করেন। সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত অফিসসূচি হলেও তিন শিফটে ২৪ ঘণ্টা উৎপাদন হয় কেইপিজেডের এসব কারখানায়। করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সরকার কঠোর হলে গত ২৮ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল কেইপিজেড ছুটি ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। ওই সময় ৫ এপ্রিল কেইপিজেড খুলে পুনরায় বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এরপর ২৬ এপ্রিল কেইপিজেড খোলা রাখার খবর ছড়িয়ে পড়লে আতঙ্ক আর দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যান শ্রমিকেরা। শ্রমিকেরা বলেন, করোনা মোকাবিলায় দুজন মানুষের মধ্যে তিন ফুট দূরত্বে অবস্থান নেওয়ার দরকার হলেও কেইপিজেডের শ্রমিকেরা গাদাগাদি করে আসা–যাওয়া করেন। বিশেষ করে

দুপুরের খাবার খেতে গেলে হুড়াহুড়িতে পড়তে হয় সবাইকে। এ অবস্থায় স্বাস্থ্যগত ঝুঁকিও দেখা দিয়েছে শ্রমিকদের মধ্যে।

কেইপিজেডের প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায়ের এক কর্মকর্তাও স্বীকার করেন, কেইপিজেড খোলা রাখার সিদ্ধান্ত আত্মঘাতী হতে পারে। তাঁরা আসলে কর্তৃপক্ষের কাছে অসহায়। তিনি আরও বলেন, কেইপিজেডের শ্রমিকেরা কয়েকজন মিলে গাড়ি ভাড়া করে যাতায়াত করেন। গণপরিবহনে বন্ধ হওয়ায় শ্রমিকেরা কীভাবে কাজে আসবেন তা ভাবছেন না নীতি নির্ধারকেরা। এতে শ্রমিক-কর্মকর্তায় ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হচ্ছে।

জানতে চাইলে কেইপিজেডের সহকারী মহাব্যবস্থাপক (এজিএম) মো. মুশফিকুর রহমান বলেন, 'আমরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে কেইপিজেড খুলব। প্রতিটি ফটকে থার্মাল স্ক্যানার মেশিন বসানো হবে।' গণপরিবহন বন্ধের মধ্যে শ্রমিকেরা কীভাবে কাজে আসবেন, জানতে চাইলে তিনি বলেন, অধিকাংশই কাছের শ্রমিক। তাঁরা আসতে পারবেন। তবে দূরবর্তী উপজেলার শ্রমিকেরা আসতে না পারলে তাদের কাছে কৈফিয়ত চাওয়া হবে না।

আনোয়ারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শেখ জুবায়ের আহমেদ বলেন, বিষয়টি নিয়ে তিনি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলবেন।

বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

এপ্রিল ২৫, ২০২০

ঝুঁকি নিয়ে খুলছে শিল্প-কারখানা

পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করে সিদ্ধান্ত নেয়া হোক

সম্পাদকীয়

সরকার সাধারণ ছুটির মেয়াদ বাড়ানোর পাশাপাশি কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও কারখানা চালুর চিন্তা করছে। এজন্য বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে যথাযথ নির্দেশনাও চাওয়া হয়েছে। এদিকে দেশে করোনা শনাক্ত হওয়ার সংখ্যা বাড়ছে, মৃত্যুর সংখ্যাও কম নয়। কবে দেশে সংক্রমণের হার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছবে, তা নিয়েও হয়নি কোনো গবেষণা। এর মধ্যেই ঝুঁকি নিয়ে উদ্যোক্তারা কারখানা

খুলতে যাচ্ছেন। ভারত সরকারও দেশটির কিছু কারখানা চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এজন্য দেশটি বিশেষজ্ঞদের দিয়ে গবেষণা, পর্যালোচনা ও পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করেছে। কোন কারখানা খুলবে, কোনটা নয়, তা ঠিক করার দায়িত্ব বর্তাবে রাজ্য সরকারের ওপর। এক্ষেত্রে জেলা কর্তৃপক্ষ নীতিনির্দেশিকা মেনে ব্যবস্থা নেবে। কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, বড় কারখানা, যেখানে জীবাণুশূন্য করার ব্যবস্থা আছে, তারা সামাজিক দূরত্বের নীতি মেনে ২৫ শতাংশ কর্মী দিয়ে শিফট চালু করতে পারবে। মাঝারি ও ছোট শিল্প, যাদের রফতানির দায়বদ্ধতা আছে, সেখানে কাজ শুরু করা যেতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্র অগ্রাধিকার পাবে তার একটা তালিকাও তৈরি করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এর মধ্যে আছে রঙ, সব ধরনের খাদ্য ও পানীয়, প্লাস্টিক তৈরির কারখানা, অলংকার, বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকায় থাকা কারখানা, ওষুধ, রাবার বুট, অ্যানেস্থেশিয়া ব্যাগ, ভেন্টিলেটর, রাবার ভালভসহ চিকিৎসার কাজে লাগে এমন সব সামগ্রী। কাঠ, প্লাইভিত্তিক শিল্প, কাচসহ যেসব জায়গায় খুব কম লোক দিয়ে কাজ করানো যেতে পারে সেগুলোও খোলার পরিকল্পনা চলছে। সেই সঙ্গে নির্দেশিকায় বলে দেয়া হয়েছে, যেসব কারখানায় শ্রমিকদের ঠিকমতো থাকার ব্যবস্থা আছে, তারা অগ্রাধিকার পাবে। আর সামাজিক দূরত্ব ও কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতেই হবে। জেলা প্রশাসন নজরদারি করবে।

বাংলাদেশ সরকার ও উদ্যোক্তারা কারখানা চালুর পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছেন এমন এক সময়ে, যখন করোনার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। আমরা এখন সংক্রমণ পর্ব-৪-এ রয়েছি। বাংলাদেশের দু-তিনটি কারখানা ছাড়া কোনো কারখানায় শ্রমিকদের থাকার ব্যবস্থা নেই। আবার করোনা সংক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য শ্রমিকদের যতটুকু দূরত্বে থাকার কথা, দেশের অধিকাংশ কারখানায় সেই ধরনের পরিবেশও নেই। তাছাড়া করোনা প্রভাব মোকাবেলায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে কারখানা তৈরিও সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ। এমন পরিস্থিতির মধ্যে কারখানাগুলো চালু রাখতে চাইছেন মালিকরা। স্বাস্থ্য নির্দেশিকা পুরোপুরি মেনে রফতানি আয়ের প্রধান খাত তৈরি পোশাক শিল্প চালানো কঠিন বৈকি। এটি পুরোপুরি মানতে গেলে শ্রমিকদের নির্দিষ্ট দূরত্বে রাখতে হবে। আগের সিট প্ল্যান পরিবর্তন এবং কারখানার মেশিন খুলে নতুন করে স্থাপন করতে হবে। আর স্বাস্থ্য নির্দেশিকা মেনে নতুন করে মেশিন স্থাপন করতে হলে শ্রমিকের কাজ হারানোর শঙ্কা বাড়বে। শুধু মেশিনই নয়, প্রবেশ ও বের হওয়ার ক্ষেত্রেও শারীরিক দূরত্ব মানতে হবে। প্রত্যেক কারখানায় নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে। এদিকে দেশের শ্রমিকদের একটি বিপুল অংশ সাধারণত অপুষ্টিতে ভোগেন। ফলে তাদের ঝুঁকিও বেশি। এ কারণে কারখানার পক্ষ থেকে শ্রমিকদের পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করা উচিত। এছাড়া শ্রমিকরা বাসায় কীভাবে থাকবেন, অফিসে কীভাবে কাজ করবেন, তার ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া দরকার। বড় বিষয় হলো, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে গেলে কারখানা পরিচালনার ব্যয় বেড়ে যাবে। কারণ প্রত্যেক শ্রমিককে প্রতিদিন হ্যান্ড গ্লাভস দিতে হবে, পিপিই দিতে হবে। হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মানসম্মত মাস্ক, পর্যাপ্ত সাবান, পানির সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। বাথরুম ও টয়লেটের সংখ্যা আরো বাড়াতে হবে। নিজস্ব গাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে। শ্রমিকের পরিবার যাতে ঘরের বাইরে বের না হয়, সেজন্য পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। বাংলাদেশের কয়টি প্রতিষ্ঠান এসব বিধিমালা মেনে কারখানা চালু রাখতে পারবে, তা

এক বড় প্রশ্ন বটে। কিছু দেশ সীমিত আকারে তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করতে যাচ্ছে। এমনকি প্রতিবেশী ভারতও এলাকা ও খাত বিবেচনায় কোথাও কড়াকড়ি আরোপ করছে, কোথাও লকডাউন সহজ করে অর্থনৈতিক কার্যক্রম চালু করছে। তবে আমাদের এখানে জনবসতি বেশি। শিল্প-কারখানাও বেশির ভাগই জনবহুল এলাকায়, আবাসিক এলাকায়। ফলে আমাদের ঝুঁকি বেশি। এসব বিষয় বিবেচনায় রেখে স্বাস্থ্যবিধি প্রণয়ন এবং তা পরিপালনে তদারকি জোরদার করতে হবে। শ্রমিকদের ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেয়া যৌক্তিক হবে না।

সরকার এরই মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি প্রণয়নে একটি কমিটি গঠন করেছে। সেটি নিয়েও অনেকে প্রশ্ন তুলছেন। অভিযোগ রয়েছে, যথেষ্ট পরিমাণ স্বাস্থ্য ও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ তাতে নেই। এমন পরিস্থিতিতে ভারত যেসব পদক্ষেপ ও তদারকির ব্যবস্থা নিশ্চিত করে কারখানা চালুর কথা বলছে, বাংলাদেশে তা কতটা সম্ভব? অতীত অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে খুব বেশি সুখকর নয়। রানা প্লাজা ধসের পর দেশের তৈরি পোশাক শিল্পের কারখানাগুলোকে কর্মপরিবেশ উন্নয়ন করাতে অনেক সময় লেগেছে, তাও অধিকাংশ কারখানা এর বাইরে রয়ে গেছে। করোনার প্রাদুর্ভাব মোকাবেলা করে যে প্রক্রিয়ায় কারখানা চালু করার কথা বলা হচ্ছে, তা বাংলাদেশের কয়টি কারখানার পক্ষে স্বল্প সময়ে সম্ভব, এটি প্রশ্নসাপেক্ষ। এক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় কারখানা চালু হিতে বিপরীত হতে পারে। এতে করোনার সংক্রমণ আরো বেড়ে উঠবে। উন্নত বিশ্ব স্বাভাবিক হচ্ছে বলে আমাদের সংক্রমণের পর্যায় বিশ্লেষণ না করেই কারখানা খুলতে হবে, তা মোটেই সঠিক চিন্তা হতে পারে না। কারখানা খুলতে হলে অবশ্যই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। এটি তদারকির জন্য শক্তিশালী কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। যেসব কারখানা ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হবে, সেগুলো বন্ধ করে দেয়ার ব্যবস্থাও রাখতে হবে। কারখানা চালুর ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতে কোনো আপস কাম্য নয়।

কালের কণ্ঠ

২৬ এপ্রিল, ২০২০

পরিযায়ী শ্রমিকের পাশে তরুণরা

কালের কণ্ঠ ডেস্ক: উত্তরাঞ্চল থেকে ফরিদপুরে যাওয়া প্রায় ১০০ শ্রমিক কষ্টের জীবন যাপন করছিলেন। করোনাভাইরাস বিস্তার পরিস্থিতিতে তাঁদের কাজ ছিল না, খাবারের জন্য টাকা-পয়সা ছিল না। এ সময়ই এগিয়ে আসেন স্থানীয় কিছু তরুণ-যুবক। এ ছাড়া সারা দেশে সরকার, বিভিন্ন ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান খাদ্য ও অন্যান্য সহায়তা দিচ্ছে কর্মহীন মানুষকে। বিস্তারিত আমাদের আঞ্চলিক কার্যালয়, নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে :

ফরিদপুর শহরের গোয়ালচামট মহিম স্কুল মোড় ও হাউজিং স্টেট এলাকায় আছেন বিভিন্ন জেলার

আটকে পড়া শ্রমিকরা। গতকাল শনিবার ছিল তাঁদের মাঝে খাবার বিতরণের ১১তম দিন। শ্রমিকরা জানান, তাঁরা বাড়ি ফিরে যেতে চান না, কাজ চান। কারণ তাঁদের বাড়ির লোকজনও অভাবের মধ্যে আছে। শ্রমিকদের খাবার পরিবেশনে উদ্যোক্তাদের মধ্যে আছেন ফরিদপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহসভাপতি মো. শাহিনুজ্জামান বাবর, কোতোয়ালি থানা জাসদের সভাপতি আশরাফ উদ্দিন তারা, সাধারণ ব্যবসায়ী বিষ্ণুপদ সাহা, মো. ফরহাদ মাতুব্বর প্রমুখ। তাঁরা বলেন, ফরিদপুরের সংশ্লিষ্ট প্রশাসন এই শ্রমিকদের জন্য কাজের ব্যবস্থা করলে ভালো হতো।

প্রায় ১৩ সপ্তাহের মজুরি বকেয়া থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত তিনটি পাটকলের দুই সহস্রাধিক শ্রমিক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত 'মানবিক সহায়তা কর্মসূচির' আওতায় খাদ্যসামগ্রী পেয়েছেন। করোনাভাইরাস প্রতিরোধে খুলনা সিটি করপোরেশনের মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক গতকাল এসব সামগ্রী বিতরণ করেন। নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ ও কবিরহাট উপজেলার দরিদ্র চার হাজার পরিবারের মাঝে গতকাল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের পক্ষ থেকে ইফতার ও খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও সাবেক শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমুর পক্ষ থেকে ঝালকাঠিতে দুই হাজার পরিবারের মাঝে ইফতারসামগ্রী বিতরণ করা হয়। মাগুরা সদরের কুচিয়ামোড়া ইউনিয়নের বড়শলই গ্রামের হাসিয়া পারভিন নামের এক নারী ছয় গ্রামের ৬০০ দরিদ্র পরিবারের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী ও সাবান দিয়েছেন। কুমিল্লার নাঙ্গলকোটের ঢালুয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে এক হাজার পরিবারের মাঝে এবং উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক নজির আহম্মেদ ভূঁইয়া ও আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ব্যবসায়ী মো. জসিম উদ্দিনের অর্থায়নে মৌকারা ইউনিয়নে প্রায় ৩০০ পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

গোপালগঞ্জে এবার শহর ছাত্রলীগের উদ্যোগে শাক-সবজি বিতরণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। গতকাল ব্যাংকপাড়া যুবিল্যান্ড রেঞ্জার্স ক্লাব চত্বরে ২০০ শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে শাক-সবজি বিতরণ করে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন গোপালগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক উর্মি হক। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে গোপালগঞ্জ সদর ও টুঙ্গিপাড়া উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে শুক্রবার রাতে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দির ব্যবসায়ী মো. আরজু শেখ ও আশিক আহম্মেদ বজলুর ব্যক্তি উদ্যোগে ২০০, কালুখালীর দুর্গাপুর গ্রামের যুবক শেখ সোহেল রানা মুক্তারের উদ্যোগে শতাধিক এবং পাংশার মৌরাট ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আলম মিয়ার ব্যক্তিগত উদ্যোগে দেড় শতাধিক দরিদ্র অসহায় পরিবারের মধ্যে খাদ্য ও সাবান বিতরণ করা হয়েছে।

নরসিংদীতে রমজান মাসে প্রতিদিন চার থেকে পাঁচ হাজার মানুষকে ইফতারি বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছেন পৌর মেয়র ও শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. কামরুজ্জামান কামরুল। গতকাল প্রথম দিন শহরের প্রধান ১২টি মোড়ে এসব খাবার বিতরণ করা হয়।

নেত্রকোনার দুর্গাপুরে উপজেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের তহবিল থেকে গতকাল দলিত সম্প্রদায় ও প্রতিবন্ধী শিশুদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। একই দিন দুর্গাপুর উপজেলা ও পৌর ছাত্রলীগের উদ্যোগে শহরে শাক-সববি বিতরণ করা হয়েছে। মাদারীপুরের শিবচরের আরো প্রায় ২৫ হাজার পরিবারের মাঝে খাবার সহায়তা বিতরণ শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে।

এর আগে চিফ হুইপ নূর-ই-আলম চৌধুরীর পক্ষ থেকে শিবচরকে কনটেইনমেন্ট ঘোষণার পর প্রায় ৩০ হাজার পরিবারকে খাবার সহায়তা দেওয়া হয়। মৌলভীবাজারের জুড়ীর ইউএনও অসীম চন্দ্র বণিক শুক্রবার নিজের বেতনের টাকায় জায়ফরনগর ইউনিয়নের নয়াগ্রামে ৫০০ কৃষি শ্রমিককে খাওয়ালেন দুপুরের খাবার।

চট্টগ্রামের রাউজানের সংসদ সদস্য এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ সন্তান ফারাজ করিম চৌধুরীর উদ্যোগে রাউজানবাসীর ব্যবস্থাপনায় চট্টগ্রামের বিভিন্ন হাসপাতালে কর্তব্যরত ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সাহরির খাবার সরবরাহ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। রমজান মাসজুড়ে এটি চলবে। চরফ্যাশন উপজেলার আসলামপুর আবুগঞ্জ বাজার এলাকায় গতকাল অর্ধশতাধিক অসহায় মানুষের মাঝে ইফতারসামগ্রী ও সাবান বিতরণ করেন সাংবাদিক মো. কামরুল সিকদার। টাঙ্গাইলের ধনবাড়ীতে নিজের এক মাসের বেতনের টাকায় শুক্রবার শতাধিক দরিদ্র পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেছেন সাংবাদিক হাফিজুর রহমান। এ ছাড়া গাইবান্ধা, ফুলছড়ি, সাঘাটা, নীলফামারী, নওগাঁ, রাণীনগর, পাবনার চাটমোহর, লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা ও পাটগ্রাম; যশোরের কেশবপুর, সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় খাদ্য ও অন্যান্য সহায়তা বিতরণ করা হয়েছে।

কালের কণ্ঠ

২৬ এপ্রিল, ২০২০

লক্ষাধিক নন-এমপিও কর্মচারী চরম দুর্দশায়

শরীফুল আলম সুমন: যশোরের মণিরামপুরের ঢাকুরিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৯ সালে। বর্তমানে এই কলেজে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৫২০। শিক্ষক-কর্মচারী রয়েছেন ২৮ জন। সরকারি কোনো অনুদান নেই, প্রতিষ্ঠান থেকেও শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা দেওয়া হয় না বললেই চলে। শিক্ষকদের বেশির ভাগই প্রাইভেট-টিউশনি, কেউ মুদি দোকান আবার কেউ কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত। করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে গত ১৭ মার্চ থেকে সব কিছুই বন্ধ।

প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ তাপস কুমার কুণ্ডু কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘মফস্বলের প্রতিষ্ঠান, শিক্ষার্থীরা তেমন কোনো বেতন দেয় না। তাই আমরা শিক্ষক-কর্মচারীদেরও বেতন-ভাতা দিতে পারি না। আমাদের কলেজের ফলাফল ভালো। এর পরও এমপিওভুক্তিতে স্থান পায়নি। প্রায় দেড় মাসের মতো কলেজ বন্ধ। শিক্ষক-কর্মচারীরা অন্য যে কাজ করত তাও বন্ধ রয়েছে। কারো কাছে হাতও পাততে পারছে না। আবার মুখ ফুটে বলতেও পারছে না। আমি অধ্যক্ষ, আমি জানি। আমার শিক্ষক-কর্মচারীরা খেয়ে না খেয়ে অতি মানবেতর জীবন যাপন করছে।’

জানা যায়, দেশে বর্তমানে প্রায় সাড়ে ৯ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নন-এমপিও এক লাখ ১০ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী রয়েছেন। যারা সরকার থেকে বেতন পান না। আবার স্কুল-কলেজ থেকেও তেমন কোনো আর্থিক সুবিধা পান না। প্রায় ১০ বছর এমপিওভুক্তি বন্ধ থাকার পর গত ২৩ অক্টোবর নতুন দুই হাজার ৭৩০টি প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী, যা গত জুলাই থেকে কার্যকর হওয়ার কথা। তবে এখনো সেসব প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী এমপিওভুক্তির সুবিধা পাননি। করোনায় এই কার্যক্রমও অনেকটা পিছিয়ে গেছে। ফলে লক্ষাধিক শিক্ষক-কর্মচারী চরম দুর্দশায় জীবন পার করছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. মাহবুব হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'চলতি অর্থবছরের মধ্যেই যেন শিক্ষক-কর্মচারীরা বেতন-ভাতা পান সে জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি আমাদের রয়েছে। ছুটির মধ্যেও নতুন এমপিওভুক্তি নিয়ে কাজ চলছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোড সৃষ্টিসহ অনলাইনের যা কাজ আছে, সেগুলো করা হচ্ছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।'

মাউশি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক কালের কণ্ঠকে বলেন, 'যাচাই-বাছাইয়ের কাজ শেষ। এখন প্রজ্ঞাপন জারির জন্য অপেক্ষা। ছুটির সময়েও আমরা কিছু গ্রাউন্ড ওয়ার্ক করে রাখছি। যাতে দ্রুততম সময়ে সব কাজ শেষ করা যায়। প্রজ্ঞাপন জারির পর স্বাভাবিক নিয়মেই শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্তির জন্য অনলাইনে আবেদন করতে হবে। তবে সব কাজ যেন দ্রুততম সময়ে শেষ হয় সে ব্যাপারে সবাইকে অধিদপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হবে।' জানা যায়, এমপিওভুক্তির জন্য প্রাথমিক তালিকাভুক্ত দুই হাজার ৭৩০টি প্রতিষ্ঠানকে দুই ভাগ করে যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। এর মধ্যে স্কুল ও কলেজ যাচাই করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তর। আর কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মাদরাসা যাচাই করেছে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এবং মাদরাসা অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা।

মাউশি অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা জানান, বর্তমানে অনলাইনে শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্তির জন্য আবেদন করতে হয়। নিয়ম অনুযায়ী, প্রত্যেক শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিওসংক্রান্ত কাগজপত্র প্রতিষ্ঠান প্রধান অনলাইনে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আপলোড করবেন। এরপর তা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা যাচাই শেষে পাঠাবেন জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে। তিনি সন্তুষ্ট হলে সেই নথি পাঠাবেন আঞ্চলিক উপপরিচালকের কাছে। উপপরিচালক তা নিষ্পত্তি করে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য এমপিওসংক্রান্ত কেন্দ্রীয় কমিটিতে উপস্থাপন করবেন। প্রত্যেক বিজোড় মাসের সভায় তা চূড়ান্ত হয়।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এভাবে শিক্ষকদের চার ঘাটে ধরনা দিতে হবে। ঘুষ ছাড়া বেশির ভাগ শিক্ষকই কোনো অফিস থেকে কাগজ ছাড় করতে পারেন না। ফলে চলতি অর্থবছরে সব শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিওভুক্ত হওয়াটা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ নির্দেশনা ছাড়া এই কাজ শেষ করা সম্ভব নয়। আর এই এমপিও শেষ না হলে আগামী অর্থবছরে নতুন এমপিওভুক্তির কাজও ধরা সম্ভব হবে না। তবে শিক্ষাসচিব বলেন, 'আগামী অর্থবছরে অর্থপ্রাপ্তি সাপেক্ষে নতুন এমপিওভুক্তির কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।'

বাংলাদেশ নন এমপিও শিক্ষক-কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি গোলাম মাহমুদুন্নবী ডলার কালের কণ্ঠকে বলেন, 'করোনার এই সময়ে আমাদের শিক্ষক-কর্মচারীরা চরম দুর্দশায় প্রতিটি

দিন পার করছেন। প্রতিদিনই একাধিক শিক্ষক-কর্মচারী ফোন করে তাঁদের দুর্দশার কথা জানাচ্ছেন।' তিনি আরো বলেন, 'নতুন এমপিওভুক্ত হওয়া প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা গত ছয় মাসেও বেতন-ভাতা পাননি। চলতি অর্থবছরে এই কাজ শেষ না হলে আগামী অর্থবছরে সরকার নতুন প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তিতে কতটা আগ্রহী হবেন তা নিয়েও আমরা শঙ্কায় রয়েছি।'

কালের কণ্ঠ

২৬ এপ্রিল, ২০২০

ভয়কে জয় করে লড়ছেন প্রায় দেড় লাখ চিকিৎসাযোদ্ধা

তৌফিক মারুফ : দেশে এ পর্যন্ত ৫০০ জনের বেশি চিকিৎসাকর্মী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেও দমে যাননি অন্য হাজারো চিকিৎসাকর্মী। মারা গেছেন একজন চিকিৎসক ও একাধিক স্বাস্থ্যসেবাকর্মী। তার পরও বাকিরা জীবনের ঝুঁকি নিয়েই মানুষকে বাঁচাতে কাজ করে চলছেন নিরলস। নিজেরা সংক্রমিত হওয়ার ভয়, পরিবার-পরিজনের পিছুটান উপেক্ষা করেই চিকিৎসক, নার্স, টেকনোলজিস্ট থেকে শুরু করে পরিচ্ছন্নতাকর্মী পর্যন্ত সবাই কাজ করে চলেছেন আক্রান্ত বা আক্রান্ত সন্দেহজনক রোগীদের সেবায়।

শুরুতে চিকিৎসকদের মধ্যে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা উপকরণ নিয়ে সংশয় থাকলেও ধীরে ধীরে তা কেটে গেছে। বরং যা আছে তাই নিয়েই করোনাযুদ্ধে জয়ী হতে মনোবল শক্ত করে লড়াই করছেন তাঁরা। রাজধানী থেকে শুরু করে উপজেলা-ইউনিয়ন পর্যন্ত সব পর্যায়েই নিজ নিজ অবস্থান থেকে মানুষের সেবায় কাজ করছেন চিকিৎসাকর্মীরা।

এগিয়ে এসেছেন দেশের হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকরাও। সরকারিভাবে তাঁদেরও সক্রিয় করা হয়েছে করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে। বিশেষ করে যাঁরা যেখানেই মানুষের চিকিৎসাসেবায় জড়িত ছিলেন কেউ যেন ঘরে বসে না থেকে নিজ নিজ দক্ষতা ও মেধাকে কাজে লাগিয়ে মানুষের সেবায় নিয়োজিত হন সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে, সব মিলিয়ে সরকারি-বেসরকারি প্রায় দেড় লাখ চিকিৎসাকর্মী এই মুহূর্তে যুক্ত আছেন করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে ইতিমধ্যেই সারা দেশে সরকারি ব্যবস্থাপনায় থাকা করোনাভাইরাস প্রতিরোধী সেবায় নিয়োজিত চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যকর্মীদের তালিকা চেয়ে পাঠানো হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে, সারা দেশে সরকারি প্রায় এক লাখ চিকিৎসক, নার্স, কর্মকর্তা ও

কর্মচারী কভিড-১৯- এর চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবায় সরাসরি নিয়োজিত আছেন। তবে এটি আরো নিশ্চিত করা যাবে মাঠের তথ্য পাওয়া গেলে। এর বাইরে বেসরকারি পর্যায়ে অ্যালোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদিক মিলিয়ে আরো প্রায় ৫০ হাজারের মতো চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী কাজ করে চলেছেন, যাঁদের সবারই কমবেশি অবদান রয়েছে করোনাভাইরাসজনিত চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবায়।

সংক্রমিত হওয়ার ভয়, পরিবারের পিছুটান উপেক্ষা করেই চিকিৎসক নার্স টেকনোলজিস্টরা করোনাযুদ্ধে

এগিয়ে এসেছেন দেশের হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকরাও

প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও ইউজিসি অধ্যাপক ডা. এ বি এম আব্দুল্লাহ কালের কণ্ঠকে বলেন, এ ধরনের মহামারির ক্ষেত্রে চিকিৎসকরাই হচ্ছেন মূল ভরসা। তাঁদের ওপরই অন্য সবার ভরসা রাখা জরুরি। এখন করোনাভাইরাস মোকাবেলায় চিকিৎসকরাই কিন্তু রোগীদের কাছে থেকে সেবা দিচ্ছেন। তাঁদের অন্যান্য চিকিৎসকর্মীরা সহায়তা দিচ্ছেন। ফলে এককথায় চিকিৎসকর্মীদের কাজে সাহস জোগাতে হবে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'চিকিৎসকদের নিয়ে অনেকে সমালোচনা করে, কিন্তু সবার এটা ভাবা উচিত যে তাঁরাই এই করোনাযুদ্ধে একেবারে সামনের সারির যোদ্ধা হিসেবে কাজ করছেন। অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেই তাঁরা আমাদের নির্দেশনা অনুসারে জীবনের ঝুঁকি নিয়েই রোগীর পাশে থাকছেন, চিকিৎসা দিচ্ছেন। পাশের সহকর্মীকে আক্রান্ত হতে দেখেও অন্য রোগীদের সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। তাই তাঁদের কেবল দোষারোপ না করে সাহস জোগানো উচিত, প্রশংসা করা উচিত। আর সেদিকে নজর রেখেই প্রধানমন্ত্রী চিকিৎসাকর্মীদের জন্য নানা প্রণোদনা ঘোষণা করেছেন।'

মহাপরিচালক বলেন, চিকিৎসকদের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি স্বার্থান্বেষী মহল হীন উদ্দেশে বেশির ভাগ আত্মপ্রত্যয়ী চিকিৎসকদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার মতো নানা তৎপরতা চালাচ্ছে। সরকার সেদিকেও নজর রাখছে। চিকিৎসক নেতারাও চিকিৎসাকর্মীদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য নানাভাবে কাজ করে যাচ্ছেন সরকারের সঙ্গে মিলে।

স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ডা. ইকবাল আর্সলান বলেন, 'সারাক্ষণ সমালোচনা করে চিকিৎসকদের মন খারাপ করে দিলে বরং রোগীদের জন্যই খারাপ হয়। বরং সবার উচিত চিকিৎসকদের পাশে থাকা তাঁদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য। তবেই চিকিৎসকরা রোগীদের পাশে থেকে করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লড়ে যেতে পারবেন।' তিনি বলেন, হয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোনো কোনো চিকিৎসকের কিছু সমস্যা হতে পারে। সেটাকে বিচ্ছিন্ন হিসেবেই দেখা উচিত।

ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিকল্প চিকিৎসা বিভাগের লাইন ডিরেক্টর ডা. আজিজুর রহমান সিদ্দিকী চিঠি দিয়ে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ও ওষুধের বিষয়ে করোনার উপসর্গধারী মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো ও প্রয়োজনমতো তা ব্যবহারের বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছেন।

বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথি বোর্ডের চেয়ারম্যান ডা. দিলীপ রায় কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা সরকারের নির্দেশনা অনুসারে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সঙ্গে একযোগে কাজ করছি। আমাদের ৬৯টি হোমিওপ্যাথি কলেজ ও কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিদিন স্থানীয় রোগীদের সেবা দিয়ে যাচ্ছি। এ ছাড়া দেশে প্রায় ৬০ হাজার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক তাঁদের নিয়মিত প্র্যাকটিস চালিয়ে যাচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁরা অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকদের মতোই পিপিই ব্যবহার করে রোগীদের সেবা দিচ্ছেন। এই সেবা দিতে গিয়ে ইতিমধ্যেই আমাদের বেশ কিছুসংখ্যক চিকিৎসক আক্রান্ত হয়েছেন। তবু আমরা থেমে নেই।' তিনি আরো বলেন, 'আমরা সর্দি, জ্বর, গলা ব্যাথার মতো চিকিৎসায় নিয়মিত ওষুধের পাশাপাশি কভিড-১৯-এর ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক হোমিওপ্যাথি বোর্ডের নির্দেশনামতো আর্সেনিক জেনেরিকের একটি ওষুধ ব্যবহার করতে শুরু করেছি রোগীদের জন্য।'

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

২৬ এপ্রিল, ২০২০

শ্রমিকরা দুর্ভোগ নিয়েই ফিরছেন

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি : শিল্পনগর গাজীপুরে হাজারো প্রতিষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন স্থানের কয়েক লাখ শ্রমিক কাজে নিয়োজিত ছিলেন। করোনাভাইরাসের শুরুতে এসব শিল্পপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করায় বেশির ভাগ শ্রমিকই বাড়ি চলে যান। তবে এখন আবারও কারখানা খোলার খবরে তারা সেই দুর্ভোগ নিয়ে ফিরতে শুরু করেছেন কর্মস্থলে। গণপরিবহন বন্ধ থাকায় অতিরিক্ত ভাড়ায় রিকশা ও ভ্যানে গাজীপুরের বিভিন্ন এলাকায় প্রবেশ করছেন শ্রমিকরা।

আশরাফ উদ্দিন রমজানের প্রথম সাহরি খেয়ে গাজীপুরের চান্দনা চৌরাস্তার উদ্দেশে ময়মনসিংহের তারাকান্দা থেকে রওনা দিয়েছেন। রিকশা-ভ্যানযোগে বিকল্প মাধ্যমে ভেঙে ভেঙে বেলা ২টার দিকে শ্রীপুরের জৈনাবাজার এলাকায় পৌঁছেন। তিনি জানান, গাজীপুর থেকে তার বাড়ির দূরত্ব ৮০ কিলোমিটার। এমনিতেই ১০০ থেকে ১৫০ টাকা ভাড়ায় তিনি যাতায়াত করতেন। গণপরিবহন বন্ধ থাকায় ২০০ টাকা ভাড়ায় খোলা ট্রাকে করে তিনি বাড়ি গিয়েছিলেন। শুক্রবার কারখানার সুপারভাইজারকে ফোন দিলে তিনি কারখানায় আসতে বলেন। অন্য শ্রমিক রাশেদুল এসেছেন জামালপুর থেকে। তিনি জানান, জামালপুর থেকে জয়দেবপুর আসতে ৩০০ টাকার মতো গাড়ি ভাড়া দরকার হয়। গণপরিবহন বন্ধ থাকায় জৈনাবাজার আসতেই তার ৬০০ টাকা খরচ হয়েছে। বাকি রাস্তা যেতে আরও ২০০ থেকে ২৫০ টাকা খরচ হবে। টঙ্গী এরশাদনগরের উদ্দেশে ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা থেকে সকাল ৮টায় রওনা হয়েছেন শহিদুল ইসলাম। তিনি এরশাদনগরের একটি কারখানায় কাজ করেন। শুক্রবার বিকালে সুপারভাইজার মোবাইল ফোনে কারখানায় আসতে বলেছেন। তিনি বাড়ি থেকে রওনা দেওয়ার পর শুনেছেন কারখানা বন্ধ থাকবে। এখন তিনিসহ অনেকেই দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছেন।.

মাওনার নোমান গ্রুপের একটি কারখানার সুপারভাইজার আমিনুল হক বলেন, কর্তৃপক্ষ কারখানা খোলার বিষয়ে গতকাল তাদের জানিয়েছিল। তিনি সকালে টঙ্গী থেকে মাওনায় এলে বাড়ির মালিকরা বাড়িতে ঢুকতে দিচ্ছেন না তাকে। এদিকে লকডাউনের মধ্যেই শ্রমিকরা কাজে ফেরায় স্থানীয় বাড়ির মালিক অনেকেই আতঙ্কে রয়েছেন। এমন অবস্থায় দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে শ্রমিকরা এলাকায় প্রবেশ করায় নিরাপত্তা সমস্যা তৈরি হতে পারে। অনেক বাড়ির মালিক শ্রমিকদের বাড়িতে প্রবেশ করতে দেবেন না। হঠাৎ করে শ্রমিকরা কর্মক্ষেত্রে চলে আসায় ভোগান্তি বাড়বে।

কালের কণ্ঠ

২৬ এপ্রিল, ২০২০

খাদ্য বিভাগের বস্তা সরবরাহ, খুলনা অঞ্চলের ৮ জুটমিল আংশিক চালু

খুলনা অফিস: সরকারের খাদ্য বিভাগের বস্তা সরবরাহের জন্য প্রায় এক মাস পর খুলনা অঞ্চলের ৮টি জুটমিল আজ রবিবার আংশিকভাবে চালু হয়েছে। ভোর ৬টা থেকেই উৎপাদন শুরু করে।

বিজেএমসির খুলনা আঞ্চলিক সমন্বয়কারী মো. বনিজ উদ্দিন মিঞা জানান, খাদ্য বিভাগ ও বিএডিসির জরুরি বস্তা সরবরাহের জন্য খুলনার কার্পেটিং জুটমিল ছাড়া অন্য সবক'টি মিল আংশিকভাবে চালু রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেএমসি। যে কারণে করোনাভাইরাস প্রতিরোধে গত ২৬ মার্চ থেকে মিল বন্ধ থাকার পর আজ আবার চালু হলো। তবে মিলগুলোতে সতর্কভাবে দূরত্ব বজায় রেখে কাজ করছে শ্রমিকরা।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল সংগ্রাম পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক খলিলুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, মিলগুলোর কলোনির শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করা হচ্ছে।

কালের কণ্ঠ

২৬ এপ্রিল, ২০২০

করোনায় লোকসানে স্টিলশিল্প

বাণিজ্য ডেস্ক : করোনাভাইরাসের কারণে স্টিলশিল্প সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত উল্লেখ করে এ শিল্পের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ পাওয়াসহ সরকারের কাছে কয়েক দফা প্রস্তাব তুলে ধরেছেন বাংলাদেশ স্টিল ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান মনোয়ার হোসেন।

তিনি জানান, স্টিল স্বল্প মুনাফার একটি শিল্প। এ শিল্পে এক দিনের উৎপাদন বন্ধের লোকসান পুরো মাসের মুনাফার সমপরিমাণ। বর্তমান পরিস্থিতিতে গত মার্চ ও এপ্রিল মাসেই স্টিলশিল্পে সম্ভাব্য লোকসানের পরিমাণ প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা। দেশের অবস্থা স্বাভাবিক হলেও এ শিল্পের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হবে।

ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য মনোয়ার হোসেন কয়েক দফা দাবি পেশ করেন। এর মধ্যে অন্যতম হলো সম্ভাব্য লোকসান এবং জিডিপিতে স্টিলশিল্পের অবদানের ভিত্তিতে ৩০ হাজার কোটি টাকার সরকারি প্যাকেজ থেকে স্টিলশিল্পকে স্বল্প সুদে তিন হাজার কোটি টাকার ঋণের অনুমোদন প্রদান, স্টিলশিল্পের জন্য চার মাসের সমপরিমাণ অতিরিক্ত এলসি লিমিটের অনুমোদন প্রদান। অর্থাৎ নন-ফান্ডেড সুবিধাদি প্রদান। স্টিলশিল্পের প্রতিটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী এবং শ্রমিকদের চার মাসের বেতন-ভাতা ঋণ আকারে অন্তত ১২টি কিস্তিতে পরিশোধের অনুমোদন প্রদান। সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা দপ্তরগুলোকে দেশের এই ক্রান্তিকালে নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্যও অনুরোধ করেন তিনি।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

২৬ এপ্রিল, ২০২০

হাজার কোটি টাকার শিল্প আজ শুধুই সুন্দর অট্টালিকা

এ এইচ আসলাম সানী

প্রতিটি মানুষ আজ করোনাভাইরাসের ভয়ে ঘরে বসে আছে। বহু মানুষ আক্রান্ত হয়েছে। শুধু বাংলাদেশেই নয়, উন্নত দেশগুলোয় আজ মৃত্যুর মিছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকানপাট সব বন্ধ (খাবার ও ওষুধের দোকান ছাড়া)। পৃথিবীর জানা ইতিহাসে এমন লকডাউন কখনো হয়নি। বাংলাদেশে আজ এক মাসের বেশি সময় ধরে সবকিছু বন্ধ। এ পরিস্থিতিতে ১৬ কোটি মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে সরকারের পাশাপাশি সব পেশার মানুষ উদ্বিগ্ন। আমি গার্মেন্টশিল্পের একজন উদ্যোক্তা হিসেবে চিন্তিত। আমার ৩০ বছরের কষ্টের সমস্ত উপার্জন রি-ইনভেস্ট করে ১৫

হাজার শ্রমিক ও ১ হাজার শিক্ষিত তরুণের কর্মসংস্থান তৈরি করেছি। এ ৩০ বছর যা উপার্জন করেছি, তার ৯৫ শতাংশ বিনিয়োগ করে তিলে তিলে গড়া হাজার কোটি টাকার শিল্প আজ শুধুই সুন্দর অট্টালিকা ছাড়া কিছুই নয়। শুধু আমি নই, আমার মতো প্রথম প্রজন্মের গার্মেন্টশিল্প একইভাবে বিকশিত হয়েছে। এ শিল্পের সঙ্গে জড়িত সবার আত্মত্যাগেই আজ বাংলাদেশ বিশ্বে দ্বিতীয় রপ্তানিকারক দেশ।

২০১৪ সালে অবরোধের সময় ৪০ শতাংশের বেশি এয়ার শিপমেন্ট করে আমাদের বায়ারদের অনটাইম নিশ্চিত রেখেছি। এসব প্রতিকূলতার মধ্যে আমাদের শিল্পের মালিকরা কোনো প্রণোদনা পাননি বা প্রণোদনা চাননি। রানা প্লাজার দুর্ঘটনার পর মেড ইন বাংলাদেশ যখন রক্তমাখা শার্ট হিসেবে বিবেচিত হয়েছে সমস্ত বিশ্বের কাছে, যে ধ্বংসস্তূপ থেকে কোনো প্রণোদনা ছাড়া ৩ বিলিয়ন ডলার ইনভেস্ট করে বায়ারদের সন্তুষ্টির জন্য ফায়ার অ্যান্ড ইলেকট্রিক সেইফটি বিল্ডিং আজ বিশ্বের কাছে উদাহরণ। খুব মজার কথা হলো, কোনো বিদেশি বায়ার কিংবা সরকার আমাদের এ বিনিয়োগে শামিল হয়নি।

এখানে উল্লেখ করতে চাই- শুধু ফায়ার সেইফটি ইকুইপমেন্ট শুল্ক ৫ শতাংশ রাখতে দুই বছরের বেশি লেগেছে। এখন প্রশ্ন- এই ৪০ বছরে এতগুলো বিপর্যয় কীভাবে সামাল দিলেন গার্মেন্টশিল্পের মালিকরা।

আমি কারও নাম উল্লেখ না করে বলতে চাই, যাদের হাত ধরে এ দেশে গার্মেন্টশিল্প গড়ে উঠেছিল, তাদের আজ ৯০ শতাংশ ব্যক্তিগতভাবে দেউলিয়া হয়ে গেছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে কেন মানুষ এ ব্যবসা করে? কারণ এ ব্যবসা থেকে বের হওয়ার আইনগত কোনো ব্যবস্থা নেই।

আজ যখন বলছি তখন কত আর্থিক লোকসানের মাধ্যমে এ শিল্পের উত্তরণ হবে তা কারও জানা নেই। আমরা শুধু জেনেছি সাড়ে ৩ বিলিয়ন ডলারের অর্ডার বাতিল হয়েছে। এইসঙ্গে শ্রমিক-কর্মচারীদের তিন মাসের বেতন, বিদ্যুৎ, গ্যাস, ব্যাংকের সুদ আরও ২ বিলিয়ন পর্যন্ত লোকসান হবে। সব মিলিয়ে ৬ বিলিয়ন ডলার লোকসান হবে।

আজ কল্পনাও করতে পারছি না। ৪০ বছরে গড়ে ওঠা এ শিল্পের সঙ্গে মালিক-কর্মচারী-শ্রমিক সবার ভবিষ্যৎ। শুধু গার্মেন্টশিল্পের বিপর্যয়ই নয়, এর সঙ্গে জড়িত ব্যাংক, বিমা, হোটেল, ট্রান্সপোর্ট সব ব্যবসাই অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে।

আজ ইউরোপ-আমেরিকার সব স্টোর ও শপিং মল বন্ধ। তাদের দুই মাসের বেশি বন্ধ থাকলে পরবর্তী সিজনের চার মাস এ অচলাবস্থা থাকবে। পণ্য স্বাভাবিক পর্যায়ে বিক্রি করতে পারবে না। সেইসঙ্গে নতুন কোনো অর্ডারও সাপ্লাই চেইনে নেই। একদিকে বিলিয়ন বিলিয়ন অর্ডার স্টক, নতুন কোনো অর্ডার সাপ্লাই চেইনে নেই। তাই তো ৯৫ শতাংশ বায়ারের ক্যাশ ফ্লো বন্ধ হয়ে যাবে। আমার ধারণা, ৪০ শতাংশ বায়ার আর্থিক সংকট কাটিয়ে উঠতে পারবে না এবং তারা তাদের দেউলিয়া ঘোষণা করে বন্ধ করে দেবে।

সমস্ত সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ হওয়ার জন্য ৫০ শতাংশ যুবসমাজ চাকরি হারাবে। ফলে ইউরোপ-আমেরিকায় ৩০-৪০ শতাংশ অর্ডার কমে যাবে। একই সঙ্গে চাহিদা কমে যাওয়া ও রপ্তানি-

আমদানিকারক দেশগুলোর অর্থনৈতিক সখ্য কমে যাওয়ায় তৈরি পোশাকের চাহিদা ৩০ শতাংশ কমে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

সে হিসেবে আমাদের ১৫ লাখ শ্রমিক চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে আছে। শুধু শ্রমিক নয়, বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে ৫০ শতাংশ আছে যারা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে গার্মেন্টশিল্পের সঙ্গে জড়িত। এই শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের কথা কেউ বলে না। তারা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষিত মার্চেন্ডাইজার, প্ল্যানিং ইঞ্জিনিয়ার, ফ্যাশন ডিজাইনার এবং টেক্সটাইল ও ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার। এই ৫ লাখ শিক্ষিত যুবকের বেতন ৫০০ থেকে ৮ হাজার ডলার। এই শিক্ষিত তরুণের ৪০ শতাংশের বেকার হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আজ যখন অনেক মালিক মহামারী পরিস্থিতিতে আইন মেনে লে অফ ঘোষণা করছেন, তখন শ্রমিকনেতা নামধারী অনেকে যারা কোনো দিন শ্রমিক হিসেবে কোনো কারখানায় কাজ করেননি, তারাই মালিকদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাচ্ছেন। অনেকে বলছেন, শ্রমিক ছাঁটাই বেআইনি। একটু ভেবে দেখুন, একটি কারখানায় যখন তিন মাসের উদ্যাপন অর্ডার বাতিল হয়ে যা; যা দুই বছরের বেতনের সমান, তাহলে মালিকের কত টাকা জমানো আছে যে, সেই মালিক বসিয়ে বসিয়ে বেতন দিতে পারবেন?

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে সত্যিই বলেছেন, অন্ধকারের পরই আলো। কিন্তু যে অন্ধকারে আজ গোটা পৃথিবী নিমজ্জিত, এর উত্তরণে দরকার সব মানুষের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা। যাতে নতুন করে নতুনভাবে সবাই সবকিছু গড়ে তুলতে পারে। লেখক : সাবেক প্রথম সহসভাপতি বাংলাদেশ নিটওয়্যার প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতি- বিকেএমইএ।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

২৬ এপ্রিল, ২০২০

অনিশ্চয়তায় ৫৯ লাখ নির্মাণশ্রমিক

রুহুল আমিন রাসেল : করোনাভাইরাসের সংকটময় পরিস্থিতিতে কাজ না থাকায় জীবন-যাপনে চরম অনিশ্চয়তায় ভুগছেন সারা দেশের প্রায় ৫৯ লাখ নির্মাণ শ্রমিক। জানা গেছে, দেশের অবকাঠামো নির্মাণকারী কনস্ট্রাকশন প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষতি হয়েছে সাড়ে ২৬ হাজার কোটি টাকা। এই খাতের প্রায় ৩৪ লাখ শ্রমিকের ভবিষ্যৎ এখন অজানা। আছে ছাঁটাই, চাকরি হারানো ও বেকারত্বের শঙ্কা। আবার আবাসন নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রায় ২৫ লাখ শ্রমিক এখন কর্মহীন। এই খাতে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির আশঙ্কা উদ্যোক্তাদের। এখন নির্মাণ শ্রমিকদের দাবি, হয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ দিন, নয় ত্রাণ দিন।

- কনস্ট্রাকশন খাতে ক্ষতি ২৬,৫০০ কোটি টাকা
- ৩৪ লাখ শ্রমিকের ভবিষ্যৎ অজানা
- আবাসনশিল্পের ২৫ লাখ শ্রমিক কর্মহীন হয়েছে
- দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির আশঙ্কা
- হয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ, নয় ত্রাণ চান অনাহারী নির্মাণশ্রমিকরা

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, দেশের প্রধান রপ্তানি খাতের কথা বলে শুধু পোশাকশিল্পের স্বার্থ রক্ষা করলে দেশ ও অর্থনীতি বাঁচবে না। শিল্প খাত ও অন্যান্য ব্যবসায় যারা লিপ্ত তাদের সুবিধা-অসুবিধাও দেখতে হবে। সরকার ও প্রশাসনের দৃষ্টি শুধুই পোশাকশিল্পে। সেখানে প্রায় ২৫ লাখ শ্রমিক আছে, এই কথা বলে সরকারের কাছ থেকে প্রতি মুহূর্তে সুবিধা নিচ্ছেন পোশাকশিল্প মালিকরা। কিন্তু নির্মাণ ও আবাসনশিল্প মিলিয়ে যে প্রায় ৫৯ লাখ নির্মাণ শ্রমিক রয়েছেন, তাদের বাঁচিয়ে রাখা নিয়ে কেউ ভাবছে না।

ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন বাংলাদেশ-ইনসাব সাধারণ সম্পাদক আবদুর রাজ্জাক গতকাল বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, সারা দেশে শ্রমিকরা এখন কর্মহীন। তারা ত্রাণও পায়নি। ঢাকার অনেক নির্মাণ শ্রমিকের জাতীয় পরিচয়পত্র নেই বা এখনো হাতে পায়নি। তাদের স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা ত্রাণ দেয়নি। ফলে শ্রমিকরা এখন অর্ধাহার ও অনাহারে আছেন। সরকারের কাছে আমাদের দাবি- হয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ দিন, নয় ত্রাণ দিন।

জানা গেছে, আবাসন ও কনস্ট্রাকশন শিল্পের সঙ্গে রড, সিমেন্ট, সিরামিক, রংসহ অনেক শিল্প খাত জড়িত। কীভাবে করোনাভাইরাসের এমন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ ঘটবে, তা কেউ বলতে পারছেন না। আবাসন ও কনস্ট্রাকশন খাতে আরও ধাক্কা আসতে পারে। কবে নাগাদ এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ ঘটবে, তার উপায় দেখছেন না উদ্যোক্তারা। এ অবস্থায় আবাসন খাতকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য সরকারকে নীতি সহায়তা চান উদ্যোক্তারা। তারা বলছেন, আবাসন খাত পদে পদে যেসব হয়রানির শিকার হচ্ছে, তা থেকে পরিত্রাণ নিশ্চিত করতে হবে সরকারকে। প্রকল্প অনুমোদনের সব প্রক্রিয়া সহজীকরণ করতে হবে। নীতি সহায়তার সঙ্গে কর প্রণোদনাও প্রয়োজন। এগুলো সরকার ইতিবাচকভাবে দেখলেই ঘুরে দাঁড়াবে আবাসন খাত। করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে বিপদগ্রস্ত নির্মাণ শ্রমিকরাও রক্ষা পাবেন। এখন নির্মাণ শ্রমিকের ভাগ্য অনিশ্চিত।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রি- বিএসিআই সভাপতি প্রকৌশলী এস এম খোরশেদ আলম গতকাল বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, করোনা পরিস্থিতিতে সারা দেশের কনস্ট্রাকশন খাতের সব কাজ বন্ধ রয়েছে। কনস্ট্রাকশন খাতের ৩৫ লাখ দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের ভবিষ্যৎ অজানা। কাজ না পেলে এই শ্রমিকরা না খেয়ে মারা যাবেন। এর মধ্যে চলমান পরিস্থিতিতে ৫০ শতাংশ কর্মসংস্থান হারানোর আশঙ্কা রয়েছে। সামনের দিনগুলোতে উদ্যোক্তারা বাধ্য হয়ে শ্রমিক ছাঁটাই করবেন অথবা শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়বেন। যদিও এই শ্রমিকদের পেছনে সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি-এডিপি বা উন্নয়ন বাজেটের ১০ শতাংশ খরচ হয়। উন্নয়ন বাজেটের এই টাকা থেকে কনস্ট্রাকশন খাতের নির্মাণ শ্রমিকরা মজুরি পান। তিনি বলেন, দেশের উন্নয়ন বাজেটের ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ অর্থ খরচ হয় ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাসে। এই খরচ এখন হবে না। করোনা পরিস্থিতিতে এবার এপ্রিল থেকে জুন চলতি ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এই শেষ প্রান্তিকের তিন মাসে এডিপির ক্ষতি হবে সাড়ে ১৩ শতাংশ। যা টাকার অঙ্কে দাঁড়াবে ২৭ হাজার ৬২৫ কোটি। এর মধ্যে নির্মাণ শ্রমিকরা তাদের বেতন বাবদ পেতেন সাড়ে ৫ হাজার কোটি টাকা। এ ছাড়া ওই টাকা থেকে সরকার বিপুল পরিমাণ ভ্যাট ও করসহ অন্যান্য রাজস্ব হারাবে। এমন পরিস্থিতিতে অর্থনীতি ধরে রাখতে সরকারের মেগা প্রকল্পগুলোর ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে। শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের স্বার্থে উন্নয়ন কর্মকান্ড

অব্যাহত রাখতে হবে। আবার অনেক কনস্ট্রাকশন প্রতিষ্ঠান ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে বিপাকে পড়েছেন বলেও জানান বিএসিআই সভাপতি।

এ প্রসঙ্গে আবাসনশিল্প মালিকদের সংগঠন রিয়েল অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-রিহ্যাব সভাপতি আলমগীর শামসুল আলামিন কাজল বলেন, আমাদের করোনা পরিস্থিতি সতর্কতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। আবার অর্থনীতিও যাতে ধ্বংস না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। তাই দেশে ক্রমান্বয়ে শিল্প কারখানাগুলো খুলে দেওয়া হলে আবাসন খাতেও সরকারের স্বাস্থ্যবিধি মেনে নির্মাণ কাজ শুরু করব। কারণ- আমাদের ২৫ লাখ শ্রমিক গত ৪০ দিন ধরে বেকার। তারা কাজ না পেলে বেতনও পান না। দ্রুত কাজ শুরু করা গেলে আবাসন খাতের এই নির্মাণ শ্রমিকদের সহায়তা করা যাবে। রিহ্যাব সভাপতি বলেন, করোনাভাইরাসের আঘাতে আবাসন খাতে দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতি হয়ে গেছে। যে কোনো সংকটে প্রথম আঘাত আসে আবাসন খাতে। এবার ঘুরে দাঁড়াতে সময় লাগবে। পুঁজিবাজার ধসের পর আবাসন খাত ঘুরে দাঁড়াতে সময় লেগেছিল ৫ বছর। এবার করোনাভাইরাসের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের বিষয়টি আরও কিছু দিন পরে দেখা হবে বলেও জানান এই রিহ্যাব নেতা। রিহ্যাবের সাবেক সভাপতি প্রকৌশলী এম এ আউয়াল বলেন- করোনাভাইরাসের প্রভাবে আবাসন খাতের অবস্থা খুবই খারাপ। এ শিল্প বাঁচাতে সরকারের নীতি সহায়তা প্রয়োজন।

রিহ্যাবের আরেক সাবেক সভাপতি প্রকৌশলী তানভিরুল হক প্রবাল বলেন- করোনাভাইরাসের প্রভাবজনিত নাজুক পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে ক্রেতাদের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ প্রণোদনা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, সরকার তৈরি পোশাকশিল্পে ২ শতাংশ সুদে ৫ হাজার কোটি টাকা সহজ শর্তে ঋণ হিসেবে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। আমরা উদ্যোক্তারা নিজেদের জন্য এমন ঋণ চাই না। কিন্তু ক্রেতাদের জন্য কম সুদে ঋণ চাই। এর সঙ্গে আবাসন খাতের স্থবিরতা কাটাতে করোনাভাইরাসের সংকট সময়ে ক্রেতাদের জন্য প্লট ও ফ্ল্যাটের রেজিস্ট্রেশন খরচও কমাতে হবে। ক্রেতাদের সুবিধা প্রদান ও কিছু প্রণোদনা চাই।

বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী
এপ্রিল ২৬, ২০২০

সীমিত পরিসরে পোশাক কারখানা খুলছে আজ
গ্রাম থেকে ফিরে আসা কর্মীদের এখনই কাজে না নেয়ার অনুরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক : স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সীমিত আকারে আজ থেকে খুলছে দেশের সবচেয়ে বড় শ্রমঘন পোশাক খাতের কারখানা। আর এক্ষেত্রে কাজে নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে কারখানায় নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করা কর্মীদের নিযুক্ত করার পরামর্শ দিয়ে গ্রাম থেকে ফিরে আসা শ্রমিকদের নিযুক্ত করতে নিরুৎসাহিত করেছে খাতসংশ্লিষ্ট দুই সংগঠন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ।

কারখানা খোলার বিষয়ে বিজিএমইএর পরামর্শে দেখা গেছে, কারখানা পরিচালনার দ্বিতীয় ধাপ শেষ না হওয়া পর্যন্ত গ্রাম থেকে ফিরে আসা কর্মীদের কারখানায় প্রবেশ করানো থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মীদের প্রাথমিক পর্যায়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ফিনিশিং সেকশন, স্যাম্পল সেকশন ও সুইং সেকশন আংশিকভাবে খোলা রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়েছে কারখানা কর্তৃপক্ষকে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, ঢাকা মহানগর ও নারায়ণগঞ্জের কিছু শিল্প-কারখানা খুলছে আজ। আগামীকাল আরো কিছু কারখানা খুলবে। ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের কারখানাগুলো চালুর পর ধীরে ধীরে অন্য অঞ্চলের শিল্প-কারখানাগুলোও খুলে দেয়া হবে। দেশের সিংহভাগ কারখানা আগামী ৩ মের মধ্যে খুলে যাবে। শ্রমিকদের সুরক্ষা ও প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে কেবল আশপাশের এলাকার শ্রমিকদের কাজে নিয়োজিত করার কথা জানিয়েছেন কারখানার মালিকরা।

দেশের রফতানিমুখী শিল্প খাতসংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলো সূত্রে জানা গেছে, কারখানা খোলার প্রথম ধাপে আজ ও আগামীকাল ঢাকা মহানগর এলাকার বিভিন্ন শিল্প-কারখানা খুলবে। ২৮ থেকে ৩০ এপ্রিলের মধ্যে খুলবে আশুলিয়া, সাভার, ধামরাই ও মানিকগঞ্জ এলাকার বিভিন্ন শিল্প-কারখানা। নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ ও কাঁচপুর এবং নরসিংদী এলাকার বিভিন্ন শিল্প-কারখানা খুলবে ৩০ এপ্রিল। ২ ও ৩ মের মধ্যে গাজীপুর ও ময়মনসিংহ এলাকার শিল্প-কারখানা খুলবে। এর বাইরে আজ থেকে নারায়ণগঞ্জ এলাকার নিটিং, ডায়িং কারখানাগুলো খুলে দেয়ার কথা জানিয়েছে বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ)।

সদস্যদের উদ্দেশে বিজিএমইএ বলেছে, অর্থনীতির চাকা সচল রাখার জন্য সামগ্রিক বিবেচনায় বিজিএমইএ জোনভিত্তিক, সীমিত পরিসরে কারখানা খোলার পরামর্শ দেবে। এর আগে শ্রমিকদের ঢাকায় না আনার জন্যও সদস্যদের পরামর্শ দেয়া হলো। সেসব কর্মীকে নিয়ে কারখানা চালু করুন, যারা কারখানার নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করেন। মানবিক প্রয়োজনে ছাঁটাই না করার অনুরোধও জানিয়েছে বিজিএমইএ।

অন্যদিকে বিকেএমইএ বলেছে, ২৬ এপ্রিল থেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিটওয়্যার খাতের নিটিং-ডায়িং এবং স্যাম্পল সেকশন খুলে দেয়ার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে সংগঠনের পক্ষ থেকে। ২ মে পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে গার্মেন্টস সেকশনও খোলার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। তবে খুব জরুরি প্রয়োজনে সীমিত আকারে আগামীকাল (আজ) থেকে গার্মেন্টস সেকশনও খোলা যাবে। তবে পর্যায়ক্রমে খুললেও এ মুহূর্তে দূরদূরান্ত থেকে শ্রমিক ভাই-বোনদের কর্মস্থলে না ফেরার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে বিকেএমইএ।

কারখানায় প্রবেশের সময় কর্মীদের শরীরে নিয়মিত তাপমাত্রা পরীক্ষার ব্যবস্থা ও বিভিন্ন জীবাণুনাশক উপকরণ সরবরাহের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে মালিকদের। কোনো শ্রমিকের

শরীরের তাপমাত্রা ৩৭ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হলেই তাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে বলা হয়েছে। শ্রমিকদের মাস্ক পরে থাকা ও প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধিও মেনে চলতে বলা হয়েছে। কারখানায় দর্শনার্থী প্রবেশের ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

কাজের সময় কারখানা ভবনে অপ্রয়োজনীয় চলাচল সীমিত করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি যেসব কর্মী লোডিং ও আনলোডিং করবে, তাদের অন্য কর্মীদের থেকে আলাদা রাখার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এছাড়া কারখানার নিয়োগকর্তাকে শ্রমিক এবং নিজেদের মধ্যে স্পষ্ট যোগাযোগ চ্যানেল প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে পিএ সিস্টেমের মাধ্যমে দিনে অন্তত চারবার প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ও নির্দেশনার বিষয়ে ঘোষণা দেয়া হবে। শ্রমিকদের দ্রুত খবর পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। নোটিস বোর্ডে জরুরি ফোন নম্বর এবং স্পষ্ট বার্তা দিতে হবে।কারখানা কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই নভেল করোনাভাইরাসের বিস্তার এবং স্থানীয় বিভিন্ন খবরের বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। কর্মী কিংবা সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায় এমন কোনো তথ্য বা খবর প্রচার করা যাবে না।

প্রথম আলো

২৭ এপ্রিল ২০২০

শ্রমিকেরা কারখানায় ফিরছেন, সামাজিক দূরত্ব মানছেন না

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা: অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে করোনাভাইরাস সংক্রমণ ঝুঁকির মধ্যেই কাজ শুরু হয়ে গেছে তৈরি পোশাক কারখানাগুলোতে। এক মাস ছুটির পর ঝুঁকি নিয়েই কাজে যোগ দিয়েছেন শ্রমিকেরা। এত দিন শহরের তেমন শোরগোল না থাকলেও কাল চট্টগ্রাম নগরের ইপিজেড এলাকা ফিরে আসে পুরোনো চেহারায়। সারা দিন কাজ শেষে বৃষ্টিতে ছাতা মাথায় বাড়ি ফিরছেন শ্রমিকেরা। গতকাল বিকেল চারটায়। ছবি: জুয়েল শীলঢাকা, সাভার, আশুলিয়া,র, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামে বন্ধ থাকা রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানা সীমিত আকারে গতকাল রোববার খুলেছে। করোনার সংক্রমণ এড়াতে স্বাস্থ্যবিধি মেনেই কারখানাগুলো চালু করা হয়েছে। তবে কারখানার বাইরে চলাচলের ক্ষেত্রে শ্রমিকেরা সামাজিক দূরত্ব মানছেন না।

পোশাকশিল্পের মালিকদের দুই সংগঠন বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ নিষেধের পরও দূরদূরান্ত থেকে শ্রমিকেরা ঝুঁকি নিয়েই কর্মস্থলে ফিরছেন। গণপরিবহন বন্ধ থাকায় কর্মস্থলে ফিরতে ভোগান্তিতে পড়তে হয় তাঁদের।

করোনার সংক্রমণ ঠেকাতে ৫ এপ্রিল থেকে কারখানা বন্ধের ঘোষণা দেয় বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ। সরকারি ছুটির সঙ্গে সমন্বয় করে তা ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়। এরপর গতকাল থেকে সীমিত পরিসরে ধাপে ধাপে কারখানা খোলার সিদ্ধান্ত নেয় সংগঠন দুটি।

এদিকে সীমিত আকারে কারখানা খোলার দিনে গতকাল মার্চের বকেয়া মজুরির দাবিতে রাজধানীর মালিবাগের একাধিক পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা বিক্ষোভ করেছেন। এ ছাড়া গাজীপুরে টঙ্গী, আশুলিয়া ও নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন স্থানেও বকেয়া মজুরির দাবি ও ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিকেরা।

বিকেএমইএর পক্ষ থেকে শুধু স্যাম্পল, নিটিং ও ডায়িং সেকশন চালুর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। আর বিজিএমইএ গতকাল থেকে ঢাকা মহানগরীর ২১৩টি কারখানা চালুর নির্দেশনা দিয়েছিল। তবে গতকাল ঢাকা মহানগরী ছাড়াও অন্যান্য এলাকার কারখানাও চালু হয়।

শিল্প পুলিশ জানায়, সাভার, আশুলিয়া, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও খুলনায় বিজিএমইএর সদস্যভুক্ত ৪৮০ কারখানা গতকাল থেকে চালু হয়েছে। এসব এলাকায় বিকেএমইএর ১২১টি ও বিটিএমএর সদস্যভুক্ত ৫৮টি বস্ত্রকল খুলেছে। সাভার, আশুলিয়া, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও খুলনায় পোশাকসহ অন্য শিল্পকারখানা রয়েছে ৭ হাজার ৬০২টি। তার মধ্যে গতকাল চালু ছিল ১ হাজার ৪২৭টি।

জানতে চাইলে বিজিএমইএর সহসভাপতি ফয়সাল সামাদ প্রথম আলোকে বলেন, 'উৎপাদন চালুর জন্য প্রায় এক হাজার কারখানা নিবন্ধন করেছিল। আমরা তাদের ধাপে ধাপে চালু করার নির্দেশ দিয়েছি। তার বাইরে কেউ খুললে স্থানীয় প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে করেছে।' সংগঠনটির আরেক সহসভাপতি আরশাদ জামাল বলেন, দূরদূরান্ত থেকে শ্রমিকদের আপতত না আনতে এবং কাউকে ছাঁটাই না করতে প্রত্যেক সদস্যকে বলা হয়েছে।

বিকেএমইএর ২০ শতাংশ কারখানা গতকাল থেকে সীমিত পরিসরে চালু হয়েছে বলে জানান বিকেএমইএর সহসভাপতি মোহাম্মদ হাতেম। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, 'দূরদূরান্ত থেকে শ্রমিকদের কাজে না আনতে আমাদের নির্দেশনা ছিল। তারপরও শ্রমিকেরা কেন ফিরছেন, তা বোধগম্য নয়।'
সাভার থেকে আমাদের নিজস্ব প্রতিবেদক জানান, সাভার ও আশুলিয়ায় দুই শতাধিক পোশাক ও বস্ত্র কারখানা চালু হয়েছে। কারখানাগুলো শ্রমিকের সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে ব্যবস্থা নিয়েছে।

আশুলিয়ায় শারমীন গ্রুপের পাঁচটি কারখানায় কাজ করেন প্রায় ১২ হাজার শ্রমিক। সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে গ্রুপটির সব কটি কারখানায় দুই পালা (শিফট) চালু করা হয়েছে। গ্রুপের

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইসমাইল হোসেন বলেন, দুই শিফট চালু করায় শ্রমিকেরা ছয় ফুট দূরত্বে বসে কাজ করতে পারছেন।

সাভারের কয়েকটি কারখানা ঘুরে দেখা যায়, কারখানার ভেতরে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করা হলেও বাইরে আসা–যাওয়ার ক্ষেত্রে শ্রমিকেরা তা মানছেন না।

নারায়ণগঞ্জ থেকে আমাদের প্রতিনিধি জানান, নারায়ণগঞ্জের ৮১টি পোশাক কারখানা গতকাল চালু হয়েছে। সেখানে শ্রমিকের উপস্থিতি ছিল ২৫ শতাংশ। নাম প্রকাশ না করার শর্তে আদমজী ইপিজেডের ইপিক গার্মেন্টসের এক কর্মকর্তা জানান, কারখানার প্রবেশমুখে জুতা ও হাতে জীবাণুনাশক তরল স্প্রে করে তারপর শ্রমিকদের ভেতরে ঢোকানো হয়।

আমাদের গাজীপুর প্রতিনিধি জানান, সেখানকার পোশাক ও বস্ত্র মিলিয়ে ৪৩৮টি কারখানা গতকাল চালু হয়েছে। বেশ কিছু কারখানায় থার্মাল স্ক্যানার দিয়ে তাপমাত্রা পরীক্ষা করে শ্রমিকদের ভেতরে ঢোকানো হয়। এ ছাড়া সব শ্রমিকের হাত ধোয়া ও মুখে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করেছে কারখানা কর্তৃপক্ষ।
চট্টগ্রাম থেকে আমাদের নিজস্ব প্রতিবেদক জানান, সেখানকার প্রায় দুই শ কারখানা গতকাল খুলেছে। কারখানায় যেতে যানবাহন না পেরে ভোগান্তিতে পড়েন বেশির ভাগ শ্রমিক। যানবাহন না পেয়ে গতকাল সকালে দুই শতাধিক শ্রমিক নগরীর বালুছড়া নতুনপাড়া এলাকার সড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন। চট্টগ্রামের ইপিজেডে ৭০টি ও কেইপিজেডে ২০টি কারখানা গতকাল খুলেছে। সিইপিজেডের বেশ কয়েকটি কারখানায় বসেছে থার্মাল স্ক্যানার। সেই যন্ত্র দিয়ে শরীরের তাপমাত্রা মেপে শ্রমিকদের কারখানায় প্রবেশ করানো হয়। একইভাবে কেইপিজেডের কারখানাগুলোর ফটকেও থার্মাল স্ক্যানার বসানো হয়।

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ বা বেপজার মহাব্যবস্থাপক খুরশিদ আলম প্রথম আলোকে বলেন, সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করে ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে ২৫ শতাংশ শ্রমিক দিয়ে কিছু কারখানা চালু করা হয়েছে। কারণ, এসব কারখানার হাতে বিদেশি ক্রেতাদের বেশ কিছু ক্রয়াদেশ ছিল। ক্রেতারা দ্রুত পণ্য সরবরাহের জন্য চাপ দিচ্ছিল।

চট্টগ্রামে বিজিএমইএর সদস্যভুক্ত কারখানাগুলোর মধ্যে এক–তৃতীয়াংশ গতকাল খোলা ছিল বলে জানিয়েছেন সংগঠনটির প্রথম সহসভাপতি এম এ সালাম।

আমাদের মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, জেলার শিমুলিয়া ঘাটে গতকাল ঢাকামুখী পোশাকশ্রমিকসহ বিভিন্ন পেশার মানুষের ভিড় ছিল। তবে গণপরিবহন বন্ধ থাকায় চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয় তাঁদের। ঘাটের ব্যবস্থাপক (বাণিজ্য) শাফায়াত আহম্মেদ বলেন, শিমুলিয়ার চারটি ঘাটের মধ্যে মাত্র একটি সচল। ফেরিতে যাত্রীদের উঠতে নিষেধ করলেও তাঁরা তা উপেক্ষা করে গন্তব্যে ছুটেছেন।

সমকাল

২৭ এপ্রিল ২০২০

ঝুপড়ি ঘরে কোয়ারেন্টাইনে নারী স্বাস্থ্যকর্মী

কোটালীপাড়া (গোপালগঞ্জ) প্রতিনিধি: ঢাকার একটি হাসপাতালে চাকরি করতেন এক নারী স্বাস্থ্যকর্মী (২১)। গত মঙ্গলবার তিনি ছুটি নিয়ে বাড়িতে আসেন। বাড়িতে আসার পর স্থানীয় এক আওয়ামী লীগ নেতার নির্দেশে এই নারী স্বাস্থ্যকর্মীকে এলাকাবাসী একটি নির্জন স্থানে পুকুরের মধ্যে তালপাতা দিয়ে ঝুপড়ি ঘর তৈরি করে তার মধ্যে কোয়ারেন্টাইনে রাখেন। প্রায় ১ সপ্তাহ ধরে রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে এই নারী স্বাস্থ্যকর্মী ওখানে অবস্থান করছেন।

ঘটনাটি ঘটেছে গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার সাদুল্লাপুর ইউনিয়নের লগন্ডা গ্রামে। এ ঘটনাটি সামাজিক যোগযোগমাধ্যমে প্রচার হওয়ার পর গোটা উপজেলাব্যাপী আলোচনার ঝড় উঠেছে।

জানা গেছে, ঢাকার ইমপালস হাসপাতালে চাকরি করতেন এই নারী স্বাস্থ্যকর্মী। করোনাভাইরাসের কারণে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাকে ছুটি দিয়ে দেয়। ছুটিতে তিনি বাড়িতে আসেন। বাড়িতে আসার খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে সাদুল্লাপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক প্রশান্ত বাড়ৈর নির্দেশে এলাকাবাসী এই নারী স্বাস্থ্যকর্মীকে তার বাড়ির প্রায় ৪০০মিটার দূরে একটি নির্জন স্থানে পুকুরের ভেতর তালপাতা দিয়ে ঝুপড়ি ঘর তৈরি করে তাকে কোয়ারেন্টাইনে রাখে।

ভুক্তভোগী ওই নারী স্বাস্থ্যকর্মী বলেন, আজ প্রায় এক সপ্তাহ ধরে আমি এখানে রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে মানবেতর জীবনযাপন করছি। একজন স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে আমি অনেক মানুষকে সেবা দিয়েছি। আর আজ এখানে থেকে আমার স্বাস্থ্য হুমকির মুখে পড়েছে।

ওই স্বাস্থ্যকর্মীর মা বলেন, আমার স্বামী নেই। আমার এই মেয়েটার আয়ে আমার সংসার চলে। আমার মেয়েটির এখনও বিয়ে হয়নি। তাকে এভাবে একটি পুকুরের মধ্যে ঝুপড়ি ঘরে রাখা হয়েছে। আমার মেয়েটির যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে এর দায় কে নেবে? এলাকার আওয়ামী লীগ নেতা প্রশান্ত বাড়ৈ চাপ সৃষ্টি করে আমার মেয়েটিকে এখানে রেখেছে। আমি প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগ নেতা প্রশান্ত বাড়ৈর কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, এলাকাবাসীর সবার সিদ্ধান্তে ওই নারী স্বাস্থ্যকর্মীকে পুকুরের মধ্যে ঝুপড়ি ঘর তৈরি করে সেখানে রাখা হয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মাহফুজুর রহমান বলেন, বিষয়টি অত্যন্ত অমানবিক। এই স্বাস্থ্যকর্মীকে এলাকাবাসী এভাবে না রেখে আমাদের জানালে তাকে আমরা প্রতিষ্ঠানিক হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখতে পারতাম। আমরা এই স্বাস্থ্যকর্মীকে ওখান থেকে এনে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখার ব্যবস্থা করবো। অন্যদিকে এই নারী স্বাস্থ্যকর্মীকে যারা এভাবে ঝুপড়ি ঘরের ভেতর রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে আইনতভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সমকাল

২৭ এপ্রিল ২০২০

করোনায় কেরানীগঞ্জ
সুনসান গার্মেন্টপল্লিতে দীর্ঘশ্বাস
দৈনিক কোটি টাকা লোকসান

মোহাম্মদ রায়হান খান, কেরানীগঞ্জ (ঢাকা): করোনাভাইরাসের কারণে সাধারণ ছুটিতে অচল দেশের সর্ববৃহৎ গার্মেন্টপল্লি কেরানীগঞ্জের শত শত মালিক বিপুল ক্ষতির মুখে পড়েছেন। অলস বসে থাকা কয়েক লাখ শ্রমিকের বেতন দেওয়া নিয়ে দুশ্চিন্তায় সময় কাটছে তাদের। দিন-রাত একাকার করা কোলাহলের বদলে আগানগর এলাকার সনসান নিস্তব্ধতা যেন তাদের বুকে পাথরের মতো চেপে বসেছে। কাজ না থাকায় প্রতিদিন বড় অঙ্কের লোকসান গুনতে হচ্ছে সব উদ্যোক্তাকেই।

বুড়িগঙ্গা তীরের গার্মেন্টপল্লিতে দৈনিক কয়েক কোটি টাকা বেচাকেনা হতো। মুনাফাও হতো বেশ। এ কারণে এখানে তৈরি পোশাক কারখানার প্রসার ঘটেছে। করোনার এ সংকটে পরিস্থিতি এখন অন্যরকম। প্রতিদিন কোটি টাকা ক্ষতির মুখে পড়েছেন ব্যবসায়ীরা।

একাধিক গার্মেন্ট মালিক জানান, প্রতিদিন গার্মেন্টপল্লিতে কয়েক কোটি টাকা বিকিকিনি হতো। এখন সব বন্ধ রেখে ভাড়া, শ্রমিকদের বেতন ও ব্যাংক ঋণ বাবদ কোটি টাকা লোকসান হচ্ছে তাদের। বন্ধের সময় দীর্ঘ হলে ব্যাংক ঋণ নিয়ে বড় বিপদে পড়তে হবে। অনেক ব্যবসায়ীর পথে বসে পড়ার আশঙ্কাও রয়েছে। আলম টাওয়ার মার্কেটের লক্ষ্মী পোলা গার্মেন্টের মালিক মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তাকের মতো অনেকে এমন পরিস্থিতিতে ব্যাংকের সুদ কমপক্ষে ছয় মাস মওকুফ চেয়েছেন।

বুড়িগঙ্গা নদীর তীরবর্তী কেরানীগঞ্জ আগানগর গার্মেন্টপল্লিতে ছোট-বড় পাঁচ হাজার কারখানা রয়েছে। পাইকারি শো-রুম রয়েছে প্রায় ১৫ হাজার। প্রতিটি কারখানায় কমপক্ষে ৫০-১২০ জন

শ্রমিক কাজ করেন। ঈদের আগে সারাদেশের চাহিদা মেটাতে সবচেয়ে বেশি জমজমাট থাকে পুরো এলাকা। অথচ করোনার কারণে সবকিছু বন্ধ থাকায় পুরো এলাকা এখন ভূতের গলির মতো লাগছে। মালিকরা জানিয়েছেন, ব্যাপক জনসমাগম হয় বলে বর্তমান পরিস্থিতি বজায় থাকলে গার্মেন্টপল্লি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকার সম্ভবনাই বেশি। পরিস্থিতির উন্নতি হলে স্বাভাবিক কার্যক্রম চালু করা হবে বলে জানিয়েছেন কেরানীগঞ্জ গার্মেন্ট ব্যবসায়ী সমবায় সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও মুসলিম কালেকশনের মালিক মুসলিম ঢালী। তিনি বলেন, ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে অনেক বেগ পোহাতে হবে।

শনিবার সকালে কথা হয় অনেকের সঙ্গে। দি ওনম্যান গার্মেন্টের মালিক রুহুল আমীন ও আকাশ ফ্যাশনের মালিক মনির হোসেনসহ অনেকেই বলেন, এবারের ঈদ মৌসুমটা তাদের মাটি। প্রতিদিন এখানে লাখ লাখ টাকা লেনদেন হতো। এখন সব বন্ধ থাকায় বড় অঙ্কের লোকসান গুনতে হচ্ছে সবার। তবে সবারই বড় ভয় ব্যাংক ঋণ নিয়ে। ঋণের সুদ কিছু সময়ের জন্য মওকুফ করে হাজার হাজার শ্রমিকের জীবন-জীবিকা বাঁচাতে সহায়তার দাবি জানান তারা।

কেরানীগঞ্জ গার্মেন্ট ব্যবসায়ী ও সমবায় সমিতির সভাপতি স্বাধীন শেখ বলেন, ঈদ সামনে রেখে গার্মেন্ট ব্যবসায়ীরা চরমভাবে বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছেন। ঈদের পোশাকের কাজ নেই বলে প্রতিদিন কোটি টাকা লোকসান গুনতে হচ্ছে। বছরের আয়ের বড় একটা অংশ আসে এ সময়ে। অথচ কারখানা ভাড়া ও শ্রমিকদের বেতন দেওয়া নিয়ে তারা দুশিন্তার মধ্যে রয়েছেন তারা।

কেরানীগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক শাহীন আহমেদ বলেন, এখনাকার গার্মেন্টপল্লিতে হাজার হাজার শ্রমিক কাজ করেন। সারাদেশের জেলা ও উপজেলা শহরের ব্যবসায়ীরা পোশাক কিনতে এখানে আসেন। ঈদের মৌসুমে থাকে জমজমাট। অথচ করোনার কারণে জনবহুল এলাকা বলে পুরোপুরি কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। এতে ব্যবসায়ীরা চরম ক্ষতির মুখে পড়েছেন। তাদের সমস্যা নিয়ে সরকারি পর্যায়ে বিশেষ করে শ্রমিকদের বেতন ও ব্যাংক ঋণের বিষয়টি নিয়ে ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে আলোচনা করা হবে।

সমকাল

২৭ এপ্রিল ২০২০

বিবিসাহেবদের পক্ষে লাইনে গৃহকর্মীরা!

কিশোরগঞ্জে টিসিবিতে বেচাকেনা

সাইফুল হক মোল্লা দুলু, কিশোরগঞ্জ: কিশোরগঞ্জ শহরের টিসিবির ভ্রাম্যমাণ দোকানগুলোতে ক্রমেই বাড়ছে ভিড়, কমছে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার প্রবণতা। ভিড় বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ- শহরের মধ্যবিত্ত ও নি মধ্যবিত্ত পরিবারের সাহেব বিবিরা তাদের গৃহকর্মী নারী কিংবা বালককে টিসিবির মাল কিনে আনতে পাঠাচ্ছেন। রোজা উপলক্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিকে সামাল দিতে এই পথ বেছে নিয়েছেন তারা।

টিসিবির দোকানগুলোতে এখন প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৩৫ টাকা, চিনি ৫০ টাকা, ডাল ৫০ টাকা, খেজুর ১২০ টাকা, পাঁচ লিটারের সয়াবিন তেল ৪০০ টাকা এবং ছোলা ৬০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। অথচ বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৫৫ টাকা, ডাল ৭০-৭৫ টাকা, চিনি ৭০ টাকা, খেজুর ১৮০ টাকা, ছোলা ৭৫ টাকা ও পাঁচ লিটারের সয়াবিন তেল ৫২০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। দামের বিশাল তারতম্যের কারণে টিসিবির দোকানগুলোতে সকাল থেকেই ন্যায্যমূল্যে মাল কিনতে মানুষের ভিড় বাড়ছে। করোনা বিপর্যয়ের শিকার মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর হাতে টাকাপয়সা না থাকায় তারাও এখন টিসিবির পণ্য কিনছেন। তবে চক্ষুলজ্জার কারণে নিজেরা না গিয়ে পাঠাচ্ছেন গৃহকর্মীদের।

গত শনিবার সরেজমিন দেখা যায়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে টিসিবির ডিলার সুরুজ এন্টারপ্রাইজের দোকানের সামনে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন কলাপাড়ার রহিমার মা। প্রতি সপ্তাহের দুই দিনই তাকে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। প্রতি সপ্তাহে তার কী পরিমাণ পণ্য লাগে, তা জানতে চাইলে তিনি সমকালকে বলেন, 'বিবিসাবের বাসার লাইগ্যা (জন্য) মাল নিতে আইছি। বিবি সাবতো লাইনে খাড়াইতে (দাঁড়াতে) পারেন না। ছোডো (ছোট) শহর। সবাই চিন্যালবো (চিনে ফেলবে)। মানইজ্জত আছে না? তাই বিবিসাব তার সংসারের লাইগ্যা আমারে লাইনে পাঠাইছে।'

রহিমার মা জানান, বিবিসাহেবের স্বামী একটি মাদ্রাসায় চাকরি করেন। তিন ছেলেমেয়ে। তাদের তেমন কোনো অভাব-অনটন ছিল না। করোনার কারণে তাদের সংসারে টানাটানি শুরু হয়েছে। তাই তারা ন্যায্যমূল্যে টিসিবির পণ্য কিনতে তাকে পাঠিয়েছেন।

রহিমার মা, মনোয়ারার মাসহ অন্তত ২০ জন গৃহকর্মী জানান, তাদের মধ্যে কেউ কেউ মালিকের বাসায় সেহরি ও ইফতার করেন। কেউ কেউ মালপত্র কিনে দেওয়ার বিনিময়ে তাদের পরার জন্য পুরোনো কাপড় দেন। কয়েকজন অবশ্য বলেন, 'হ্যাগরে পরিবারের কথা চিন্তা কইর ্যাই খাড়াইয়া আছি। '

জেলা প্রশাসক কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, কিশোরগঞ্জ পৌর এলাকায় তিনজন টিসিবি ডিলারকে শুক্রবার বাদ দিয়ে প্রতিদিন ১৫ হাজার কেজি চিনি, ৫০০০ কেজি ডাল, ২০০ কেজি

খেজুর, ১২০০ কেজি বুট, ৯ হাজার লিটার তেল, ৯ হাজার লিটার চিনিসহ পেঁয়াজ চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দ দেওয়া হয়। প্রচুর চাহিদা এবং ভিড়ের কারণে কিশোরগঞ্জ জেলা শহরে তিনজন ডিলার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আরও তিনজন ডিলার বাড়ানো গেলে তাদের ওপর চাপ কমবে। এ প্রসঙ্গে সচেতন নাগরিক কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট মায়া ভৌমিক বলেন, জেলা শহর ও আশপাশের এলাকায় হাজার হাজার মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবী দরিদ্র মানুষের কথা বিবেচনায় নিয়ে ডিলার প্রতি বরাদ্দ দ্বিগুণ করা উচিত।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৭ এপ্রিল, ২০২০

তিন মাসের বেতন বকেয়া

কুষ্টিয়ায় চিনিকলের শ্রমিক-কর্মচারীরা চরম দুর্ভোগে

টানা তিন মাসের বেতন না পাওয়ায় কুষ্টিয়ায় চিনিকলের এক হাজার শ্রমিক-কর্মচারী পড়েছে চরম দুর্ভোগে। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসের বেতন এখনো তারা পাননি। এছাড়া ইতিমধ্যে এপ্রিল মাসের বেতনও পাওনা হয়ে গেছে। ফলে শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন বাবদ প্রায় ছয় কোটি টাকা বকেয়া পড়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কুষ্টিয়ায় কৃষিভিত্তিক একমাত্র লোকসানি চিনিকলটি কোনমতে টিকে আছে। ভরা মৌসুমে এ মিলে চিনির কাঁচামাল আখের যোগান কম থাকায় প্রতি বছর উৎপাদন কম হচ্ছে। ক্রমাগত উৎপাদন হ্রাসসহ অন্যান্য নানাবিধ কারণে লোকসান গুণতে গুনতে মিলটি এখন রুগ্ন শিল্পে পরিণত হয়েছে। এদিকে টানা তিন মাস যাবত বেতন বন্ধ থাকায় চিনিকলের এক হাজারের বেশি শ্রমিক-কর্মচারী মানবেতর জীবন-যাপন করছেন। এছাড়া তাদের বকেয়া বেতন প্রাপ্তিতে অনিশ্চয়তা এখনো কাটেনি।

বকেয়া বেতনের দাবিতে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে মিলের শ্রমিক-কর্মচারীরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপিও দিয়েছে। শিগগিরই বেতন প্রদান করা না হলে শ্রমিক-কর্মচারীরা আন্দোলন কর্মসূচিতে যেতে পারে বলেও শ্রমিক নেতারা জানান।

চিনিকল কর্তৃপক্ষ শ্রমিক-কর্মচারীদের বকেয়া বেতন পরিশোধে উদ্যোগ গ্রহণের কথা জানালেও এখনো বেতন দেয়া হয়নি। একটানা তিন মাসের বকেয়া ছাড়াও চলতি এপ্রিল মাসের বেতনেরও কোন খবর নেই। ফলে পুরো চার মাসের বেতন প্রদান নিয়ে চলছে অনিশ্চয়তা। এছাড়া বৈশ্বিক মহামারি করোনা দুর্যোগেও শ্রমিক-কর্মচারীরা পাননি সরকারি কোন সহায়তা। ফলে পরিবার-পরিজন নিয়ে তাদের দিন কাটছে নিদারুণ কষ্টে বলে শ্রমিকরা জানান।

এদিকে শ্রমিক-কর্মচারীদের বকেয়া বেতন ছাড়াও আখ চাষিদের বকেয়া ১১ কোটি টাকা ও মিলের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের অবসর ভাতাবাবদ পাওয়া ১২ কোটি টাকা দেয়া হচ্ছে বলেও খোঁজ নিয়ে জানা গেছে।

বকেয়া বেতনের দাবির বিষয়ে শ্রমিক-কর্মচারীরা প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। অতি সম্প্রতি কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করে এ বিষয়ে শ্রমিক-কর্মচারীরা স্মারকলিপি প্রদান করেন। স্মারকলিপিতে কুষ্টিয়ার একমাত্র কৃষিভিত্তিক এ শিল্প প্রতিষ্ঠানটি রক্ষাসহ শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন প্রদানে প্রধানমন্ত্রীর আশু হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়।

চিনিকল শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মো. আনিসুর রহমান জানান, বেতন পেয়ে পেয়ে শ্রমিক-কর্মচারীরা খেয়ে-না খেয়ে দিন কাটাচ্ছেন। বেতন প্রাপ্তির জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীর আশু হস্তক্ষেপ দাবি করেন।

কুষ্টিয়া চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক গোলাম সরওয়ার মুর্শেদ জানান, বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে। এছাড়া মিলে ২০ কোটি টাকার মূল্যের ৩৪'শ মেট্রিক টন উৎপাদিত চিনি অবিক্রিত থাকায় বেতন প্রদানে সংকট সৃষ্টি হয়েছে।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

২৭ এপ্রিল ২০২০

খাদ্যাভাবে ছিন্নমূল বিধবা ও শ্রমিকরা

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি : করোনাভাইরাস প্রতিরোধে প্রায় একমাস যাবত দেশে অঘোষিত লকডাউন চলছে। কর্মহীন হয়ে পড়েছে সবাই। ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। রাস্তায় জনসমাগম কমেছে। কর্মহীন মানুষগুলো ঘরে বন্দী রয়েছে। আয় উপার্জন সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। এ অবস্থায় চরম দুর্বিষহ জীবনযাপন করছেন সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে ভিক্ষুক-ছিন্নমূল, বিধবা ও দরিদ্র শ্রমিকরা সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে পড়েছে। পরিবার পরিজন নিয়ে কষ্টে জীবনপান করছে। কোনো কোনো পরিবার একবেলা খেয়ে জীবনযাপন করছে। বেলকুচি-চৌহালীতে ত্রাণ নিয়ে দ্বারে দ্বারে লতিফ বিশ^াস : এদিকে বেলকুচি-চৌহালী আসনের সাবেক সংসদ সদস্য, সাবেক মৎস্য মন্ত্রী আব্দুল লতিফ বিশ^াস ত্রাণ নিয়ে এলাকায় এলাকায় ছুটে বেড়াচ্ছেন। নিজ হাতে তুলে দিচ্ছেন ত্রাণসামগ্রী। স্বজনদের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ৭২ বছর বয়সী এই মানবপ্রেমী যোদ্ধা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিদিন বেলকুচি-চৌহালীর বিভিন্ন গ্রামে ছুটে যাচ্ছেন। কর্মহীন মানুষকে নানাভাবে সহায়তা করছেন। উদ্দেশে একটাই বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা বুকে ধারণ করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মানবসেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখা। সাবেক মন্ত্রী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল

লতিফ বিশ^াস এ পর্যন্ত ৩০ হাজার লিফলেট ও ১২ হাজার সাবান ও মাস্ক বিতরণ করেন। ১১ এপ্রিল থেকে জেলা পরিষদ ও নিজ উদ্যোগে চাল বিতরণ শুরু করেন। এর পর ক্রমান্বয়ে বেলকুচি পৌরসভা, বেলকুচি সদর ইউনিয়নসহ বিভিন্ন এলাকা কর্মহীন মানুষের মধ্যে জেলা পরিষদ, রেডক্রিসেন্ট ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে নিজ হাতে খাদ্য সহায়তা প্রদান করেন।

এ ছাড়াও প্রতিদিন নিজ বাড়িতে যেসব মানুষ সহায়তার জন্য আসেন প্রত্যেককে নিজের অর্থায়নে ৫ কেজি করে চাল প্রদান করে যাচ্ছেন।

বণিকবার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

এপ্রিল ২৮, ২০২০

পরিবহন শ্রমিকদের অভিযোগ

ত্রাণের তালিকায় নাম ওঠাতেই হাজার টাকা

হবিগঞ্জে পরিবহন শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় চার হাজার। এর মধ্যে জেলা প্রশাসন থেকে ত্রাণ সহায় তা পেয়েছেন মাত্র ৩০০ শ্রমিক। বাকিরা মানবেতর জীবনযাপন করছেন। ত্রাণ পেতে মরিয়া শ্র মিকরা ঘুরছেন শ্রমিক নেতাদের দ্বারে দ্বারে। শ্রমিকদের ত্রাণের তালিকায় নাম উঠিয়ে দেয়ার ক থা বলে টাকা আদায়ের অভিযোগও রয়েছে স্থানীয় শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে।

একই ধরনের অভিযোগ উঠেছে চট্টগ্রামের পরিবহন শ্রমিক নেতাদের একটি অংশের বিরুদ্ধে। সাধারণ শ্রমিকদের অভিযোগ, কয়েকদিন আগে পরিবহন শ্রমিকদের একটি পক্ষ ত্রাণ দেয়ার ক থা বলে ১০০ টাকা করে নেয় তাদের কাছ থেকে। কিন্তু এখনো ত্রাণ পাননি তারা। পরে সড়ক অ বরোধ করে বিক্ষোভও করেছেন ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা।

দেশে গণপরিবহন বন্ধ এক মাস ধরে। কর্মহীন প্রায় ৫০ লাখ শ্রমিক। প্রকট হচ্ছে খাদ্য সংকট। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রতিটি জেলার পরিবহন শ্রমিকদের সহায়তা করা হচ্ছে। সেটাও প রিবহন শ্রমিক সংগঠনগুলোর দেয়া তালিকা ধরে। অভিযোগ উঠেছে, ত্রাণের তালিকায় নাম ওঠা নোর কথা বলে শ্রমিকদের কাছ থেকে ৫০০ থেকে ১ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করছেন স্থানীয় অনেক শ্রমিক সংগঠনের নেতাকর্মী। পরিবহন শ্রমিকদের পাশাপাশি এ রকম একটি অভিযোগ এসেছে শ্রমিকদের শীর্ষ সংগঠন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের কাছ থেকেও।

শ্রমিক ফেডারেশনের নেতাদের অভিযোগ, বিভিন্ন সংগঠনের নামে পরিবহন শ্রমিকদের ত্রাণ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে দেয়ার কথা বলছেন কিছু সুযোগসন্ধানী ব্যক্তি। এ সময় তারা শ্রমিকদে র ড্রাইভিং লাইসেন্স ও জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি সংগ্রহ করছেন। পাশাপাশি শ্রমিকভেদে ৫০০ থেকে ১ হাজার টাকা পর্যন্ত সংগ্রহ করছেন এ অসাধু চক্রের সদস্যরা। পুরো প্রক্রিয়াটিকে প্রতা

রণামূলক উল্লেখ করে চক্রটিকে খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার দাবি জানিয়েছেন পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের নেতারা।

বিষয়টি সম্পর্কে বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও সাবেক নৌ-পরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খান বণিক বার্তাকে বলেন, এ দুর্যোগে কর্মহীন শ্রমিকদের দুর্দশার সুযোগ নিয়ে যারা পরিবহন শ্রমিকদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন ও তাদের সঙ্গে প্রতারণার মাধ্যমে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন, তাদের অবিলম্বে খুঁজে বের করতে হবে।

এ সময় জেলা প্রশাসকদের শুধু রেজিস্টার্ড শ্রমিক ইউনিয়নের দেয়া তালিকা ধরে শ্রমিকদের ত্রাণ সহায়তা দেয়ার আহ্বান জানান তিনি।

তবে ফেডারেশনের এ শীর্ষ নেতা যখন ত্রাণের তালিকায় নাম তুলে দেয়ার কথা বলে প্রতারণার অভিযোগ তুলছেন, তখন পরিবহন শ্রমিকদের অনেকেই সংগঠনটির শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের টাকার ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ফেডারেশনের শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে প্রায় ১০০ কোটি টাকা জমা আছে। পরিবহন শ্রমিকরা যখন 'অনাহারে-
অর্ধাহারে' দিন পার করছেন, তখন সংগঠনটির নেতারা বলছেন, নিয়োগপত্র না থাকায় কল্যাণ ফান্ডের টাকা এ দুর্যোগকালে শ্রমিকদের দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। এর কারণ হিসেবে 'আইনি জটিলতার' কথা বলছেন তারা।

বিষয়টি নিয়ে পরিবহন শ্রমিকদের একটি অংশের মধ্যে অসন্তোষও তৈরি হয়েছে। তবে ঘটনাটিকে ফেডারেশনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখছেন সংগঠনটির শীর্ষ নেতা শাজাহান খান। তিনি এ বিষয়ে বলেন, ইউনিয়নের চাঁদায় গঠিত তহবিলের অর্থ দিয়ে সংগঠন পরিচালনার পাশাপাশি শ্রমিকের মৃত্যু, পারিবারিক অসচ্ছলতা, দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ বা শ্রমিকদের সন্তানদের লেখাপড়ার পেছনে ব্যয় করা হয়। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে দেশের ৫০ লাখের বেশি পরিবহন শ্রমিক অসহায় অবস্থায় রয়েছেন। এ বিপুল পরিমাণ শ্রমিককে আর্থিক সহায়তা দেয়ার মতো সামর্থ্য বাংলাদেশের কোনো সংগঠনের নেই।

সবকিছু জেনে-
বুঝেও একটা গোষ্ঠী পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের বর্তমান নেতাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে বলে মনে করছেন তিনি।

পাটকল শ্রমিকদের মজুরি পরিশোধে ১১৬ কোটি টাকা বরাদ্দ

পাটকল শ্রমিকদের মজুরি পরিশোধে ১১৬ কোটি টাকার বরাদ্দ দিয়েছে সরকার। গতকাল বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অওতাধীন বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি) পরিচালিত পাটকল শ্রমিকদের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় এ অর্থ বরাদ্দ করে। বরাদ্দকৃত এ অর্থ শ্রমিকদের নিজ নিজ অ্যাকাউন্টে চেকের মাধ্যমে দেয়া হবে।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অর্থ মন্ত্রণালয় থোক বরাদ্দ হিসেবে ১১৬ কোটি টাকা দিয়েছে। এটিকে 'পরিচালন ঋণ' বা 'অপারেশন লোন' হিসেবে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বিজেএমসি শ্রমিক দের প্রত্যেকের নিজস্ব ব্যাংক হিসাবে এ টাকা পরিশোধ করতে হবে।

গত রোববার স্বাক্ষরিত চিঠিতে অর্থ মন্ত্রণালয় জানায়, আগামী ২০ বছরে (পাঁচ বছরের গ্রেস পিরি য়ডসহ) ৫ শতাংশ সুদে ষাণ্মাসিক কিস্তিতে এ অর্থ পরিশোধ করতে হবে। আর এজন্য অর্থ বিভা গের সঙ্গে বিজেএমসিকে একটি ঋণচুক্তি সম্পাদন করতে হবে।

চিঠিতে বিশেষভাবে বলা হয়েছে, বরাদ্দ দেয়া অর্থ শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি খাত ছাড়া অন্য কো নো খাতে ব্যয় করা যাবে না। বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ে সরকারের বিদ্যমান বিধিবিধান অনুসরণ কর তে হবে। বিধিবহির্ভূতভাবে কোনো অর্থ পরিশোধ করা হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা দায়ী থাকবেন।

কালের কণ্ঠ

২৯ এপ্রিল, ২০২০

নীলফামারী

ট্রাকে ত্রিপল টানিয়ে ফেরা ৪৪ শ্রমিক আটক

নীলফামারী প্রতিনিধি : গাজীপুর থেকে পণ্যবাহী ট্রাকে করে নীলফামারীতে ফেরত আসা ৪৪ ইটভাটা শ্রমিককে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার সকালে জেলার সৈয়দপুর-পার্বতীপুর সড়কের চৌমোহনী চেকপোস্টে তাদের আটক করা হয়। পরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে পাঠানো হয়।

পুলিশ জানায়, শ্রমিকরা একটি পণ্যবাহী ট্রাকে ত্রিপল দিয়ে ঢাকা অবস্থায় সেখানে পৌঁছে। গাজীপুর থেকে পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ ও পলাশবাড়ী হয়ে তারা রংপুরের সঠিবাড়ী পর্যন্ত আসে। এরপর সঠিবাড়ী থেকে মহাসড়ক এড়িয়ে দিনাজপুরের বিরামপুর, ফুলবাড়ী ও পার্বতীপুর হয়ে সৈয়দপুরে ঢোকার চেষ্টাকালে পুলিশের ওই চেকপোস্টে আটক হয়। পরে সৈয়দপুর থানা পুলিশ নীলফামারী সদর থানা পুলিশে হস্তান্তর করলে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিশ্চিত করে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে পাঠানো হয়।

এ বিষয়ে সৈয়দপুর থানার ওসি মো. আবুল হাসানাত বলেন, সকাল ৯টার দিকে সৈয়দপুরের প্রবেশপথে চৌমোহনী চেকপোস্টে একটি মালবাহী ট্রাকে ৪৪ জন ভাটা শ্রমিককে আটক করা হয়। শ্রমিকদের ত্রিপল দিয়ে ঢেকে আনা হচ্ছিল।

নীলফামারী সদর থানার ওসি মো. মমিনুল ইসলাম বলেন, সৈয়দপুর থানা পুলিশ যে ৪৪ জনকে আটক করেছে, তাদের মধ্যে জেলা সদরের ২৮ জন, জলঢাকা উপজেলার একজন, সৈয়দপুর উপজেলার দুজন, দিনাজপুরের খানসামা উপজেলার ১১ জন এবং বীরগঞ্জের দুজন রয়েছে। আটকদের জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের সহায়তায় স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। তাদের কারো শরীরেই উচ্চ তাপমাত্রা পাওয়া যায়নি।

সমকাল

২৯ এপ্রিল ২০২০

বাংলাদেশের পোশাক খাত ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের সহায়তা দিতে ব্রিটিশ অর্থমন্ত্রী রিশি সুনাককে চিঠি দিয়েছেন দেশটির বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এমপি রুশনারা আলী।

গত ২৩ এপ্রিল পাঠানো 'বৈশ্বিক বাণিজ্যের ওপর করোনাভাইরাসের প্রভাব' শীর্ষক ওই চিঠিতে রুশনারা আলী লিখেছেন, বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের সহায়তায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে। এই খাতের শ্রমিকদের সহায়তা করা আন্তর্জাতিক পোশাক ব্র্যান্ডগুলোর নৈতিক দায়িত্ব। খবর ইউএনবির।চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, 'করোনাভাইরাস মহামারি বিশ্বকে পাল্টে দেবে। লাখ লাখ মানুষের জীবন ঝুঁকিতে পড়বে। এই সংকটের কারণে বিশ্ববাজারে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতির ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব এক নজিরবিহীন গতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে।'চিঠিতে ব্রিটিশ অর্থমন্ত্রীকে রুশনারা লেখেন, 'আপনি জাতিসংঘ মহাসচিবের সঙ্গে একমত হবেন যে, কভিড-১৯ পুরো মানবতারজন্যই এক ভীতিকর বিপদ। সুতরাং, পুরো মানবতাকে এর বিরুদ্ধে লড়তে হবে। এ ভাইরাস আন্তর্জাতিক সীমান্তের পরোয়া করে না। তাই সবচেয়ে দুর্বল দেশগুলোর সুরক্ষায় কাজ করতে হবে সবচেয়ে শক্তিশালী দেশগুলোকে। এটিই আমাদের অভিন্ন স্বার্থ। আমাদের বৈশ্বিকভাবে সক্রিয় হতে হবে, যেন আমরা নিজেরা সুরক্ষিত থাকতে পারি।'
চিঠিতে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের প্রসঙ্গ তুলে এই এমপি বলেন, 'চীনের পর বিশ্বের দ্বিতীয়

বৃহত্তম তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ বাংলাদেশ। দেশটির রপ্তানির ৮০ শতাংশই এই খাত থেকে হয়। 'ফোর্স ম্যাজিউর' বিধান প্রয়োগ করে ইতোমধ্যে পশ্চিমা কোম্পানিগুলো বাংলাদেশের কারখানা থেকে ক্রয়াদেশ বাতিল করেছে। এখন পর্যন্ত ৩৭০ কোটি ডলার মূল্যের ক্রয়াদেশ বাতিল হয়েছে। এর মধ্যে ২৪০ কোটি পাউন্ড বা ৩০০ কোটি ডলারের ক্রয়াদেশ বাতিল করেছে ব্রিটিশ খুচরা বিক্রেতা কোম্পানিগুলো। এর ফলে শ্রমিকরা তাদের একমাত্র আয়ের উৎসও হারাচ্ছে। ক্ষুধার ঝুঁকিতে পড়ছে তারা ও তাদের পরিবার।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

২৯ এপ্রিল, ২০২০

শ্যামপুর সুগার মিলের ৬০০ শ্রমিকের কষ্টে দিন কাটছে
চার মাস ধরে বেতন বন্ধ, মিলছে না কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, রংপুর : : একদিকে করোনার কারণে ঘরবন্দী সময় কাটাতে হচ্ছে। অপরদিকে চার মাস ধরে বেতন না পেয়ে কষ্টে আছেন রংপুরের শ্যামপুর সুগার মিলের ৬০০ শ্রমিক-কর্মচারী। শ্রমিকদের বেতন বকেয়া রয়েছে প্রায় ৪ কোটি টাকা। আর আখচাষিদের পাওনা দুই কোটি ৭৬ লাখ। বিক্ষোভ-মানববন্ধন হলেও শ্রমিক ও আখচাষিদের বকেয়া পরিশোধের কোনো উদ্যোগ নেই মিল কর্তৃপক্ষের। শ্রমিক ও আখচাষি সূত্রে জানা গেছে, রংপুর জেলার একমাত্র ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান শ্যামপুর সুগার মিল লিমিটেডের প্রায় ৬৫০ জন শ্রমিক চার মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। আবার চলমান করোনা পরিস্থিতিতে ঘর থেকে বের হতেও পারছেন না। অর্থাভাবে তাদের অনেকে পরিবার-পরিজন নিয়ে দুর্বিষহ দিন কাটাচ্ছেন। টাকার জন্য শ্রমিকরা প্রায় প্রতিদিন মিল কর্তৃপক্ষের কাছে ধরনা দিয়ে ফিরছেন খালি হাতে। শ্যামপুর সুগার মিল শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক বুলু আমীন বলেন, টাকার অভাবে শ্রমিকরা মানবেতর জীবনযাপন করছেন। বিষয়টি মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে বার বার বলার পরও তিনি আমলে নিচ্ছেন না। চিনি বিক্রি না হওয়ার অজুহাতে বেতন দেওয়া হচ্ছে না। আখচাষি খলিল মিয়া জানান, চিনি বিক্রির অজুহাতে গত বছরের আখ বিক্রির টাকা এখনো কৃষকদের দেওয়া হয়নি। শ্যামপুর সুগার মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সামসুজ্জামান বলেন, করোনা পরিস্থিতির কারণে চিনি বিক্রি প্রায় বন্ধ। এ কারণে শ্রমিকদের বেতন দিতে বিলম্ব হচ্ছে। শ্রমিকদের বিষয়টি বিবেচনা করতে মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন
২৯ এপ্রিল, ২০২০

সোনামসজিদ বন্দরে স্থবিরতা বেকার তিন হাজার শ্রমিক

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি : করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্থলবন্দর সোনামসজিদ দিয়ে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ থাকায় চলছে স্থবিরতা। বেকার হয়ে পড়েছেন বন্দরে কর্মরত তিন হাজার শ্রমিক। পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন কাটাছে তাদের। বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন মাসে লাখ লাখ টাকা চাঁদা আদায় করলেও দুর্যোগের সময় সেই সব সংগঠন কোনো সহায়তা না করায় অসন্তোষ দেখা দিয়েছে শ্রমিকদের মধ্যে। সরকারিসহ পানামা পোর্ট লিংক লিমিটেড থেকে কিছু খাদ্যসামগ্রী পেলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। মহামারী করোনাভাইরাসের কারণে প্রতিবেশী দেশ ভারত সরকার লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানোয় স্থলবন্দর দিয়ে শিগগিরই আমদানি-রপ্তানি চালুর সম্ভাবনা দেখছেন না শ্রমিকরা। এতে ব্যবসায়ীরা যেমন ক্ষতির মুখে পড়েছেন তেমনি স্থলবন্দরের শ্রমিকরাও হয়ে পড়েছেন অসহায়। এ অবস্থা চলতে থাকলে বন্দর থেকে সরকারের কয়েক কোটি টাকার রাজস্ব হাতছাড়া হবে বলে জানিয়েছে বন্দর সংশ্লিষ্ট সূত্র। জানা যায়, গত ২২ মার্চ থেকে বাংলাদেশ-ভারত আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য বন্ধ রয়েছে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, কবে নাগাদ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে তা নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। তবে ভারতে লকডাউন উঠে গেলে স্থলবন্দর দিয়ে আবার আমদানি-রপ্তানি চালু হবে বলে জানান তারা। এ স্থলবন্দর দিয়ে রমজান ও ঈদের সময় মসলাসহ নানা পণ্য আমদানি করা হয়। এবার করোনার থাবায় সবকিছু এলোমেলো। সামনে ঈদ, দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পণ্য আমদানি করে বাজার সহনশীল পর্যায়ে আসবে বলে ধারণা করছেন আমদানি-রপ্তানি সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা। সোনামসজিদ বন্দরের শ্রমিক নেতা আমিনুল ইসলাম বলেন, এ বন্দর থেকে তিন শতাধিক ট্রাক পাথর, ভুট্টা, ছাই, পিয়াজ, ফল, মসলা বিভিন্ন জেলায় যায়। এখানে প্রায় তিন হাজার শ্রমিক কাজ করেন। বন্দরের কার্যক্রম বন্ধ থাকায় তারা বেকার হয়ে পড়েছেন। সোনামসজিদ বন্দর সিএন্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশীদ বলেন, এ অবস্থা চলতে থাকলে ব্যবসায়ীরা যেমন চরম ক্ষতির মধ্যে পড়বেন, পাশাপাশি বন্দর থেকে সরকার কয়েক কোটি টাকার রাজস্ব হারাবে। বন্দরে কর্মরত শ্রমিক জেম আলী বলেন, বন্দর চালু থাকার সময় তিন শতাধিক গাড়ি থেকে শ্রমিক নেতারা ১০ চাকার গাড়িপ্রতি ৫৫০ ও ছয় চাকার গাড়ি থেকে ৩৫০ টাকা করে তোলে। বর্তমানে শ্রমিকরা পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করলেও নেতাদের পাত্তা নেই। শিবগঞ্জ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা আরিফুল ইসলাম বলেন, করোনা পরিস্থিতিতে সোনামসজিদ বন্দরের শ্রমিকদের মাধ্যে এক হাজার জনকে ১০ কেজি করে চাল দেওয়া হয়েছে।

The Financial Express

April 30, 2020

'Operational manual' a must for RMG, textile companies to contain Covid-19

BAPLC president tells FE

Mohammad Mufazzal

The RMG (ready-made garment) and textile companies should maintain 'operational manual' to contain the spread of COVID-19 among workers ahead of full resumption of production in the companies.

However, the companies' productions right now should also be resumed in a limited scale avoiding the workers' gathering amid the alarming spread of COVID-19, according to a leading entrepreneur.

"The listed RMG and textile companies having orders, placed by buyers, can resume operations in a limited scale. In that case, the factories should have an operational manual to save workers from the deadly infection of COVID-19", Azam J. Chowdhury, president of Bangladesh Association of Publicly Listed Companies (BAPLC), told the FE on Tuesday.

Mr. Chowdhury said it will not be wise if the owners of listed textile and RMG companies call all workers at a time to resume operations.

"The scope of spreading COVID-19 among workers will be intensified if their safety is not prioritised while resuming operations at RMG and textile companies," the BAPLC president said.

On April 25, the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), in a letter to the labour secretary, called for gradual reopening of the garment factories in industrial zones using a 30 per cent workforce in the first phase.

The BAPLC president said following the government's order, the energy companies are continuing operations with limited manpower maintaining social distances.

"But the nature of operations at RMG and textile companies is different from energy and power sector. That's why, the owners of RMG and textile units should ensure safe transports so that workers can reach the workplaces maintaining social distancing," the BAPLC president said.

Contacted, the officials of some listed textile companies said they have already resumed operations.

Some other companies said they have not yet resumed productions due to various reasons including limited scope of accommodation for workers amid ongoing lockdown enforced to contain spread of COVID-19. These companies also said they would resume operations soon.

The officials of Envoy Textiles said they reopened factory as they have the scope of ensuring social distances for their workers.

"Textile companies have huge spaces in their compounds. Workers are able to work maintaining sufficient distances at such type of factories," said Abdus Salam Murshedy, MP, managing director of Envoy Textiles.

He said their workers are also living in the factory premises in compliance with formalities required to contain the spread of COVID-19.

Asked, the officials of Regent Textile Mills said they have resumed operations amid ongoing public holiday.

"We have paid workers' salary for March. We are working to avail the facility announced by the government under the stimulus package," said an official of Regent Textile Mills.

Sohrab Ali, company secretary at Pacific Denims, said presently their company remained closed following the public holiday announced by the government to disperse public gathering.

"We have paid our workers' salary for March. We have no accommodation for workers who can stay near the workplace maintaining specific distances. That's why, we have not yet opened our factory," Mr. Ali said.

Asked, the officials of some listed companies said they have paid workers' salary for March and working to avail the facility of stimulus package announced by the government.

Corporate offices of many listed textile companies were found closed as no one received phone, while the telephone operators were found only at some other offices.

Contacted, the officials of Desh Garments and Esquire Knit & Composite said their factories still remain closed.

Textile sector is the largest one in terms of the number of listed companies. Presently, there are 56 companies listed under the sector of textile. Insurance sector is the second largest sector having 47 listed companies.

The Daily Star

April 30, 2020

Bangladesh to face one of the highest decline in working hours: ILO

Star Business Report

Bangladesh is among the countries that are forecast to face the highest decline in working hours in the first half of 2019 as the raging novel coronavirus continues to put economies on lockdown and factories closed, the International Labour Organisation (ILO) said yesterday.

The estimated hours lost for the lower-middle-income countries, which include Bangladesh, were 1.9 per cent in the first quarter of 2020 compared with the pre-crisis baseline.

The loss rose to 12.5 per cent in the second quarter, according to the 'ILO Monitor third edition: COVID-19 and the world of work', which was released yesterday.

Low-income countries are expected to lose 8.8 per cent in the working hours compared with 1.6 per cent in the first quarter, the upper-middle income countries 8.7 per cent working hours, up from 8.6 per cent in the first quarter, and the high-income countries 11.6 percent of the working hours, which is way higher than 1.6 per cent in the first quarter.

"The crisis is causing an unprecedented reduction in economic activity and working time," the ILO said.

Bangladesh has been enforcing lockdown since March 26, two weeks after it reported the country's maiden coronavirus infections, shutting factories and industries, suspending transport movement, closing offices and banning gatherings, as part of its measures aimed at flattening the curve on deadly virus.

The measures left most of the workers unemployed.

The continued sharp decline in working hours globally due to the COVID-19 outbreak means that 1.6 billion workers in the informal economy -- that is nearly half of the global workforce -- stand in immediate danger of having their livelihoods destroyed, the ILO said.

The drop in working hours in the second quarter of 2020 is expected to be significantly worse than previously estimated.

Worldwide, more than 436 million enterprises face high risks of serious disruption. These enterprises are operating in the hardest-hit economic sectors, including some

232 million in wholesale and retail, 111 million in manufacturing, 51 million in accommodation and food services, and 42 million in real estate and other business activities.

The ILO calls for urgent, targeted and flexible measures to support workers and businesses, particularly smaller enterprises, those in the informal economy and others who are vulnerable.

"For millions of workers, no income means no food, no security and no future. Millions of businesses around the world are barely breathing. They have no savings or access to credit. These are the real faces of the world of work. If we don't help them now, they will simply perish," said ILO Director-General Guy Ryder in a press release.

Measures for economic reactivation should follow a job-rich approach, backed by stronger employment policies and institutions, better-resourced and comprehensive social protection systems, the ILO said.

International co-ordination on stimulus packages and debt relief measures will also be critical to making recovery effective and sustainable. International labour standards, which already enjoy tripartite consensus, can provide a framework.

কালের কণ্ঠ

এপ্রিল ৩০, ২০২০

সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ২৩০ কোটি টাকা দিল ইউরোপীয় ইউনিয়ন

কূটনৈতিক প্রতিবেদক

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) বাংলাদেশ সরকারকে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সংস্কারকে সহযোগিতার অংশ হিসেবে দুই কোটি ৪০ লাখ ইউরো (২৩০ কোটি টাকা) মঞ্জুরি সহায়তা দিয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ওই টাকা পাঠিয়েছে ইইউ।

ঢাকায় ইইউ ডেলিগেশন জানায়, ২০১৯ সালের জুন মাসে স্বাক্ষরিত বাংলাদেশে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা

কৌশলে ইইউ'র বাজেট সহায়তার প্রথম কিস্তি এটি। এই মঞ্জুরি সহায়তার মাধ্যমে ইইউ দারিদ্র ও অতি বৈষম্য দূরীকরণ ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো পূরণে বাংলাদেশ সরকারের অঙ্গীকারগুলোর স্বীকৃতি ও সমর্থন দিচ্ছে।

বাংলাদেশে ইইউর রাষ্ট্রদূত রেঞ্চে টিয়েরিংক বলেন, 'সামাজিক সুরক্ষা ইউরোপীয় সামাজিক মডেলের কেন্দ্রে আছে। এটি বাংলাদেশের সঙ্গে সহযোগিতার মৌলিক খাত।'

তিনি বলেন, নভেল করোনাভাইরাস (কভিড-১৯) মহামারি জনস্বাস্থ্য খাতে জরুরি অবস্থা সৃষ্টি করেছে। এটি বাংলাদেশের কয়েক কোটি জনগণের ওপর স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক প্রভাব ফেলার ঝুঁকি তৈরি করেছে। তারা দরিদ্র বা অতিদরিদ্র শ্রেণিতে নামার ঝুঁকিতে আছে। এসব প্রভাব প্রশমনে সামাজিক সুরক্ষা বলয় তৈরি করা অপরিহার্য।

ইইউ রাষ্ট্রদূত বলেন, জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তুতি জোরদারে ইইউ বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে আছে।

কালের কণ্ঠ

এপ্রিল ৩০, ২০২০

দিন আনে দিন খায় মজুররা দিশাহারা

রাজধানীর ৪২ লাখ দিনমজুর রয়ে গেছে সরকারি সহায়তার বাইরে

নিখিল ভদ্র

রাজধানীর রায়েরবাজারের সাদেক খান সড়কে প্রতিদিন ভোরে দিনমজুরের হাট বসত। ঝুড়ি, কোদাল, শাবলসহ অন্য সরঞ্জাম নিয়ে হাটে ভিড় জমাতেন তাঁরা। মহাজনদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে কাজ ও মজুরি ঠিক করে চলে যেতেন কাজ করতে। দিন শেষে মজুরি নিয়ে বাজার করে বাসায় ফিরতেন। কিন্তু প্রতিদিনের এ চিত্র এখন আর দেখা যায় না।

দেশে করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে সরকার সাধারণ ছুটি ঘোষণা করার পর রাজধানীর চেনা চেহারা অচেনা হয়ে গেছে। মানুষকে ঘরে থাকার আহ্বান জানিয়ে জরুরি সেবা ছাড়া সব কিছুই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এতে দুর্দশায় পড়েছে নিম্ন আয়ের মানুষ।

বিভিন্ন বেসরকারি হিসাবে, রাজধানীতে কমপক্ষে ৪২ লাখ দিনমজুর এখন তীব্র সংকটে আছেন খাদ্যের পর্যাপ্ত সহায়তার অভাবে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, ঘোষিত বরাদ্দ পাঁচ কোটির বেশি শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে ভাগ করলে মাথাপিছু মাত্র ১৫০ টাকা করে পড়ে, যা তাঁদের জীবনধারণের জন্য অপ্রতুল।

এ অবস্থায় আগামীকাল শুক্রবার মে দিবস পালিত হচ্ছে।

গাইবান্ধার ফুলছড়ির রোজিনা আক্তার স্বামী মারা যাওয়ার পর তিন বছর আগে দুই সন্তানকে নিয়ে চলে আসেন ঢাকায়। প্রতিবেশী এক নির্মাণ শ্রমিকের সঙ্গে কামরাঙ্গীর চরে বাসা নেন। প্রতিদিন ৩০০ টাকায় নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করছিলেন তিনি। প্রতিদিন ভোরে রায়েরবাজারের সাদেক খান সড়কের পাশে দিনমজুরের হাটে এলেই মিলে যেত কাজ। সাধারণ ছুটি ঘোষণার পর হাটে এসে বসে থাকেন; কিন্তু কেউ কাজে নিতে আসে না। এখন বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার ত্রাণের ওপরই তাঁর ভরসা।

জানা যায়, করোনা সংক্রমণের ভয়ে বেশির ভাগ মানুষ কাজ বন্ধ রেখেছে। কাজ নেই তো দিনমজুরের খাবারও নেই। সে কারণে অনেকেই সরকারের নির্দেশনা উপেক্ষা করে গ্রামে ফিরে গেছেন। আবার কেউ কেউ ক্ষুধার জ্বালায় করোনার ভয় তুচ্ছ করে কাজের সন্ধানে প্রতিদিন হাটে আসেন; কিন্তু বেশির ভাগ দিনই শূন্য হাতেই ফিরতে হয়।

দুই সন্তানকে নিয়ে রায়েরবাজার পুলপাড়ের ছোট্ট টিনশেড ঘরে ভাড়া থাকেন দিনমজুর হাফিজুল। তিনি কালের কণ্ঠকে জানান, গত সপ্তাহে দুই দিন ছোট দুটি কাজ পেয়েছিলেন; কিন্তু তাতে এক দিনের খাবারও হয়নি। তাঁর স্ত্রী জেসমিন আক্তার অন্যের বাড়িতে ঠিকা কাজ করতেন। দুজনের আয়ে পাঁচজনের সংসার কষ্টেই চলত। কিন্তু করোনা পরিস্থিতির কারণে দুজনই এখন কর্মহীন হয়ে পড়ায় প্রতিদিনের খাবার জোগাড় করা কঠিন হয়ে পড়েছে। একটি সংস্থা থেকে কিছু চাল-ডাল পাওয়াতে কয়েক দিন চলেছে। কিন্তু আগামী দিনগুলোর কথা ভেবে তিনি দুশ্চিন্তায় আছেন।

রায়েরবাজার বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধের কাছেও বসত দিনমজুরের হাট। এখন আর সেখানে হাট বসে না। দিনের বেলায় টিসিবির ট্রাক এসে সেখানে খোলাবাজারে পণ্য বিক্রি করে।

টাকা না থাকলে পণ্য কিনবেন কিভাবে—সেই প্রশ্ন করেন বসিলা চার রাস্তা মোড়ের বস্তিতে আশ্রয় নেওয়া জাকির হোসেন। কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি বলেন, এই অবস্থা চলতে থাকলে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে না খেয়ে মরতে হবে। আগে প্রতিদিন ভ্যানে করে মোহাম্মদপুর টাউন হলের পাশে একটি আসবাবের দোকানের মালামাল আনা-নেওয়া করতেন। দিন গেলে ৫০০ থেকে ৭০০ টাকা আয় হতো। সেখান থেকে নিজের খরচ ও গ্রামের বাড়িতে স্ত্রী-সন্তানদের জন্য টাকা পাঠাতেন। কিন্তু গত দুই সপ্তাহে কোনো টাকা পাঠাতে পারেননি। নিজের খাবার জোগাড় করাই কঠিন হয়ে পড়েছে।

মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ডে কথা হয় ত্রাণের অপেক্ষায় থাকা দিনমজুর রহমত আলীর সঙ্গে। তাঁর স্ত্রী হাফিজা মানুষের বাসায় ঠিকা কাজ করতেন। তিনি নিজে মাটি কাটা, ইট-বালু পরিবহন,

বাসাবাড়ি পরিষ্কারসহ অন্যান্য কাজ করতেন। এখন স্ত্রীকে নিয়ে রাস্তায় খাবার ও ত্রাণের অপেক্ষায় থাকেন। তিনি জানান, তাঁদের এখন কোনো কাজ নেই। কোনো আয় নেই। এভাবে চলতে থাকলে খাবার পাবেন কোথায়? খাবার কিনতে হলে টাকা দরকার। টাকার জন্য কাজ দরকার; কিন্তু কেউ তো এখন কাজ করাতে নেয় না। ফলে মানুষের কাছে হাত পাতা ছাড়া উপায় নেই।

অনেক দিনের জমানো মাটির ব্যাংকটি ভেঙে সেই টাকায় চাল-ডাল কিনছেন চায়ের দোকানের শ্রমিক আহম্মদ। ৩২ বছর বয়সী এই যুবক যেকোনো কাজ করতে রাজি। কিন্তু এখন দোকান বন্ধ থাকায় তাঁর কাজ নেই। প্রতিদিন সকালে পাইকারি বাজার থেকে এক ব্যবসায়ীর কাঁচামাল কাদিরাবাদ হাউজিংয়ে দিয়ে আসেন। এর বিনিময়ে যা পান তাতে প্রতিদিনের বাজার খরচ হয় না। তিনি বলেন, 'এভাবে আর কয় দিন চলবে। সামনে শুধু অন্ধকার দেখছি। মনে হচ্ছে, মা-বউকে নিয়ে বাড়ি চলে যাই; কিন্তু সেটাও পারছি না। বাড়ি ফিরে ওদের খাওয়াব কী?'

বসিলা চার রাস্তার মোড়ে টেম্পোস্ট্যান্ডের লাইনম্যান আসলামের সঙ্গে কথা হয়। তাঁরা কয়েকজন মিলে টেম্পো, ইজি বাইকের সিরিয়াল ঠিক করতেন। বিনিময়ে প্রতিটি গাড়ি থেকে কিছু বকশিশ পেতেন। তাই দিয়ে ভালোই চলত। কিন্তু এখন কাজ বন্ধ। সেখানে আর গাড়ির ভিড় নেই। সে জন্য তাঁদের সিরিয়াল ঠিক করার কাজটিও প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। সামান্য কিছু গাড়ি চলে, কিন্তু তারা আর বকশিশ দিতে চায় না। তার পরও স্ট্যান্ডে আসেন আসলাম। দুরবস্থার কথা ভাবতে ভাবতেই দিন কাটছে তাঁর।

রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা ঘুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, করোনা পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে দিন এনে দিন খাওয়া মানুষেরা। বাইরে বের হওয়ার সুযোগ না থাকায় তাদের উপার্জনের পথ প্রায় পুরোপুরি বন্ধ। দিনমজুর, রিকশা-ভ্যানচালক, বাসচালক, চালকের সহকারী, গৃহকর্মী—এমন সব নিম্ন আয়ের মানুষ প্রতিদিনের খাবার জোগাড় করা নিয়ে মহাসংকটে পড়েছেন। সহায়তা মিললেও সেটা যথেষ্ট নয়।

উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের এক জরিপ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সরকারি ছুটি বা সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার নির্দেশনার কারণে ৭২ শতাংশ মানুষ কাজ হারিয়েছেন বা তাঁদের কাজ কমে গেছে। মাত্র ৮ শতাংশ মানুষের কাজ থাকলেও এখনো তাঁরা বেতন পাননি। এর মধ্যে ৬২ শতাংশ দিনমজুরের আয় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। ১৪ শতাংশ মানুষের ঘরে কোনো খাবারই নেই। ২৯ শতাংশের ঘরে আছে এক থেকে তিন দিনের খাবার। করোনাভাইরাসের স্বাস্থ্যগত দিকগুলো সম্পর্কে নিম্ন আয়ের মানুষের উপলব্ধি এবং এর অর্থনৈতিক সংকট সম্পর্কে ধারণা পেতে গত ৩১ মার্চ থেকে ৫ এপ্রিল ওই জরিপটি পরিচালিত হয়।

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব বুলবুল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বর্তমানে একদিকে করোনা সংক্রমণের ভয়, অন্যদিকে অনাহারের আতঙ্ক দিনমজুরদের দিশাহারা করে ফেলছে। সাধারণ ছুটি ঘোষণার পরে দিনমজুরসহ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যে বরাদ্দ ঘোষণা করা হয়েছে, তা প্রয়োজনের তুলনায় প্রহসনের শামিল। কর্মহীনতার প্রায় এক মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও দিন এনে দিন খাওয়া মানুষদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ নিশ্চিত না হওয়া দুঃখজনক।' দ্রুত ন্যূনতম খাদ্যের সংস্থান নিশ্চিত করার দাবি জানান তিনি।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, করোনা মোকাবেলায় নগদ টাকা ও খাদ্য সহযোগিতা দুটিই জরুরি। তিনি বলেন, কর্মহীন ও আয় বন্ধ হয়ে যাওয়া দরিদ্র মানুষের জন্য নগদ টাকাসহ অন্যান্য সহায়তা দিতে হবে। সে ক্ষেত্রে প্রতি মাসে সরকারের খরচ হবে পাঁচ হাজার ৫৯৪ কোটি টাকা।

কালের কণ্ঠ

এপ্রিল ৩০, ২০২০

সাহায্যের দিকে তাকিয়ে কর্মহীন গৃহকর্মী ভাসমান মানুষ

প্রায় পাঁচ লাখ গৃহকর্মীর কাজ নেই

লায়েকুজ্জামান ও রফিকুল ইসলাম

তেজগাঁও এলাকায় একটি টিস্যু কারখানায় শ্রমিকদের জন্য রান্নার কাজ করতেন পটুয়াখালীর গলাচিপার গুলনাহার বেগম। বয়স পঞ্চাশোর্ধ্ব। করোনার কারণে কারখানা বন্ধ থাকায় তাঁর এখন কোনো কাজ নেই। হাতিরঝিলের কাছে একটি বস্তিতে থাকেন তিনি। স্বামী অচল। সন্তানরা নিজেদের মতো করে চললেও মা-বাবার খোঁজ রাখেন না। গুলনাহার এখন প্রতিদিন ভিক্ষা করতে বসেন হাতিরঝিলে।

গুলনাহার বলছিলেন, সকাল থেকে হাত পেতে বসে থাকেন। কারো দয়া হলে কিছু দেয়। তাই দিয়ে খাবার কেনেন। তিনি বলেন, ‘সরকার নাকি খাবার দিতাছে, আমরা তো পাই না। কিভাবে বাঁচব আমরা?’

হাতিরঝিলের দ্বিতীয় ব্রিজের পূর্ব পাশের মাথায় গুলনাহারের সঙ্গে কথা বলে সামনে এগোতেই ব্রিজের মাঝখানে দেখা গেল ছয়-সাতজন মিলে ঘিরে ধরেছে এক ব্যক্তিকে। তাদের মধ্যে এক নারীকে বলতে শোনা যায়, ‘স্যার, কিছু দিয়্যা যান, পোলাপাইনের কোনো খাবার নেই। সারা দিন পোলাগুলারে কিছু খাওয়াতে পারি নাই।’

ওই নারী বললেন তাঁর নাম খালেদা। ১০ হাজার টাকা বেতনের একটি চাকরি ছিল তাঁর, কিন্তু করোনার কারণে চাকরি নেই। কোনো আয় নেই, ছোট ছোট সন্তানদের নিয়ে ভিক্ষা করছেন তিনি।

খালেদা হাতের মুঠো খুলে দেখালেন দুপুর দেড়টা পর্যন্ত পেয়েছেন মাত্র ২০ টাকা। তিনি বলেন, ‘কাজ নাই, কাম নাই কিন্তু খিদা তো বুঝে না। খাবার আনতে ঘর থেকে বাহির হইছি। সরকার নাকি খাবার দিতাছে, শুনছি। কিন্তু কেউ তো দ্যায় না। কার কাছে গেলে পামু তাও জানি না।

আমাগো মতো গরিবরে সরকার না দেখলে দেখবো কে? খাবার না পাইয়া সন্তানগুলারে লয়ে মরতে হবে।'

গতকাল বুধবার রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা যায়, মোড়ে মোড়ে ত্রাণপ্রার্থী নারী-পুরুষ। মিরপুর, হাতিরঝিল, রামপুরা, বাড্ডা, গুলশান, মহাখালী, মৌচাক ও মগবাজার এলাকা ঘুরে দেখা গেল, রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে বা বসে থাকে অনেকেই, যারা খাবার খুঁজছে। চলন্ত গাড়ি লক্ষ্য করে ছুটে যাচ্ছে তারা। হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। কোনো প্রাইভেট কার থামলেই সাহায্যের জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ছে তারা।

তারা বলছে, কেউ ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের কাছ থেকে কোনো ত্রাণ পেলেও বাড়তি ত্রাণের আশায় সড়কে বসে থাকছে। আবার কেউ কেউ ভাসমান ও ছিন্নমূল কেউ কোনো ওয়ার্ড থেকে ত্রাণ পায়নি। কারণ তারা ঢাকার ভোটার নয়।

এসব লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, নারীরা বাসাবাড়িতে কাজ করত। আর পুরুষরা দিনমজুর হিসেবে কাজ করতে। করোনার কারণে গৃহকর্তা গৃহকর্মীকে ছুটি দিয়েছেন। করোনাকাল কেটে গিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আবার কাজে যোগ দিতে বলেছেন। প্রায় এক মাস যাবৎ কোনো কাজ নেই। তাদের ঘরে জমানো কোনো অর্থ না থাকায় খাদ্যসংকটে পড়েছে। আর সব কিছু স্থবির থাকায় কাজের সুযোগ পাচ্ছে না দিনমজুর।

ঢাকায় গৃহকর্মীর সংখ্যা কত তার সঠিক কোনো হিসাব না পাওয়া গেলেও বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে পাওয়া তথ্যে জানা যায়, পাঁচ লাখের মতো কর্মী বাসাবাড়িতে কাজ করে, যাদের ৯০ শতাংশের বেশি নারী।

এ ছাড়া রাস্তার পাশে বা ফুটপাতে বাস করে প্রায় ৫০ হাজার ছিন্নমূল মানুষ। তাদের কেউ ভিক্ষা করে, কেউ দিনমজুর।

সিটি করপোরেশন সূত্রে জানা যায়, উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন তালিকা করে দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে। সরকারি সহায়তা পৌঁছে দিচ্ছে ঘরে ঘরে। প্রতিটি ওয়ার্ডে ৫০০ জনকে সরকারি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। ব্যক্তি উদ্যোগেও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি কিংবা ধনাঢ্য ব্যক্তিরা ত্রাণ বিতরণ করছেন, কিন্তু কর্মহীন গৃহকর্মী ও ছিন্নমূল ভাসমান মানুষের স্থায়ী ঠিকানা না থাকায় ত্রাণ পাচ্ছে না। কেউ পেলেও সেটা শেষ হতে চলেছে। নতুন করে ত্রাণ না দিলে ক্ষুধার কষ্টে পড়বে হাজারো মানুষ।

সালমা বেগমের বাড়ি ফরিদপুরের মধুখালী উপজেলায়। অভাবের সংসার হলেও কখনো মানুষের কাছে হাত পাতেননি, ভিক্ষা করেননি। মিরপুর ১০ নম্বর গোল চত্বরের পাশের সড়কে বসে পান-সিগারেট বিক্রি করে চার সদস্যের পরিবারের জীবিকা চালাতেন। লকডাউন হওয়ার পর দোকান বন্ধ। সড়কে বসা নিষেধ। মিরপুরের ১ নম্বর সেকশন এলাকার সড়কে বসে থাকতে দেখা যায় তাঁকে। বলছিলেন, 'দানের আশায় বসে আছি সড়কে, যদি আল্লাহ কাউকে কিছু খাবার দিয়ে পাঠান।' তিনি জানান, গত মঙ্গলবার সকালে চারজন আধাকেজি চালের ভাত খেয়েছেন শুধু লবণ মেখে। তারপর আর পেটে দানা পড়েনি। সাত-আট দিন আগে মিরপুরের একজন

আওয়ামী লীগ নেতা, যাঁর নাম মনে নেই, তিনি তিন কেজি চাল দিয়েছিলেন। দোকান বন্ধ হওয়ার পর এটুকুই সাহায্য পেয়েছেন। কিছু জমানো টাকা ছিল তা শেষ হয়ে গেছে।

আঁচলে চোখের জল মুছে সালমা বলেন, 'আমি তো ঢাকার ভোটার নই, তাহলে কিভাবে সরকারি সাহায্য পাব। এখন তো গ্রামেও যেতে পারছি না।'

মিরপুরের কালশী এলাকার মালেক নামের এক ভিক্ষুক কালের কণ্ঠকে বলেন, 'সরকার বলছে ঘরে ঘরে খাবার পৌঁছে দেবেন, আমার তো ঢাকায় কোনো ঘরই নেই। তাহলে আমার খাবার পাব কিভাবে? আমি তো রাস্তায় রাস্তায় ঘুমাই। কয়েক দিন পর পর ময়মনসিংহে গ্রামের বাড়ি চলে যেতাম। এখন রাস্তায় লোক নেই। ভিক্ষাও জুটে না, ত্রাণও পাই না। ট্রেন বন্ধ, বাড়িও যেতে পারি না।'

রাজধানীর হাইকোর্ট এলাকায় বসে থাকা পরিবহন শ্রমিক কাশেম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'লকডাউন হওয়ার প্রথম দিকে বিভিন্ন লোক রান্না করা খাবার এবং চাল-ডাল দিতেন গাড়িতে ঘুরে ঘুরে। এখন দেওয়া কমে গেছে। তা-ও আশা নিয়ে বসে থাকি, তবে এখন আর পাই না।'

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্যানেল মেয়র জামাল মোস্তাফা কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ছিন্নমূল থেকে শুরু করে সব শ্রেণির মানুষকেই ত্রাণ দেওয়া হচ্ছে। রাজধানীর বস্তিগুলোতে সবচেয়ে বেশি ছিন্নমূল ও দরিদ্র মানুষের বাস। সিটি করপোরেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে ত্রাণ সহায়তা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।'

কালের কণ্ঠ

এপ্রিল ৩০, ২০২০

নিয়ম মানার বালাই নেই
চট্টগ্রামে পূর্ণোদ্যমে চলছে পোশাক কারখানা

রাশেদুল তুষার, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের সাগরিকা শিল্প এলাকায় বিএসএ গ্রুপের ৩টি পোশাক কারখানায় মোট ছয় হাজার শ্রমিক কাজ করে। গকাল বুধবার এই তিন কারখানায় ৯০ শতাংশের বেশি শ্রমিক উপস্থিত ছিল। স্বাভাবিক সময়েও এই কারখানাগুলোতে প্রায় সাত থেকে আট শতাংশ শ্রমিক অনুপস্থিত থাকে। সেই হিসেবে করোনাভাইরাস সংক্রমণ ঠেকাতে সাধারণ ছুটির মধ্যে সীমিত আকারে পোশাক কারখানা খোলার অনুমতি দিলেও চট্টগ্রামের অধিকাংশ কারখানা এখন চলছে পূর্ণোদ্যমে।

কারখানার আশেপাশের শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করার পরামর্শ দেওয়া হলেও বিএসএ গার্মেন্টসের মতো অনেক কারখানা রীতিমতো নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থায় কর্মীদের কারখানায় নিয়ে আসছে। বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের উপস্থিতিতে এই শ্রমঘন শিল্পে চাইলেও সামাজিক দূরত্ব অক্ষুণ্ন রেখে উৎপাদন প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়া সম্ভব কিনা সেটা নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন অনেকে। এতে করোনাভাইরাস সংক্রমণ বিস্তারের সম্ভাবনা প্রবল বলে মনে করছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা।

শ্রমিক উপস্থিতি বেশি প্রসঙ্গে বিএসএ গ্রুপের একজন ঊর্দ্ধতন কর্মকর্তা জানান, এই গ্রুপের অধিকাংশ শ্রমিক হালিশহর, সিটিগেইট, আকবরশাহ এলাকার। হাঁটা দূরত্বের বলে শ্রমিকদের আসতে সমস্যা হয় না। এছাড়া বেশকিছু শ্রমিক আসে গোসাইলডাঙ্গা থেকে। তাদের বাস দিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া সরকার নির্দেশিত সুরক্ষা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।'

শিল্প পুলিশ, চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে, জেলায় বুধবার এক হাজার ২২৯টি শিল্প কারখানার মধ্যে চালু ছিল ৬০৫টি। এরমধ্যে তৈরি পোশাক কারখানা ৩৬৬টি। বিজিএমইএ সদস্যভুক্ত কারখানা ১৪৮টি। এছাড়া বিকেএমইএ সদস্য ৪৮টি ও বিটিএমইএ'র ১০টি কারখানা চালু ছিল। আর দুই ইপিজেডে সব মিলিয়ে চালু ছিল ১৪২টি কারখানা।

আগেরদিন মঙ্গলবারও চট্টগ্রামে চালু ছিল ৩৩৮টি কারখানা। অর্থাৎ প্রতিদিনই কাজে ফিরছে একের পর এক কারখানাগুলো। বিশেষ অনুমতি নিয়ে জরুরি শিপমেন্টের জন্য সীমিত পরিসরে খোলার কথা বলা হলেও অধিকাংশ কারখানা পূর্ণোদ্যমে উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এই সুযোগে যারা ইতোমধ্যে দীর্ঘমেয়াদে লে-অফ ঘোষণা করেছে এমন অনেক কারখান শ্রমিকদের এনে সীমিত আকারে উৎপাদন কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

চট্টগ্রাম ইপিজেড সূত্র জানায়, এই ইপিজেডে গতকাল বুধবার ১০১টি কারখানা খোলা ছিল। এইসব কারখানায় প্রায় ৫১ হাজার শ্রমিক এদিন উৎপাদন প্রক্রিয়া চালিয়ে গেছেন। যদিও শিল্প পুলিশের হিসাবে সিইপিজেডে চালু কারখানা ১৩৯টি। ২৬ এপ্রিল সিইপিজেড গেইটে বিকালে ছুটির সময় বিপুল শ্রমিকের সমাগমের ছবি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়। সমালোচনার মুখে পরদিন থেকে ইপিজেডে প্রবেশ ও ছুটির সময় কারখানাভেদে আলাদা করে দেওয়া হয়।

এ প্রসঙ্গে সিইপিজেডের মহাব্যবস্থাপক খুরশিদ আলম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'কারখানাগুলোকে গ্রুপ ভাগ করে অফিস শুরু ও ছুটির সময় আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। এতে করে চাপ অনেকটাই কমে গেছে। এছাড়া কারখানায় প্রবেশের সময় হাতধোয়া, মাস্ক পরিধান এবং থার্মাল স্ক্যানার দিয়ে জ্বর মাপা ও কারখানার অভ্যন্তরে সামাজিক দূরত্ব মানা হচ্ছে কি না তা মনিটরিং করার জন্য কমিটি করে দেওয়া হয়েছে।'

সিইপিজেডের আশেপাশের শ্রমিক বিশেষ করে স্টিলমিল বাজার থেকে শুরু করে সল্টগোলা ক্রসিং পর্যন্ত এলাকায় অবস্থান করা শ্রমিকদের নিয়ে ইপিজেডের কারখানাগুলোকে উৎপাদন কাজ চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে। কয়েকটি কারখানা গ্রামের বাড়ি থেকে শ্রমিকদের আসার জন্য চাপ দিয়েছে শোনার পর তাদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। যদিও নির্দিষ্ট করে দেওয়া এলাকার বাইরে থেকেও প্রচুর শ্রমিক ইপিজেডে যাচ্ছেন বলে জানা গেছে।

এদিকে পোশাক কারখানায় শ্রমিকদের এমন উপস্থিতি ভাবিয়ে তুলেছে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের। করোনা রোগীদের জন্য নির্ধারিত চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালের সিনিয়র কনসালট্যান্ট আব্দুর রব মাসুম মঙ্গলবার রাতে ফেসবুক লাইভে চট্টগ্রামে কভিড-১৯ এর সংক্রমণের চিত্র তুলে ধরে বলেন, 'সোমবার চট্টগ্রামে ১০০ নমুনা পরীক্ষায় ১১ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। এরমধ্যে চট্টগ্রামের নমুনা ছিল ৩৫টি। এই ৩৫টি নমুনায় চট্টগ্রাম জেলায় করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে ৯জন। শনাক্তের হার প্রায় ২৫ শতাংশ। যদি নমুনা ৫০০ পরীক্ষা হতো নিশ্চিতভাবে আরও বেশিসংখ্যক রোগী পাওয়া যেত। গার্মেন্ট খোলার কারণে আগামী সাত থেকে ১৪দিন পরে চট্টগ্রামে সংক্রমণ বৃদ্ধির আশঙ্কা করছি।'

পোশাক কারখানায় শ্রমিক উপস্থিতি বেশি প্রসঙ্গে বিজিএমইএ পরিচালক মোহাম্মদ আতিক বলেন, 'চট্টগ্রামের কারখানাগুলোতে ৩০ থেকে ৮০ শতাংশ শ্রমিক কাজ করছে। শহরের কারখানায় শ্রমিক বেশি উপস্থিতির কারণ এই শ্রমিকরা বেশিরভাগ কারখানার আশেপাশেই বাস করে। এছাড়া ছুটির মধ্যে চট্টগ্রাম থেকে খুব বেশি শ্রমিক গ্রামের বাড়িতে যায়নি। এরপরেও বিজিএমইএর চার পরিচালকের নেতৃত্বে ৪টি কমিটি করা হয়েছে মনিটরিংয়ের জন্য।'

দৈনিক ইত্তেফাক

এপ্রিল ৩০, ২০২০

করোনায় কাওরান বাজারে শ্রমিকদের নিঃসঙ্গ ইফতারী

নিলয় মামুন

কাওরান বাজারের ভ্যানচালক আমিন উদ্দিন। সারাদিন খাটাখাটুনির পর একা একা নিজের ভ্যানের ওপরেই ইফতার নিয়ে বসেছেন। যত্সামান্য আয়োজন; ছোলা, চপ আর একটু মুড়ি। কাছে গিয়ে আলাপ শুরু করতেই তিনি বলেন, আগের মতো কি আর অবস্থা আছে ? একাই কোনো রকম বসে ইফতারি সারছি। এক সময় সবাই মিলে বসে ইফতারি করতাম, কত আয়োজন ছিল। এখন কেউ কাউকে ডাকে না ইফতার করার সময়। যে যার মতো ছোটো পরিসরে ইফতার করছে।

গতকাল রাজধানীর কাওরান বাজারে ইফতারির আগ মুহূর্তে এমন দৃশ্যই দেখা গেছে। যে কাওরান বাজারে সন্ধ্যা হলেই লোকে লোকারণ্য থাকত, কাঁচা বাজারের আড়তগুলোতে খুচরা ও পাইকারি ক্রেতা ও বিক্রেতা ও শ্রমিকের সমাগম বসত, সেখানে এখন হাতেগোনা কিছু মানুষ। নেই তেমন ভিড়। প্রতিবছর রমজানের সময় গোল হয়ে বসে দলবদ্ধভাবে ইফতারি করা ছিল এখানকার দিনমজুর ও দোকানিদের চিরাচরিত নিয়ম। কিন্তু সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার ওপর গুরুত্বারোপ ও ইফতারসামগ্রীর দোকানও সেভাবে না বসায় এবার তেমন কোনো আয়োজন ছাড়াই চলছে ইফতারি। দুই জনে মিলে আড়তে বসে ইফতারি করা ষাটোর্ধ্ব এক জন বলেন, ইফতারসামগ্রী নিয়ে কি ইফতার করব? একসঙ্গে তো চার জন বসে ইফতারিই করা যাচ্ছে না।

দিনমজুর-শ্রমিকদের সারাদিন যে রোজগার তা দিয়ে ইফতারি কিনে খাওয়া একরকম বিলাসিতা হিসেবেই দেখছেন সংশ্লিষ্টরা। এমনি এক জন হামিদ আলী। বাড়ি থেকে একটু চিড়া আর গুড় নিয়ে এসেছেন ইফতারির জন্য। কেমন কাটছে পবিত্র রমজানের দিনগুলো? কাছে গিয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, পেটের দায়ে বের হয়েছি এই করোনার সময়েও। কোনো রকম বেঁচে আছি। আমাদের খোঁজ কে নেয়? কিনে ইফতারি খাওয়ার মতো টাকাও তো নেই পকেটে। তাই এসব দিয়েই ইফতার করছি।

এদিকে এ বছর হোটেল ও রেস্টুরেন্ট ছাড়া ফুটপাতে ইফতারির বাজার বসতে দেওয়া হচ্ছে না। ফলে ফুটপাতগুলো ফাঁকা। তবে কাওরান বাজারে ফুটপাতে ভ্যানের ওপর ইফতারসামগ্রী বিক্রির দোকান দেখা গেছে। আব্দুল আলীম নামে ফুটপাতের সেই দোকানদার জানান, একদম বিক্রি নেই। আগের বছরও যেখানে এমন দোকান দিয়ে বিক্রি করে দিশাহারা হয়ে যেতাম সেখানে এ বছর তেমন ক্রেতাই নেই। মানুষই তো বাইরে নেই, কারা কিনবে? বড়ো বিপদে আছি। একদিকে পুলিশ বসতে দিচ্ছে না, অন্যদিকে ক্রেতা নেই। আমরা কী করে খাব? কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। কাওরান বাজারের মতো অন্যান্য এলাকাতেও আগের মতো ইফতারির সময় যে উত্সবের আমেজ ছিল সেটি এখন আর দেখা যাচ্ছে ন

প্রথম আলো

০৩ এপ্রিল ২০২০,

কারখানা বন্ধ দিয়ে ১৮৯ শ্রমিককে অব্যাহত

ঢাকার আশুলিয়ায় ফ্যাশনস ফোরাম নামের একটি পোশাক কারখানার দেড় শতাধিক অস্থায়ী শ্রমিককে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে কারখানা ১৪ দিনের জন্য বন্ধ হয়ে যাওয়ার দিনই তাঁদের নামের তালিকা প্রতিষ্ঠানের মূল ফটকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ ভুক্তভোগী শ্রমিকেরা বলছেন, কারখানা বন্ধের সময় তাঁদের এ ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি।

শ্রমিকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শ্রমিকদের মধ্যে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে গত বুধবার থেকে ১৪ দিনের জন্য কারখানা বন্ধ ঘোষণা করা হয়। বন্ধ হওয়ার দিনই এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কারখানার ১৮৯ জন অস্থায়ী শ্রমিকের চাকরি স্থায়ী না করে অব্যাহতির ঘোষণা দেওয়া হয়। এসব শ্রমিকের নামের তালিকা কারখানার মূল ফটকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। তাঁরা বিষয়টি আজ শুক্রবার জানতে পারেন। নোটিশে ১৫ এপ্রিল তাঁদের বেতনসহ যাবতীয় পাওনা পরিশোধের কথা বলা হয়। প্রতিষ্ঠানটির এমন সিদ্ধান্তে ছুটিতে থাকা কর্মহীন শ্রমিকেরা বেকায়দায় পড়েছেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁদের পক্ষে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরি পাওয়া কষ্টকর হয়ে পড়বে।

অব্যাহতির তালিকায় নাম থাকা কয়েকজন শ্রমিকের ভাষ্য, কারখানা বন্ধ দেওয়ার সময় তাঁদের কিছু বলা হয়নি। খবর পেয়ে গতকাল কারখানার সামনে গিয়ে তাঁরা অব্যাহতির নোটিশ দেখতে পান। করোনাভাইরাসের সংক্রমণের আশঙ্কায় ঘর থেকে বের হওয়া যায় না, সব কলকারখানা বন্ধ রয়েছে। এই অবস্থায় কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের অব্যাহতি দিয়ে বিপদে মধ্যে ফেলে দিল। যে টাকা বেতন পাওয়া যাবে, তা ঘরভাড়া আর দোকানের বকেয়া পরিশোধ করতেই শেষ হয়ে যাবে।

শ্রমিকদের অব্যাহতির সিদ্ধান্তের বিষয়ে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের এক কর্মকর্তা বলেন, তাঁরা এ বিষয়ে অবগত আছেন। এই সংকটের সময়ে শ্রমিকদের যাতে অব্যাহতি না দেওয়া হয়, মালিকপক্ষকে তা বোঝানোর চেষ্টা করা হবে।

এদিকে শ্রমিকদের অব্যাহতি দেওয়ায় নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে গার্মেন্ট শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র। সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক খাইরুল মামুন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে শ্রমিকদের অব্যাহতির নোটিশ প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন।

The Financial Express

April 05, 2020

Virus to put a dent in overseas employment

'It may also create scopes for migration' *uters file photo*

The country's overseas employment sector would face a blow for a long period of time due to coronavirus pandemic, according to a prediction by RMMRU.

It said the inward remittances might decline in coming days, badly affecting the beneficiary households, shrinking their purchasing capacity and ultimately holding back the country's economic growth.

Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU) made the projection at an online press conference on Saturday.

The inflow of remittances has already dropped by 12 per cent in the first three months compared to that of the previous year, it pointed out.

Tasneem Siddiqui, founding chair of RMMRU, said all the impacts would not be negative, however, as some new job scopes will also be generated abroad.

The German government has engaged refugees and migrants as medical staffs to meet the present crises. More than 300 refugee medical staffs are working in this European country, she mentioned.

Besides, there is a scarcity of manpower and medical products in USA, Japan, Canada and other European countries. So, a large investment could take place in the coming days that would create scopes for migration, she said.

She suggested the government to adopt short and long-term plans to utilise the opportunity.

Ms Siddiqui also suggested taking necessary measures for the protection of migrants and their families at home.

She recommended for providing grants and loans without interests to the migrant families to meet their necessities and allocating necessary fund for the workers staying abroad and ensure their health protection.

The RMMRU chair requested all to keep the migrants in their positive attitude as they have a large contribution to the country's development. Returned workers should be provided with all essential supports to help them stay safe in the country.

RMMRU had proposed to observe a one minute silence at 9:00am today (Sunday) for all Bangladeshis who died of COVID-19 at home and abroad.

Other recommendations included creating returnee migrants database, gender responsive facilities, utilising the returnees' experience, making long-term plan, creating skilled workers, etc.

arafat_ara@hotmail.com

সমকাল

০৪ এপ্রিল ২০২০

কারখানায় অনুপস্থিতির কারণে কেউ চাকরি হারাবে না: বিজিএমইএ

কারখানায় অনুপস্থিতির কারণে কোনো শ্রমিক চাকরি হারাবে না বলে আশ্বস্ত করেছেন বিজিএমইএ সভাপতি ড. রুবানা হক।

শনিবার রাত সোয়া দশটায় এক অডিও বার্তায় রুবানা হক সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

অডিও বার্তায় বিজিএমইএ সভাপতি রুবানা হক সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় ১১ এপ্রিল পর্যন্ত কারখানা বন্ধ রাখার জন্য সকল মালিকদের প্রতি অনুরোধ জানান।

এছাড়া মার্চ মাসের বেতন নিয়ে পোশাক কারখানার শ্রমিকদের কোন শঙ্কার কারণ নেই বলেও জানিয়েছেন বিজিএমইএ সভাপতি।

সমকাল

০৫ এপ্রিল ২০২০

করোনায় কর্মহীন তিন সহস্রাধিক শ্রমিক

মনিরুল হায়দার ইকবাল, মোংলা (বাগেরহাট)

করোনাভাইরাসের কারণে বিশ্বে মন্দাভাব দেখা দেওয়ায় মোংলা বন্দরে জাহাজ আগমন-নির্গমনের সংখ্যা কমে গেছে। ফলে এখানকার জাহাজ ও জেটিতে পণ্য ওঠানামার সঙ্গে জড়িত কয়েক হাজার শ্রমিক-কর্মচারী প্রায় কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। 'নো ওয়ার্ক, নো পে' ভিত্তিতে কাজ করা এসব শ্রমিক-কর্মচারী কাজের অভাবে এখন পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করলেও বন্দর কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত তাদের কোনো সহায়তা দেয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। বন্দরের হারবার ও ট্রাফিক বিভাগ সূত্র জানায়, কিছুদিন আগেও প্রতিদিন গড়ে ১৫-১৬টি জাহাজ অবস্থান করত বন্দরে। সেসঙ্গে বন্দর জেটিতেও কিছু পণ্য ওঠানামা করত। কিন্তু করোনার কারণে এ বন্দরে এখন গড়ে প্রতিদিন ১০-১১টি জাহাজ অবস্থান করছে। পাশাপাশি কমে গেছে বন্দর জেটির অভ্যন্তরের অনেক কাজ। মোংলা বন্দর শ্রমিক সংঘের সাধারণ সম্পাদক এ কে এম সাহাব উদ্দিন জানান, আইন অনুযায়ী জাহাজ ও জেটিতে পণ্য ওঠানামায় জড়িত শ্রমিক-কর্মচারীদের মূল মালিক মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ। অথচ বন্দর কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত সুকৌশলে শ্রমিকদের মালিকানা ঠিকাদারের ওপর চাপিয়ে নিজেদের দায়িত্ব এড়াতে চাচ্ছেন। শ্রমিকদের উন্নয়ন বাবদ বিভিন্ন খাত থেকে বন্দর কর্তৃপক্ষ শ্রমকল্যাণ তহবিলে কোটি কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করলেও করোনা প্রাদুর্ভাবের এ সময়ে বন্দরের ক্যাজুয়াল এসব শ্রমিক-কর্মচারীর সহায়তায় এগিয়ে আসেনি। এছাড়া যেসব শ্রমিক বর্তমানে জাহাজ ও জেটিতে কাজ করছে, তাদেরও কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রাথমিক উপকরণ দেয়নি। ফলে শ্রমিকরা ঝুঁকি নিয়েই জাহাজে কাজ করছেন। গতকাল শুক্রবার সকালে মোংলা শহরের কয়েকটি শ্রমিক আবাসিক এলাকায় সরেজমিনে গিয়ে শ্রমিক-কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বললে তারা জানান, এরই মধ্যে তাদের সঞ্চয় শেষ হয়ে গেছে। ত্রাণ ও সহায়তা যা পেয়েছেন, তা দিয়ে সামান্য কিছুদিন কোনোমতে চললেও বাকি দিনগুলোতে কীভাবে সংসার চালাবেন, ঘর ভাড়া দেবেন তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। অনেক পরিবারই এখন তিন বেলা ঠিকমতো খেতে পারছে না। ঘরের বাইরে বের হওয়ার নিষেধাজ্ঞা জারি থাকায় বিকল্প কাজও করতে পারছেন না। মোংলা বন্দর ব্যবহারকারী ও স্টিভিডোরস কোম্পানি মেসার্স নূরু অ্যান্ড সন্সের মালিক এইচ এম দুলাল বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছেন তারা। অফিস স্টাফদের বসিয়ে বসিয়ে বেতন দেওয়া হচ্ছে। তার পরও সাধ্যমতো শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন তারা।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল শেখ মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ শ্রমিকদের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, শ্রমিকদের মালিক বন্দর কর্তৃপক্ষ নয়, তারা স্টিভিডোরসদের (ঠিকাদার) অধীনে কাজ করেন। ঠিকাদারই তাদের দেখভাল করে থাকেন। কাজের সময় শ্রমিকদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার প্রাথমিক উপকরণ প্রদানের বিষয়ে এরই মধ্যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। করোনা দুর্যোগে বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে পাঁচ কোটি টাকা অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে শ্রমিকদের সহায়তা করার বিষয়টিও বিবেচনা করা হবে।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন
আপডেট : ৫ এপ্রিল, ২০২০ ০৯:২৪

শ্রমিকরা বাঁচলো কি মরলো তাতে কার কি আসে যায়!

গার্মেন্টস শিল্পের শ্রমিকদের তাদের কারখানায় যোগ দেবার জন্যে ডেকে আনায় শিল্পের মালিকদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সবাই সোচ্চার হচ্ছেন। এই মালিকরা যে কি ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করেছেন সেই বিষয়ে পরে বলি। কেন শ্রমিকরা তাদের জীবন বিপন্ন করে ঢাকামুখী হয়েছেন তা আমার-আপনার জানার কথা।

জীবন ও জীবিকার মধ্যে তাদের জীবিকাকেই বেছে নিতে হয়েছে। কারণ জীবিকা ছাড়া তাদের জীবন রক্ষার উপায় নেই। গত ১০ দিনে সরকার বা মালিকরা কি করেছেন যাতে তাদের মনে হবে যে ঘরে বসে থেকে বাঁচা যাবে ? তাদের কাছে চাল-ডাল-সাহায্য পৌঁছানো গেছে? সরকারের মন্ত্রী-নেতারা সরকারী 'ত্রাণ' দিচ্ছেন এমন ভাবে যেখানে সাংবাদিকরা অলৌকিকভাবে ক্যামেরা নিয়ে হাজির হচ্ছেন।

এইসব ত্রাণ বাংলাদেশের উন্নয়নের এইসব কারিগরদের কাছে পৌঁছাবার কথা নয়। দেশে সরকারি হিসেবেই আছে ৬ কোটি দরিদ্র। হতদরিদ্র হচ্ছে ১ কোটি ৬৮ লাখ। তাদের কাছেই কী পৌঁছেছে? মনে করে দেখুন এই শ্রমিকদের কেন এই বিপদ মাথায় নিতে হয়।

২০১৭ সালে নারী শ্রমিকদের ওপর গবেষণা করে চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি) বলছিলো ৮০ শতাংশ নারী রক্তস্বল্পতায় ভুগছেন; কারণ তারা যথেষ্ট খেতে পারেন না। মনে আছে কি এই বছর ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় একটি বড় হোটেলে 'পোশাক শিল্পখাতে মৌলিক পুষ্টি ও খাদ্য সরবরাহ বিষয়ক প্রশিক্ষণ' বিষয়ক কর্মশালা হয়েছিল। সেখানে জানা গিয়েছিলো যে ৪৩ শতাংশ শ্রমিক দীর্ঘ মেয়াদী অপুষ্টির শিকার। কিন্তু তা নিয়ে সবাই উদ্বিগ্ন হয়েছিলো কেন জানেন?

সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে বলা হয়েছিলো –"এতে পোশাক শিল্পে শ্রমিকদের ২০ শতাংশ উৎপাদনশীলতা কমে যাচ্ছে। " তাদের স্বাস্থ্য নয়, জীবন নয়– উৎপাদনশীলতা হচ্ছে উদ্বেগের বিষয়। ফলে আজকে এখন তারা যা করছেন তার বিকল্প ছিল না। ঐ উৎপাদনশীলতার অজুহাতেই এখন মালিকরা তাদের ডেকে নিয়ে এসেছে। মালিকদের এই আচরণ কেবল অমানবিক নয়, জনস্বাস্থ্যের জন্যে হুমকি। তাদের প্রশ্ন করুন। কিন্তু সাথে সাথে এটাও লক্ষ্য করুন সরকারের ভূমিকা কি।

১ এপ্রিলের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে যে, 'প্রয়োজনে... রপ্তানীমুখি শিল্পকারখানা চালু রাখতে পারবে'। প্রধানমন্ত্রীর দেয়া ৩১টি নির্দেশের ২৯ নং-এ বলা হয়েছে "শিল্প মালিকগণ শ্রমিকদের

সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে উৎপাদন অব্যাহত রাখবেন"। এই নির্দেশনার ফাঁক গলিয়েই গার্মেন্টস কারখানার মালিকরা সুবিধা নিচ্ছেন। কিন্তু সেটাই কি কারণ ? এর পেছনে কি সরকারের ওপরে চাপ প্রয়োগের কৌশল কাজ করছে ? সময় এবং ঘটনা প্রবাহ দেখলেই বুঝতে পারবেন। গার্মেন্টস মালিকরা সরকারের কাছে চেয়েছিল 'প্রণোদনা'। মানে টাকা দেয়া হবে কিন্তু তাদের ফেরত দিতে হবে না। সরকার বলেছে দেওয়া হবে ঋণ; ঋণের টাকা গার্মেন্টস মালিকদের শোধ দিতে হবে ২ শতাংশ সার্ভিস চার্জসহ, অনেকে বলছেন তাদের প্রায় ৪ শতাংশ ব্যয় হবে।

সরকারের এই সিদ্ধান্তে নাখোশ গার্মেন্টস মালিকরা। তাই সরকারের কাছ থেকে 'প্রণোদনা' নেওয়ার কৌশল হিসেবেই এখন এই শ্রমিকদের জীবন বিপন্ন করা হয়েছে, দেশের জনস্বাস্থ্যকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়া হয়েছে। দেশকে জিম্মি করা থেকে এটি কী অর্থে ভিন্ন? এই বিপদজনক খেলায় গরিব শ্রমিকরা দাবার ঘুঁটি মাত্র; তারা বাঁচলো কি মরলো তাতে কার কি আসে যায় !

লেখক : অধ্যাপক, ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি

বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

গভীর সংকটের মুখে বৈশ্বিক কর্মসংস্থান

এপ্রিল ০৫, ২০২০

বিশ্ব অর্থনীতিতে নভেল করোনাভাইরাসের নেতিবাচক প্রভাব এরই মধ্যে পড়তে শুরু করেছে। মহামারীটির কারণে বৈশ্বিক জিডিপি সংকোচনের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। চাহিদা ও সরবরাহ ব্যব স্থার সংকটে ব্যবসায় মন্দা যাচ্ছে উৎপাদনমুখী করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর। একই অবস্থা আকা শসেবা ও পর্যটন খাতেও। সব মিলিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে বাজে মন্দা দেখার শঙ্কায় রয়েছে বিশ্ব অর্থনীতি। আর স্থবির অর্থনীতিতে বড় ধরনের সংকটে পড়বে বৈশ্বিক কর্মসংস্থান।

কর্মসংস্থানের সংকট অবশ্য এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে। ব্যয় সংকোচনের জন্য ধুঁকতে থাকা প্র তিষ্ঠানগুলো কর্মী ছাঁটাইয়ের নীতি নিয়ে এগোচ্ছে। এর কারণে চাকরি হারাচ্ছে লাখ লাখ মানুষ। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) সতর্ক করে বলেছে, করোনার প্রকোপ এখনই ঠেকানো না গেলে বিশ্বজুড়ে কাজ হারাবে প্রায় আড়াই কোটি মানুষ।

করোনার কারণে কর্মসংস্থান কতটা হুমকিতে রয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের দিকে তাকালেই তা পরিষ্কার হবে। টেলিগ্রাফের একটি প্রতিবেদন বলছে, মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে দেশটিতে বেকারত্ব ভাতার আবেদন জমা পড়েছে প্রায় এক কোটি। এর মধ্যে ২৮ মার্চ পর্যন্ত এক সপ্তাহেই আবেদন করেছেন ৬৬ লাখ মার্কিনি। অর্থনীতিবিদরা সতর্ক করে বলেছেন, লকডাউন পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হলে কেবল যুক্তরাষ্ট্রেই কর্মসংস্থান কমবে প্রায় দুই কোটি।

আরেকটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান দেয়া যাক। মার্কিন ব্যুরো অব লেবার স্ট্যাটিস্টিকসের তথ্য অনুযায়ী, ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্বের হার ছিল ৩ দশমিক ৫ শতাংশ, যা ছিল ৫০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। সেখান থেকে মার্চে সাত লাখের বেশি মার্কিনি চাকরি হারানোর কারণে দেশটিতে বেকারত্বের হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ দশমিক ৪ শতাংশ। অর্থাৎ করোনার ধাক্কায় মাত্র এক মাসেই যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্ব বেড়েছে প্রায় ১ শতাংশীয় পয়েন্ট। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের বিশ্লেষকদের পূর্বাভাস বলছে, দেশটিতে কয়েক মাসের মধ্যেই বেকারত্বের হার ১৬ শতাংশে উন্নীত হবে, যা গত শতাব্দীর ত্রিশের দশকের পর সর্বোচ্চ। গোল্ডম্যান স্যাকসের পূর্বাভাসও প্রায় একই কথা বলছে। তাদের আশঙ্কা, শিগগিরই যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্বের হার ১৫ শতাংশে গিয়ে দাঁড়াবে। অবশ্য অর্থনীতি করোনার ধাক্কা সামাল দিতে পারলে এ হার ধীরে ধীরে কমবে।

শুধু যে যুক্তরাষ্ট্রই কর্মসংস্থান হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছে, তা নয়। জেপিমরগ্যান চেজ অ্যান্ড কোম্পানির অর্থনীতিবিদরা ধারণা করছেন, চলতি বছরের মাঝামাঝি নাগাদ উন্নত দেশগুলোয় বেকারত্বের হার ২ দশমিক ৭ শতাংশীয় পয়েন্ট বেড়ে যেতে পারে। এ সংকট যে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে, সে বিষয়েও সতর্ক করেছেন তারা। জেপিমরগ্যানের পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০২১ সালের শেষ নাগাদ যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্বের হার দাঁড়াবে ৪ দশমিক ৬ শতাংশ। আর ইউরো অঞ্চলের ক্ষেত্রে এ হার হবে ৮ দশমিক ৩ শতাংশ।

ব্রিটেনে গত দুই সপ্তাহে কল্যাণ ভাতার জন্য আবেদন করেছেন চাকরি হারানো প্রায় ১০ লাখ মানুষ, যা স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় ১০ গুণ। দেশটির পরিসংখ্যান অফিসের তথ্য অনুযায়ী, ২৭ শতাংশ ব্রিটিশ কোম্পানি স্বল্প মেয়াদে ব্যয় সংকোচনের অংশ হিসেবে তাদের কর্মী সংখ্যা কমিয়েছে।

স্পেন তো একদিক থেকে রেকর্ডই করে ফেলেছে। দেশটিতে বেকারত্বের হার দাঁড়িয়েছে ১৪ শতাংশ, যা উন্নত বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ। অস্ট্রিয়াতে এ হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২ শতাংশ, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সর্বোচ্চ।

উন্নত বিশ্বেই যখন এ অবস্থা, তখন অগ্রসরমান ও দরিদ্র অর্থনীতিগুলোর পরিস্থিতি আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশ্বজুড়ে বেকারত্ব যে হারে বাড়ছে, তাতে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর ওপর চাপ বাড়ছে, যেন তারা এমন প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে যাতে চাকরিচ্যুতরা ক্ষতিপূরণ

পান অথবা চাকরিদাতারা মহামারী শেষ হওয়া পর্যন্ত তাদের কর্মীদের ধরে রাখতে উদ্‌বুদ্ধ হন। ব্লুমবার্গ, টেলিগ্রাফ ও সিএনএন

বণিকবার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

এপ্রিল ০৫, ২০২০

গভীর সংকটের মুখে বৈশ্বিক কর্মসংস্থান

বিশ্ব অর্থনীতিতে নভেল করোনাভাইরাসের নেতিবাচক প্রভাব এরই মধ্যে পড়তে শুরু করেছে। মহামারীটির কারণে বৈশ্বিক জিডিপি সংকোচনের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। চাহিদা ও সরবরাহ ব্যব স্থার সংকটে ব্যবসায় মন্দা যাচ্ছে উৎপাদনমুখী করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর। একই অবস্থা আকা শসেবা ও পর্যটন খাতেও। সব মিলিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে বাজে মন্দা দেখার শঙ্কায় রয়েছে বিশ্ব অর্থনীতি। আর স্থবির অর্থনীতিতে বড় ধরনের সংকটে পড়বে বৈশ্বিক কর্মসংস্থান।

কর্মসংস্থানের সংকট অবশ্য এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে। ব্যয় সংকোচনের জন্য ধুঁকতে থাকা প্র তিষ্ঠানগুলো কর্মী ছাঁটাইয়ের নীতি নিয়ে এগোচ্ছে। এর কারণে চাকরি হারাচ্ছে লাখ লাখ মানুষ। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) সতর্ক করে বলেছে, করোনার প্রকোপ এখনই ঠেকানো না গেলে বিশ্বজুড়ে কাজ হারাবে প্রায় আড়াই কোটি মানুষ।

করোনার কারণে কর্মসংস্থান কতটা হুমকিতে রয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের দিকে তাকালেই তা পরিষ্কার হ বে। টেলিগ্রাফের একটি প্রতিবেদন বলছে, মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে দেশটিতে বেকারত্ব ভাতার আবেদন জমা পড়েছে প্রায় এক কোটি। এর মধ্যে ২৮ মার্চ পর্যন্ত এক সপ্তাহেই আবেদন করে ছেন ৬৬ লাখ মার্কিনি। অর্থনীতিবিদরা সতর্ক করে বলেছেন, লকডাউন পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হলে কেবল যুক্তরাষ্ট্রেই কর্মসংস্থান কমবে প্রায় দুই কোটি।

আরেকটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান দেয়া যাক। মার্কিন ব্যুরো অব লেবার স্ট্যাটিস্টিকসের তথ্য অনুযায়ী, ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্বের হার ছিল ৩ দশমিক ৫ শতাংশ, যা ছিল ৫০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। সেখান থেকে মার্চে সাত লাখের বেশি মার্কিনি চাকরি হারানোর কারণে দেশটিতে বেকারত্বের হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ দশমিক ৪ শতাংশ। অর্থাৎ করোনার ধাক্কায় মাত্র এক মাসেই যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্ব বেড়েছে প্রায় ১ শতাংশীয় পয়েন্ট। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের বিশ্লেষকদের পূর্বা ভাস বলছে, দেশটিতে কয়েক মাসের মধ্যেই বেকারত্বের হার ১৬ শতাংশে উন্নীত হবে, যা গত শ তাব্দীর ত্রিশের দশকের পর সর্বোচ্চ। গোল্ডম্যান স্যাকসের পূর্বাভাসও প্রায় একই কথা বলছে।

তাদের আশঙ্কা, শিগগিরই যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্বের হার ১৫ শতাংশে গিয়ে দাঁড়াবে। অবশ্য অর্থনীতি করোনার ধাক্কা সামাল দিতে পারলে এ হার ধীরে ধীরে কমবে।

শুধু যে যুক্তরাষ্ট্রই কর্মসংস্থান হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছে, তা নয়। জেপিমরগ্যান চেজ অ্যান্ড কোম্পানির অর্থনীতিবিদরা ধারণা করছেন, চলতি বছরের মাঝামাঝি নাগাদ উন্নত দেশগুলোয় বেকারত্বের হার ২ দশমিক ৭ শতাংশীয় পয়েন্ট বেড়ে যেতে পারে। এ সংকট যে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে, সে বিষয়েও সতর্ক করেছেন তারা। জেপিমরগ্যানের পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০২১ সালের শেষ নাগাদ যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্বের হার দাঁড়াবে ৪ দশমিক ৬ শতাংশ। আর ইউরো অঞ্চলের ক্ষেত্রে এ হার হবে ৮ দশমিক ৩ শতাংশ।

ব্রিটেনে গত দুই সপ্তাহে কল্যাণ ভাতার জন্য আবেদন করেছেন চাকরি হারানো প্রায় ১০ লাখ মানুষ, যা স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় ১০ গুণ। দেশটির পরিসংখ্যান অফিসের তথ্য অনুযায়ী, ২৭ শতাংশ ব্রিটিশ কোম্পানি স্বল্প মেয়াদে ব্যয় সংকোচনের অংশ হিসেবে তাদের কর্মী সংখ্যা কমিয়েছে।

স্পেন তো একদিক থেকে রেকর্ডই করে ফেলেছে। দেশটিতে বেকারত্বের হার দাঁড়িয়েছে ১৪ শতাংশ, যা উন্নত বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ। অস্ট্রিয়াতে এ হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২ শতাংশ, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সর্বোচ্চ।

উন্নত বিশ্বেই যখন এ অবস্থা, তখন অগ্রসরমান ও দরিদ্র অর্থনীতিগুলোর পরিস্থিতি আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশ্বজুড়ে বেকারত্ব যে হারে বাড়ছে, তাতে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর ওপর চাপ বাড়ছে, যেন তারা এমন প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে যাতে চাকরিচ্যুতরা ক্ষতিপূরণ পান অথবা চাকরিদাতারা মহামারী শেষ হওয়া পর্যন্ত তাদের কর্মীদের ধরে রাখতে উদ্‌বুদ্ধ হন। ব্লুমবার্গ, টেলিগ্রাফ ও সিএনএন

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন
৬ এপ্রিল, ২০২০

সিঙ্গাপুরে এক দিনে ২০ হাজার শ্রমিক কোয়ারেন্টাইনে

সিঙ্গাপুরে প্রায় ২০ হাজার প্রবাসী শ্রমিককে এক দিনে কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে। রবিবার দেশটিতে রেকর্ড সংখ্যক ১২০ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর এ পদক্ষেপ নিয়েছে দেশটির সরকার।

করোনা মোকাবেলায় দুটি ডরমিটরি-পোঙ্গল ডরমিটরি এবং তুকান ওয়েস্ট লাইট ডরমিটরি আগামী ১৪ দিনের জন্য আইসোলেটেড করা হয়েছে। বিভিন্ন কোম্পানিতে কাজের অংশ হিসেবে এই দুই ডরমিটরিতে প্রায় ২০ হাজার বিদেশি শ্রমিক বসবাস করেন।

ধারণা করা হচ্ছে, নতুন আক্রান্ত ১২০ জনের মধ্যে অধিক পরিমাণে বাংলাদেশি শ্রমিক আক্রান্ত হয়েছেন। এর আগে, এই দুই ডরমিটরি থেকে করোনাভাইরাসের আক্রান্ত রোগী শনাক্ত করা হয়েছে।

এদিকে, আগামী ১৪ দিন ২০ হাজার শ্রমিকের সব ধরনের চলাচলে ও রুমের বাহিরে যাওয়ার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। তাদের জন্য সিঙ্গাপুর সরকার সব ধরনের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করবে বলে জানায় দেশটির জনশক্তি মন্ত্রণালয়। এছাড়াও কোয়ারেন্টাইন থাকাকালীন সময়ে বেতনও প্রধান করা হবে এবং সকল ধরনের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রধান করা হবে।

শ্রমিকদের মধ্যে সবাইকে আলাদা করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। রবিবার পর্যন্ত সিঙ্গাপুরে মোট ১৩০৯ জন আক্রান্ত হয়েছেন এবং চিকিৎসা শেষ সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরেছেন ৩২০ জন। হসপিটালে চিকিৎসা নিচ্ছেন ৫৬৯ জন। এছাড়াও আইসিইউতে রয়েছেন ২৫ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের।

করোনাভাইরাস মোকাবেলায় নিরাপদ দূরত্বের বিষয়টি গুরুত্ব দিচ্ছে দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। এছাড়াও সকল প্রকার সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করা এবং নিজেকে নিরাপদ রাখার জন্য সবাইকে সর্তক করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে সিঙ্গাপুরের জনশক্তি মন্ত্রী জোসেফিন টিও বলেছেন, এই সকল ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হল সত্যিকার অর্থে সবার স্বাস্থ্য ও সুস্থতা নিশ্চিত করা। কেবল সিঙ্গাপুর নাগরিকই নয়, বিদেশি কর্মীরাও যারা এখানে আছেন, আমাদের অর্থনীতি এবং তাদের নিয়োগকারীদের সহায়তা করেন।

রবিবার তিনি এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, "আমরা বিদেশি কর্মীদের আশ্বাস্ত করতে চাই যে এই পদক্ষেপগুলো তাদের স্বার্থ এবং তাদের মঙ্গলার্থে নেওয়া হয়েছে।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

৫ এপ্রিল, ২০২০ ২২:২০

যশোরে গৃহবন্দী শ্রমজীবীদের পাশে বসুন্ধরা সিমেন্ট

যশোরে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের কারণে গৃহবন্দী অসহায় শ্রমজীবী ও নিম্নআয়ের মানুষের মধ্যেসহ সারা দেশব্যাপী খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত রেখেছে দেশের শীর্ষ স্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান বসুন্ধরা গ্রুপের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান বসুন্ধরা সিমেন্ট। করোনাভাইরাস মোকাবেলায় সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণার করার পর থেকে বিপাকে পড়েছেন শ্রমজীবী মানুষরা। দুর্ভোগ লাঘবে সরকারের পাশাপাশি এই কর্মহীন মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে বসুন্ধরা সিমেন্ট।

বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়েম সোবহান আনভীর-এর নির্দেশনায় বসুন্ধরা সিমেন্টের পরিবেশক ও কর্মকর্তারা এসব মানুষকে করোনাভাইরাস সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী ও স্যানিটাইজার বিতরণ অব্যাহত রেখেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় শনিবার যশোরে শতাধিকের ওপরে কর্মহীনদের চাল, ডাল, তেল, আটা, লবণ ও আলুসহ স্যানিটাইজার হাতে তুলে দেওয়া হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বসুন্ধরা সিমেন্টের পরিবেশক আশ্রাফুল ইসলাম লিটন, মো. আব্দুল কাদের ও মোশারফ হোসেন।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

৬ এপ্রিল, ২০২০

দেড় লাখ প্রবাসীকে ফেরত পাঠানোর চাপ

ঢাকায় চিঠি পাঠিয়েছে চার দেশ

বিশ্বে মহামারী আকার ধারণ করা করোনাভাইরাসের সংক্রমণের মধ্যেই প্রায় দেড় লাখ প্রবাসী বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠাতে চাপ দিয়েছে কয়েকটি দেশ। কমপক্ষে চার দেশের পক্ষ থেকে এ-সংক্রান্ত চিঠি পাঠানো হয়েছে বাংলাদেশে। মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশের পক্ষ থেকে তালিকাও পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছে সরকার। কীভাবে পরিস্থিতি সামলানো যায় সে ব্যাপারে চেষ্টা করছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়। যাদের ফেরত পাঠাতে চাওয়া হচ্ছে তারা আসলেই বাংলাদেশি কি না তা নিয়ে কাজ করছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। তবে আপাত পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীর যৌথ স্বাক্ষরে বিভিন্ন দেশের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠানো হচ্ছে। সরকার মনে করছে, প্রবাসীরা

দেশের সম্পদ। এ দুঃসময়ে তাদের পাশে দাঁড়ানো মানবিক দায়িত্ব। জানা যায়, গতকাল প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে এ-সংক্রান্ত বিষয়ে এক আন্তমন্ত্রণালয় বৈঠক হয়। বৈঠকে ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন, প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রী ইমরান আহমেদ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। বৈঠক শেষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন বলেন, 'খুব বেশি দেশ প্রবাসীদের ফেরত পাঠাতে আবেদন করেনি। মাত্র চার-পাঁচটি দেশ আবেদন করেছে। কিন্তু আমাদের সংখ্যা তো অনেক বেশি। একটি দেশও যদি হয়, অনেক লোক হয়ে যায়। এই দুর্দিনে কত জনকে ফেরত আনব তা নিয়ে আমরা আজ বসেছি। বুঝেশুনে বাস্তবতার নিরিখে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এ বিষয়ে আমরা বিভিন্ন দেশকে চিঠি দিয়ে বলব, আমাদের অসুবিধা, তোমাদেরও অসুবিধা। মানবাধিকার বিষয়টি সামনে এনে এদের তোমরা সাহায্য করেছ, আরও করো, তাহলে আমরা খুশি হব।' কোন কোন দেশ বাংলাদেশি নাগরিকদের ফেরত পাঠাতে চায় সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে মাত্র একটি দেশের কথা উল্লেখ করেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, 'কত বাংলাদেশি ফেরত পাঠাতে চায় এখনই সংখ্যা জানাতে চাই না। তবে একটি দেশের কথা বলতে পারি। মালদ্বীপের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমাকে ফোন করেছিলেন। তিনি বলেছেন, তার দেশে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি কর্মী আনডকুমেন্টেড। এখন যেহেতু তাদের পর্যটন বা রেস্টুরেন্টে কাজ চলছে না তাই শুধু বৈধদের তারা সাহায্য করছে। কিন্তু যারা আনডকুমেন্টেড আছেন, তাদের কষ্ট হচ্ছে। মালদ্বীপ সেখানে বিদেশি কর্মীদের নিবন্ধন করতে বলেছে। এদের মধ্যে অনেককেই ফেরত পাঠাতে পারে।' বিদেশে অবস্থানরত আনডকুমেন্টেড কর্মীর জন্যই এ সমস্যা বলে মনে করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'যেসব দেশ আমাদের জানিয়েছে বাংলাদেশিদের ফেরত না নিলে তাদের অসুবিধায় ফেলবে, তাদেরটাই আমরা প্রথমে ধরব। মূলত এসব আনডকুমেন্টেড কর্মীর জন্যই হচ্ছে।' পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আমরা এখন চাপের মুখে আছি। তবে সব দেশই চাপের মধ্যে আছে। সে জন্য এটি বড় সমস্যা নয়। কিন্তু কঠিন সময়ে আছি।' সভায় প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমেদ বলেন, করোনাভাইরাসের কারণে মানবিক বিবেচনায় কয়েকটি দেশ থেকে যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে বিপদগ্রস্ত বাংলাদেশি কর্মীদের দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে সভায় নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে কুয়েত থেকে ৩১৬ জন প্রবাসী বাংলাদেশিকে দেশে ফেরত আনা হবে। কুয়েতের সেই ফিরতি ফ্লাইটে ত্রাণ ও খাদ্যসামগ্রী পাঠানোরও সুপারিশ করা হয়। এ ছাড়া ইপিএসের আওতায় দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মরত ১৫০ জন কর্মী এবং সেখানে অধ্যয়নরত ২৬ জন শিক্ষার্থীকে আনতে বাংলাদেশ বিমানের একটি চার্টার্ড ফ্লাইট কোরিয়ায় পাঠানো হবে। মন্ত্রী আরও বলেন, যেসব প্রবাসীর ভিসার

মেয়াদ শেষ হয়েছে অথবা ইকামার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে, তাদের ভিসা/ইকামার মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট দেশের সঙ্গে জোর কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। কোনো কর্মী বিদেশে চাকরিচ্যুত হলে, অথবা নিয়োগকারী কোম্পানি যদি কর্মী ছাঁটাই করে, সে ক্ষেত্রে তাদের দেশে ফেরত না পাঠিয়ে সে দেশের অন্য কোনো কোম্পানিতে নিয়োগের জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে।' সভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশিদের যাচাই-বাছাই করে বাংলাদেশে ফেরত আনা হবে। তবে তাদের মধ্যে কেউ যদি গুরুতর অপরাধে জড়িত থাকেন, তাহলে তাদের ব্যাপারে অন্য কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। দেশে ফেরত আনা প্রবাসীদের বাধ্যতামূলকভাবে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হবে। আন্তমন্ত্রণালয় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহিবুল হক, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব মাসুদ বিন মোমেন, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সেলিম রেজা, সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মো. শহিদুজ্জামান, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মো. আসাদুল ইসলাম, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক মো. শামছুল আলম, ওয়েজ আরনার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক মো. হামিদুর রহমান, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন প্রমুখ।

বণিকবার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

এপ্রিল ০৭, ২০২০

ত্রাণ না পেয়ে রাস্তায় অনেক পরিবহন শ্রমিক

নভেল করোনাভাইরাস ঠেকাতে সাধারণ ছুটি চলছে দেশে। অফিস-
ব্যবসা বন্ধ। বন্ধ গণপরিবহনও। পরিবহন শ্রমিকরাও কর্মহীন। জেলা প্রশাসনকে ত্রাণ সরবরাহের নির্দেশ দেয়া হলেও অনেক জেলায়ই তা পাননি পরিবহন শ্রমিকরা। ত্রাণ না পাওয়ার অভিযোগ এসেছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের কাছ থেকে। ফেডারেশনের নেতারা জানিয়েছেন, ত্রাণ না পাওয়ায় জীবিকার তাগিদে অনেকেই রাস্তায় নামার চেষ্টা করছেন। এমন অবস্থায় করোনা ঠেকাতে মানুষের চলাচল নিয়ন্ত্রণে সরকারের কৌশল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তারা।

গতকাল এক বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও সাবেক নৌপরিবহন মন্ত্রী শাজাহান খান এবং সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক ওসমান আলী পরিবহন শ্রমিকদের না পাওয়ার বিষয়টি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তারা বলেন, কোটি কোটি মানুষকে পরিবহনের কাজে নিয়োজিত পরিবহন শ্রমিকরা দিনরাত কাজ করেন। গাড়ি চললে পরিবহন শ্রমিকদের সংসার চলে। সবসময় মানুষের সংস্পর্শে আসায় পরিবহন শ্রমিকদের স্বাস্থ্যঝুঁকিও বেশি। এদিকে উপার্জন বন্ধ থাকায় হাজার হাজার পরিবহন শ্রমিক মানবেতর জীবন যাপন করছেন। উপায়হীন হয়ে অনেক পরিবহন শ্রমিক রাস্তায় নামারও চেষ্টা করছেন। পরিবার-
পরিজন নিয়ে অর্ধাহারে-
অনাহারে থাকার যন্ত্রণা শ্রমিকদের কাছে করোনা সংক্রমণের ভয়ের চেয়ে বড় হয়ে উঠছে।

এমন অবস্থায় পরিবহন শ্রমিকদের জন্য বিশেষ বরাদ্দের আহ্বান জানিয়েছেন সংগঠনটির নেতারা। তারা বলছেন, অর্থনীতিকে সচল রাখতে পরিবহন শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করাটা জরুরি। ট্রেড ইউনিয়নগুলো থেকে তালিকা সংগ্রহ করে শ্রমিক পরিবারগুলোকে বিনা মূল্যে খাবার ও করোনা সুরক্ষা উপকরণ সরবরাহ করতে হবে।

পাশাপাশি শ্রমিকদের জন্য বিশেষ বরাদ্দেরও দাবি জানিয়েছেন তারা।

শ্রমিক নেতারা জানিয়েছেন, শ্রমিকদের একটি তালিকা ডিসিদের কাছে দেয়া হয়েছে। এছাড়া শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর কল্যাণ তহবিল থেকেও ত্রাণ দেয়া হবে। এছাড়া মালিক সমিতির পক্ষ থেকে শ্রমিকদের সাহায্য-
সহযোগিতা করা হচ্ছে। এই জাতীয় দুর্যোগে সড়ক পরিবহনসহ সব শ্রেণীর শ্রমিকদের শান্ত থেকে এবং নিয়ম মেনে নিজ নিজ এলাকায় অবস্থানেরও অনুরোধ জানিয়েছেন তারা।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিপুল পরিমাণ মানুষ পরিবহন পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত। টিকিট কাউন্টার পরিচালনা, রুট পরিচালনাসহ বিভিন্ন ধরনের কাজ করেন তারা। দেশের বিভিন্ন পরিবহন শ্রমিক সংগঠনের হিসাবে সারা দেশে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে পরিবহন শ্রমিকের সংখ্যা ৫০ লাখের বেশি।

খাদ্য সহযোগিতার পাশাপাশি সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের কাছে প্রণোদনাও দাবি করে আবেদন করেছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন। এছাড়া পরিবহন শ্রমিকদের জন্য ১০ টাকা কেজি চাল বরাদ্দ রাখার দাবি জানিয়ে গত ২৭ মার্চ সরকারের কাছে চিঠি দেয় সংগঠনটি। শ্রমিক ও শ্রমিক নেতাদের দাবি, এর কোনোটাই এখনো পর্যন্ত তারা পাননি।

The Financial Express

April 06, 2020 21:06:38

Fearing shrinking remittance inflow

The Covid-19 fallout may result in a significant fall in the coming months in the inflow of remittance, considered the lifeline of many rural families. This, experts say, amid slump in export earnings, will be another big shock for the Bangladesh economy.

Almost all the destinations of Bangladeshi migrant workers from where they send money back home are grappling with the coronavirus pandemic. A halt in economic activities with closure of most business establishments and shops has left the wage earners at lurch.

The migrant workers who already returned home may join to the growing army of the unemployed people while many of those staying abroad may face uncertainty in earning a living due to the slowdown. Some migrant workers said they are going through tough times with almost no income and surviving on borrowed money.

As the Bangladesh economy is already under stress, experts fear, a possible decline in remittance will not only hit the country's foreign exchange reserves but also threaten livelihoods of millions of rural families that depend on remittances.

In 2019, over 10 million Bangladeshis who stay in different countries, remitted US $18.32 billion. The Kingdom of Saudi Arabia (KSA) has long been the largest source of remittances, followed by the UAE, Qatar, Oman, Bahrain, Kuwait, Libya, Iraq, Singapore, Malaysia, the US and the UK. According to Bangladesh Bank data, the country received $2.58 billion remittance from Saudi Arabia in eight months of 2019-2020 fiscal year, as against $3.11 billion during the same period in 2018-2019.

In the said eight months, Bangladesh received $1.74 billion from the United Arab Emirates (UAE), $996.11 million from Kuwait, $814.05 million from Oman and $739.38 million from Qatar. Besides, Bangladeshis remitted $1.53 billion from the USA, $987.28 million from the UK, $869.70 million from Malaysia, $547.16 million from Italy, $312.41 million from Singapore and $37.54 million from Germany during the same period.

But most of these countries are now witnessing economic slowdown due to the coronavirus shutdown. Experts said despite a reasonable inflow of remittances in first half of the fiscal year, the latest trend is not encouraging as it is declining since January 2020. Remittance may fall further in the coming months as the UK, the USA, Italy, Spain and some Middle East countries are likely to see economic recession.

Many Bangladeshis will face difficulties in capturing new overseas jobs. It is not certain whether the migrant workers who returned home will get back their jobs abroad.

Since it is a global problem, the government cannot do much in this regard. However, it needs to maintain constant communications with manpower importing countries through proper channels so that Bangladeshi workers can find jobs once there is normalcy.

Many Bangladeshi expatriates run small business in different countries. But they had to suspend operations of their hotels and restaurants, beauty parlours etc. due to the coronavirus-induced shutdown. Companies also closed their factories that severely affected migrant workers' income. So, it is feared that the remittance inflow might fall in the days to come.

Around 50,000 people go abroad every month from Bangladesh for jobs but their number came down to zero in the past two months. Resumption of manpower export is almost unlikely in the next few months. Those who are still staying abroad find it hard to send money to their families due to the Covid-19 situation.

If the coronavirus prevalence prolongs, more workers will be laid off from their jobs in the destination countries. Experts recommend currency devaluation and diplomatic initiatives to protect the interests of the migrant workers. Most of them are worried about how their families would survive in the coming days.

Sarwar Md. Saifullah Khaled is a retired Professor of Economics and Vice Principal at Cumilla Women's Government College, Cumilla.

sarwarmdskhaled@gmail.com

এপ্রিল ০৭, ২০২০

নভেল করোনাভাইরাস ও আমাদের শ্রমবাজার

বিশ্বব্যাপী নভেল করোনাভাইরাসের কারণে অর্থনীতির চাকা শ্লথ হওয়ার ফলে স্বাস্থ্যঝুঁকি ছাড়াও পুরো বিশ্ব এখন বেকারত্ব আর দারিদ্র্যের শঙ্কায় বিপর্যস্ত। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার প্রাথমিক প্রাক্কলনে দেখা গেছে যে নভেল করোনাভাইরাসের কারণে ২৫ মিলিয়ন মানুষ বেকার হয়ে যেতে পারে এবং এর ফলে ৩ দশমিক ৪ ট্রিলিয়ন সমপরিমাণ ক্ষতি হতে পারে শ্রমিকের আয়ের (২৭ মার্চ, ২০২০)। বলা বাহুল্য, করোনার ভয়াবহতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সংখ্যা ঊর্ধ্বগামী হচ্ছে। আর এই মহামারী শেষ না হওয়া পর্যন্ত শ্রমবাজারের ওপর এর প্রকৃত প্রভাব বোঝা যাচ্ছে না। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বৈশ্বিক মন্দাসহ সামাজিক দূরত্ব পালনের ফলে সাময়িকভাবে কাজ হারিয়েছেন ও কাজ হারানোর ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন দিনমজুর, রিকশাচালক, গৃহপরিচারিকা, মুদি দোকানদার, ক্ষুদ্র ও অতি ক্ষুদ্র দৈনিক আয়নির্ভর ব্যবসার সঙ্গে জড়িত নিম্ন ও নিম্নমধ্যম আয়ের মানুষ।

শ্রমবাজারের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাতিষ্ঠানিক কাজে নিয়োজিতদের অনেকের আয় এ সময় খুব একটা ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের পরিস্থিতি ভিন্ন। ব্যতিক্রম থাকলেও সার্বিকভাবে বলা চলে যে অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজ নিম্ন উৎপাদক, নিম্ন মজুরির কাজ, যা অনেক ক্ষেত্রে অস্থায়ী ও ঝুঁকিপূর্ণও হয়ে থাকে। বাংলাদেশের শ্রমবাজারের পরিপ্রেক্ষিতে ৮৫ শতাংশের বেশি শ্রমিক যেখানে অনানুষ্ঠানিক খাতে জড়িত, সেখানে এ সংকটকালে সবচেয়ে আয় ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন এ সব খাতের শ্রমিকরা। খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে যদি আমরা যাই, তবে এখনো ৪০ শতাংশের বেশি শ্রমিক রয়েছেন কৃষি খাতে, ২০-
২১ শতাংশ শিল্পে আর ৩৯ শতাংশ কর্মী রয়েছেন সেবামূলক খাতে। আপাতদৃষ্টিতে কৃষি খাতে, যার সিংহভাগই (৯৫ শতাংশ) অপ্রাতিষ্ঠানিক, কাজ হারানোর ঝুঁকি কম মনে হলেও চাহিদার ব্যাপক সংকট ও বাজারজাতের জটিলতার কারণে খামারকেন্দ্রিক কৃষি খাতে নিয়োজিতরা আয় সংকটে পড়তে পারেন। খামারবহির্ভূত কৃষিতে নিয়োজিতদের ক্ষেত্রে এ সংকট আরো গভীর হতে পারে। এছাড়া ধান কাটার এ মৌসুমে মূলত উত্তরাঞ্চলের অভ্যন্তরীণ অভিবাসী শ্রমিকের সংকট একদিকে যেমন কৃষকদের শ্রমিকের ঘাটতি তৈরি করতে পারে, অন্যদিকে অভিবাসী শ্রমিকদের জীবিকা নির্বাহও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে আমাদের শিল্প খাতের প্রায় ৯০ শতাংশই অপ্রাতিষ্ঠানিক, কারণ নির্মাণকাজের বড় অংশের শ্রমিকসহ প্রচুর শ্রমিক ক্ষুদ্র ও ভাসমান ব্যবসার সঙ্গে জড়িত, এসব কাজের একটি বড় অংশ শুধু অপ্রাতিষ্ঠানিকই নয়, অনেক ক্ষেত্রেই সাময়িক কিংবা দৈনিক বেচাকেনাভিত্তিক। সে কারণে বর্তমান পরিস্থিতিতে এ ধরনের কাজে নিয়োজিত অনেকে কাজ হারিয়ে ফেলতে পারেন এবং সাময়িকভাবে বেকার হয়ে পড়তে পারেন। সেবা খাতের একটি বড় অংশ (২৮ শতাংশ) প্রাতিষ্ঠানিক হলেও বাকি ৭২ শতাংশের মধ্যে রয়েছে অনেক ক্ষুদ্র ও নিম্ন আয়ের সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, সামাজিক দূরত্বের এ সময়ে যারা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এসব ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, সেবাদানকারীর অনেকেই ঢাকাসহ বিভাগীয় শহরগুলোয় কাজ করেন, তাই এ সময়ে তাদের অনেকে সাময়িকভাবে শহর ছেড়ে নিজ নিজ গ্রামে চলে গেছেন। একটা সময় পর্যন্ত এই গ্রামে ফেরা মানুষগুলো তাদের সীমিত সঞ্চয় ও পারিবারিক আয়ের মাধ্যমে চলতে পারলেও এ পরিস্থিতি বেশিদিন চললে তাদের অনেকের পক্ষেই দৈ

নন্দিন ব্যয়ভার বহন করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে এবং সেক্ষেত্রে একটা বড় সময়ের জন্য তারা বেকার হয়ে যেতে পারেন। এছাড়া এদের অনেকে আবার শহরে থেকে গেলেও ঘরভাড়াসহ দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানো তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে।

উদ্ভূত পরিস্থিতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে চাহিদার সংকট। দেশীয় বাজারে সামাজিক দূরত্ব ছাড়াও নিম্ন ও নিম্নমধ্যবিত্ত ক্রেতার আয় হ্রাস, রেমিট্যান্সের নিম্নমুখী গতি-
প্রকৃতি অনেক পণ্যের চাহিদার ক্ষেত্রে বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে, বিশেষত বিভিন্ন বিলাস দ্রব্য ও সেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের ক্ষেত্রে (যেমন কাপড়ের দোকান, পার্লার, ছোট-
বড় খাবারের দোকান) এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এছাড়া বাংলা নববর্ষ কিংবা এ সংকট দীর্ঘায়িত হলে ঈদের মতো উৎসবকেন্দ্রিক বেচাকেনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীসহ অনেক বড় বড় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। চাহিদা সংকটের আরেকটি দিক হচ্ছে, বৈশ্বিক বাজারের মন্দাবস্থা, যার কারণে তৈরি পোশাকের মতো রফতানিমুখী শিল্প-
কারখানাগুলোর উৎপাদন বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়তে পারে। ফলে এসব শিল্পপ্রতিষ্ঠানে যারা কাজ করেন, তাদের কাজ হারানোর সম্ভাবনা রয়েছে। এক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে শুধু মজুরিই নয়, শ্রমিকদের নিরাপত্তাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে এমন কোনো সিদ্ধান্ত যেন কখনই নেয়া না হয়, সেদিকে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন।

তবে সার্বিকভাবে বলা চলে যে সঠিক কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে কর্মসংস্থান আর আয়ের এ বিপর্যয় করোনা পরিস্থিতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অনেকটাই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। নভেল করোনাভাইরাসের কারণে স্বাস্থ্যঝুঁকি এড়াতে সামাজিক দূরত্বের অবশ্যই কোনো বিকল্প নেই, তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক ক্ষতি মেনে নিতেই হবে। তবে নিম্ন ও নিম্নমধ্যম আয়ের শ্রমজীবী মানুষের ক্ষতি লাঘব করার জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট নীতিসহায়তা। সরকারের তরফ থেকে এর মধ্যে রফতানিমুখী শিল্পগুলোকে সহায়তা করার জন্য ৫ হাজার কোটি টাকা প্রণোদনা ছাড়াও নিম্ন আয়ের মানুষদের সহায়তার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ ঘোষণা করা হয়েছে (৭২,৭৫০ কোটি টাকার প্রণোদনা), যা বর্তমান সংকট নিরসনে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এর আওতায় গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক হারে সহায়তা কর্মসূচির প্রসার, শহরের বস্তিগুলোয় নিয়মিতভাবে বিনা মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বিতরণ, বাড়িভাড়া মওকুফ ছাড়াও স্বল্প মূল্যে বড় পরিধিতে রেশন ব্যবস্থা বাড়ানো যেতে পারে। অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মধ্যম শিল্পগুলোর জন্য কাঁচামালের ওপর শুল্ক মওকুফ, স্বল্প সুদে ঋণের মতো নীতি সহায়তার মাধ্যমে ওইসব শিল্পে নিয়োজিত উদ্যোক্তা ও শ্রমিকদের সহায়তা করা যেতে পারে, যাতে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বড় ধরনের সংকট না হয়। ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে ফেরত প্রবাসী যারা কাজ হারাতে পারেন, তাদের জন্য প্রশিক্ষণ, স্বল্প সুদে বিশেষ আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে তাদের দেশীয় শ্রমবাজারে সংশ্লিষ্ট করার জন্য প্রণোদনার কথাও ভাবতে হবে। এছাড়া আয় বিপর্যয়ের কারণে নিম্ন আয়ের অনেকে যারা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে দরিদ্র ছিলেন না, তাদের অনেকেই দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যেতে পারেন। সেক্ষেত্রে আমাদের দারিদ্র্য বিমোচনের কর্মকৌশলের ক্ষেত্রেও পরিবর্তনের প্রয়োজন হতে পারে। দীর্ঘমেয়াদি শ্রমবাজারের এ ঝুঁকি এড়াতে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য প্রয়োজন শ্রমিকের দ

ক্ষতা বৃদ্ধি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-ব্যক্তি খাত-
শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিকল্পিত দক্ষতার সমন্বয়সহ শ্রমবাজারের আধুনিকীকরণ ও উৎপাদন ব্যব স্থার বহুমুখীকরণ।

ড. সায়মা হক বিদিশা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

এপ্রিল ০৮, ২০২০

৬০ লাখ নার্স সংকটে বিশ্ব: ডব্লিউএইচও

বিশ্বজুড়ে নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণজনিত কভিড-১৯-
এর প্রাদুর্ভাবের মধ্যেই বিশ্বে প্রয়োজনের তুলনায় প্রায় ৬০ লাখ নার্স সংকটের কথা জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। নার্সিং নাউ এবং দি ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অব নার্সেসের (আইসিএন) সঙ্গে এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে জাতিসংঘের স্বাস্থ্যবিষয়ক সংস্থাটি।

খবর এএফপি।

ডব্লিউএইচওর প্রধান টেড্রোস অ্যাডহ্যানম বলেন, বিশ্বের মোট স্বাস্থ্যকর্মীর মধ্যে অর্ধেকেরও বে শি হলেন নার্স। তারাই আমাদের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার মেরুদণ্ড। বর্তমানে কভিড-১৯-
এর বিরুদ্ধে লড়াইয়েও তারা সামনের সারিতে কাজ করছেন। এ পরিস্থিতিতে তাদের সব ধরনের সহযোগিতা করতে হবে, যাতে তারা পৃথিবীবাসীকে সুস্থ রাখতে পারেন।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমান বিশ্বে নার্স রয়েছেন ২ কোটি ৮০ লাখেরও কম। ২০১৮ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে নতুন করে এ পেশায় এসেছেন ৪৭ লাখ মানুষ। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে বৈশ্বিকভা বে ৫৯ লাখ নার্সের ঘাটতি রয়েছে। বিশেষ করে আফ্রিকা, দক্ষিণ-
পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকার কিছু অংশে এ সংকট আরো তীব্র হচ্ছে। এ অব স্থায় প্রতিবেদনটিতে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোয় নার্সের সংখ্যা বৃদ্ধিতে নার্সিংবিষয়ক শিক্ষণ এবং চাকরি ও নেতৃত্ব সৃষ্টিতে বিনিয়োগের ওপর জোর দিতে বলা হয়েছে।

আইসিএনের প্রধান নির্বাহী হাওয়ার্ড ক্যাটন বলেন, যেসব অঞ্চলে নার্সের সংখ্যা কম, সেখানে সংক্রমণ, চিকিৎসা ত্রুটি এবং মৃত্যুহার বেশি। তাছাড়া অপ্রতুলতা বর্তমানে নার্সদের ওপরে অতি রিক্ত চাপ সৃষ্টি করছে। এ অবস্থায় বৈশ্বিক মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে স্বাস্থ্যকর্মীদের জরুরি ভি ত্তিতে ভাইরাস টেস্টের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন নার্সিং নাউয়ের মেরি ওয়াটকিংস। তিনি বলেন, প্রচুরসংখ্যক স্বাস্থ্যসেবা কর্মী আছেন, যারা মনে করছেন যে তারা সংক্রমণের শিকার হয়েছেন।

ফলে তারা কাজে যেতেও ভয় পাচ্ছেন। আর তারা যদি সংক্রমিত না-
ও হয়ে থাকেন, সেটি প্রমাণের জন্যও তাদের কাছে কোনো উপায় নেই।

আশঙ্কার বিষয় হলো, এরই মধ্যে ইতালিতে কভিড-১৯-
এর লড়াইয়ে ২৩ জন নার্স মারা গেছেন বলে জানিয়েছেন হাওয়ার্ড ক্যাটন। তার মতে, বিশ্বজুড়ে এ সংখ্যা ১০০-
এর আশপাশে। ক্যাটন বলেন, ইতালিতে স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে সংক্রমণের হার বর্তমানে ৯ শতাংশ। অর্থাৎ প্রতি ১০০ জনে নয়জন স্বাস্থ্যকর্মী সেবা দিতে গিয়ে কভিড-১৯-
এ আক্রান্ত হচ্ছেন। অন্যদিকে স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে এ সংক্রমণের হার আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে স্পেনে। দেশটিতে এ সংক্রমণের হার ১৪ শতাংশ।

তিনি আরো জানান, বিশ্বজুড়েই বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্যকর্মীরা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য ও নিন্দনীয় আক্রমণের শিকার হচ্ছেন। তাদের কাজের বিষয়ে অনেকেরই কোনো ধারণা নেই। তাছাড়া অনেক দেশেই তাদের নিরাপত্তার বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না। তবে কিছু দেশে নার্সদের কাজের সমাদর বাড়ছে বলে জানান ক্যাটন। তার মতে, সেবার গুরুত্ব বিবেচনায় ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নার্সিং আরো আর্ষণীয় পেশা হয়ে উঠতে পারে।

এদিকে ওয়াটকিংস বলেন, কভিড-১৯-
এর পরিস্থিতির আগে এমনকি ধনী দেশগুলোও তাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যাপ্ত নার্স তৈরি করছিল না। তারা এক্ষেত্রে নির্ভরশীল ছিল অভিবাসনের ওপর, যা দরিদ্র দেশগুলোয় সংকট আরো তীব্র করে তুলেছে। বর্তমানে বিশ্বের ৮০ শতাংশ নার্স বৈশ্বিক জনসংখ্যার ৫০ শতাংশকে সেবা দিচ্ছে বলে জানান ওয়াটকিংস। তার মতে, নার্সের জন্য ধনী দেশগুলোকে ফিলিপাইন ও ভারতের ওপর নির্ভর করতে হতে পারে। তেমন হলে ভারতে ব্যাপক নার্স সংকট সৃষ্টি হবে।

বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

এপ্রিল ০৮, ২০২০

পর্যবেক্ষণ

সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সাহায্যবঞ্চিত থাকলে অর্থনীতি গতি হারাবে

প্রাণঘাতী নভেল করোনাভাইরাস রোগটি সারা বিশ্বে এক মহা আতঙ্ক হিসেবে দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশ এর ব্যতিক্রম নয়। প্রতিদিন বিশ্বের ১৯০টি দেশের মতোই বাংলাদেশেও সংক্রমিত লোকের সংখ্যা বাড়ছে। ব্যবসা-বাণিজ্য-অর্থনীতি স্থবির। আমদানি-
রফতানি বন্ধ। রেমিট্যান্সে ধস নেমেছে। মিল-

ফ্যাক্টরি, কলকারখানা অচল। মানুষ সব গৃহবন্দি। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কেউ ঘরের বাইরে যা চ্ছে না।

সাধারণ মানুষ কষ্টে পড়েছে। তাদের রোজগার নেই। অনেকের বেতন-
ভাতা বন্ধ। এ রকম এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়ে সরকার দেশের অর্থনীতিকে সচল রা খার উদ্দেশ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সিদ্ধান্তটি রফতানিমুখী শিল্পের জন্য। অন্তত ৮ ০ শতাংশ পণ্য যেসব কারখানা রফতানি করে, সেগুলোর জন্য সরকার একটা প্রণোদনার কথা ঘোষণা করেছে। এর থেকে দেখা যায়, সরকার তৈরি পোশাক শিল্পসহ অন্যান্য রফতানিমুখী শি ল্পে কর্মরত শ্রমিকদের তিন মাসের বেতন-
ভাতা দেবে। এর পরিমাণ ধরা হয়েছে ৫ হাজার কোটি টাকা। এটা ঋণ হিসেবে কারখানা/শিল্পের মালিকরা পাবেন এবং তা মোট দুই বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। 'সার্ভিস চার্জ' হবে মাত্র ২ শতাংশ—
সুদ নয়। সরকারের এ সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাই। সঠিক সময়ের সঠিক পদক্ষেপ এটি। লাখ লা খ শ্রমিককে এছাড়া বাঁচানো সম্ভব নয়, সম্ভব নয় রফতানিমুখী শিল্পকে বাঁচানো। আমার প্রশ্ন এস বে নয়। প্রশ্ন অন্যত্র। রফতানিমুখী শিল্পের মালিকরা, তৈরি পোশাক শিল্পের মালিকরা কি নিজেরা তাদের নিজেদের টাকা থেকে শ্রমিকদের বেতন-
ভাতা তিন মাস দিতে পারতেন না? তাদের কি এ টাকা ঋণ হিসেবে নেয়ার এতই প্রয়োজন ছিল? এ ৫ হাজার কোটি টাকা সরকার অন্যভাবে ব্যয় করতে পারত না কি, বিশেষ করে এ জরুরি সম য়ে। আমার কাছে এসব প্রশ্নের কোনো জবাব নেই। তবে এ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে আমাদে র সামাজিক ও প্রাত্যহিক জীবনে কী ঘটছে, তার দু-একটা লজিক দেয়া যায়।

'মুজিব বর্ষ' শুরু হওয়ায় পরপর সময়ে এক জায়গায় আমরা কয়েক বন্ধু বসা। চুটিয়ে সেখানে আড্ডার অছিলায় আলোচনা হচ্ছিল অনিশ্চয়তার ওপর, ভবিষ্যতের ওপর, মানুষের অসহায়ত্বে র ওপর। এক পর্যায়ে এক বন্ধু বললেন, তার স্ত্রী সবেতনে তার 'বুয়া' দুজনকে বিদায় দিয়ে বাড়ি তে থাকতে বলেছেন। একই খবর ড্রাইভারদেরও। সব বন্ধুই দেখলাম ড্রাইভারদের বিদায় করে দি য়েছেন। অবশ্যই মাসের বেতনসহ। আমার একটু খটকা লাগল। মনে মনে প্রশ্ন, আমরা তো সাধা রণভাবে বুয়া ও ড্রাইভারদের প্রতি এত সদয় ও উদার নই। তাদের সঙ্গে দরকষাকষি লেগেই থা কে। তাদের বেতন বাড়াতে গিয়ে, মূল্যস্ফীতির দিনেও আমরা কার্পণ্যই করি। কিন্তু নভেল করো নাভাইরাস নামীয় বিশ্বদানবের মুখোমুখি হয়ে আমরা আজ পরিবর্তিত। আমাদের মধ্যেই মানবি ক দিকগুলো জাগ্রত হয়েছে। যেমন হতো পাকিস্তান আমলে। মানুষের দুর্দিনে আমরা রাস্তায় রা স্তায় গান গেয়ে ত্রাণ সংগ্রহ করেছে। 'ভিক্ষা দাও হে পুরবাসী'—
অনেকেরই গানের সেই কলি দুটি মনে থাকার কথা। সত্তরের ভয়ংকরী জলোচ্ছ্বাসের পর ত্রাণে গিয়েছি আমরা। মানুষ স্বতঃফূর্তভাবে সাহায্য দিয়েছে। গরিবের উপকারে নেমে পড়েছে। এসব কথা মনে করতে করতে একটা অনুকরণযোগ্য উদাহরণ পেয়ে গেলাম। সরকারের একজন গুরু ত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারক আমাকে বললেন তার এক মর্মস্পর্শী উদাহরণের কথা। পাবনা অঞ্চলের এক ব্যবসায়ী, ব্যবসায়ী মানে তৈরি পোশাক শিল্পের ব্যবসায়ী এক কাজ করেছেন। তিনি নিজের প কেট থেকে তার কারখানার শ্রমিকদের দুই মাসের বেতন দিয়ে ছুটি দিয়েছেন। প্রয়োজনে আগা মী দিনে তিনি আরো দেবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন। এদিকে প্রায় প্রতিদিনই খবরের কাগজে তরুণদের মানবতাধর্মী নানা কাজের নজির দেখতে পাচ্ছি। তারা বিনা পয়সায় দুস্থ মানুষের মধ্যে চাল-ডাল, লুন-

তেল, সাবান ইত্যাদি বিতরণ করছেন। এ ধরনের উদাহরণের কথা পাঠ করে যারনারনাই আশ্বস্ত হই। না, পৃথিবী শেষ হয়ে যায়নি। এ প্রেক্ষাপটেই যখন তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকদের বেত নের টাকা সরকার দিচ্ছে বলে শুনি, তখন থমকে দাঁড়াই, দাঁড়াতেই হয়। আমাদের তৈরি পোশাক খাতের মালিকরা, রফতানিমুখী শিল্পের মালিকরা প্রায় প্রত্যেকেই ধনাঢ্য ব্যক্তি। তারা সব ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করেন, তারা ব্যাংক-বীমা-আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মালিক। তারাই আমদানি-রফতানি ব্যবসার মালিক। রাজনীতি, ক্ষমতা, কর্তৃত্বও এখন তাদের হাতের মুঠোয়। তারা আমাদে র ভাগ্য-বিধাতা। দেশে-বিদেশে তাদের কত সহায়-সম্পদ আছে, তার কথা খবরের কাগজে পড়ি। এমন দেশপ্রেমিক ব্যবসায়ীরা কি তাদের নিজের সংকট থেকে তিন মাসের বেতন শ্রমিকদের দিতে পারতেন না? এতে কি তাদের গাঁটে খুব বেশি টান পড়ে যেত? যারা তাদের কারখানা সচল রেখে বছরের পর বছর ধরে ব্যবসায়ীদের ভাগ্য গড় তে সাহায্য করছেন, সেই শ্রমিকদের কি রফতানিমুখী শিল্পের মালিকরা তিন মাসের বেতন দিতে পারতেন না? এ খাতে তিন-চার হাজার কারখানা আছে। যদি সচল কারখানা দুই হাজারও ধরে নিই, তাহলে ৫ হাজার কোটি টাকা কি তাদের কাছে খুবই বেশি? তারা কি শ্রকিদের বেতনের টাকা দিয়ে সরকারের কাছে অন্য ধরনের সাহায্য চাইতে পারতেন না? মুশকিল হচ্ছে শ্রমিকদের জন্য বিনা সুদে ঋণ নিয়েও তারা আরো অনেক সুযোগ-সুবিধা চাইবেন, এর আলামত আমরা পাচ্ছি।

রফতানিমুখী শিল্পের মালিকদের শ্রমিকের বেতন-ভাতা বাবদ যে ঋণ সরকার দিচ্ছে, তাতে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ আছে। ঋণের টাকা মালি কদের হাতে দেয়া হবে না। এ বেতনের টাকা সরাসরি চলে যাবে শ্রমিকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। যাদের ব্যাংক হিসাব নেই তাদের বিকাশের মাধ্যমে টাকা দেয়া হবে। এ পদক্ষেপ কেন? দৃশ্যতই এ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে ঋণের টাকার সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে। তা না হলে এমনও হতে পারত, অনেক মালিক ওই টাকা থেকে অন্য খরচ নির্বাহ করতেন। বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঋণের টাকা দেয়ার আগে যেসব বিধি অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছে, তা অক্ষরে অক্ষরে পাল ন করা হলে সব টাকা শ্রমিকদের হাতেই যাবে। এতে বাজারে চাহিদা (ডিমান্ড) অক্ষুণ্ন থাকবে। ধনীর হাতে টাকা গেলে তা বাজারে চহিদা সৃষ্টি করে না, এ কথা মনে রাখতে হবে। এখানে আলো চ্য বিষয় হচ্ছে টাকার ‘সদ্ব্যবহার’। বোঝা যাচ্ছে সরকারকে অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য সচল করে তুলতে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করতে হবে। এসব টাকার সদ্ব্যবহার করার কাজ হবে খুবই জরুরি। বাজারে টাকা যাচ্ছে। সমপরিমাণে যদি উৎপাদন বা সেবা না বা ড়ে, তাহলে কিন্তু মূল্যস্ফীতির ঝুঁকি থেকে যাবে। আগামীতে এমনিতেই শত সমস্যা দেখা দেবে। এর মধ্যে মূল্যস্ফীতি ঘটলে সব ভণ্ডুল হয়ে পড়বে। দেখা যাচ্ছে সরকার এরই মধ্যে ত্রাণের কা জ শুরু করেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কয়েকটি পদক্ষেপও গৃহীত হয়েছে। যেমন ঋণের কিস্তির টাকা আগামী তিন মাস না দিলেও ওই ঋণ ‘খেলাপি ঋণ’ হিসেবে চিহ্নিত হবে না। এ সুযোগটি মনে হচ্ছে মোটামুটি ঢালাওভাবেই দেয়া হয়েছে। তা হোক। কিন্তু এ সুযোগের/সুবিধার সদ্ব্যবহার আগামী দিনে নিশ্চিত করতে হবে। ‘ঋণখেলাপ’ সমস্যার ঝুঁকি থেকে ব্যবসায়ী মুক্ত হলেন, অথচ ভবিষ্যতে উৎপাদন বাড়ল না, সেবার পরিধি বাড়ল না, তা হলে তা হবে আরেকটি বিপদ। এরই মধ্যে ত্রাণের কাজ নি য়ে বরাবরের মতো নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। একটি দৈনিকের খবরের শিরোনাম দেখলাম। শিরো নামটি হচ্ছে ‘অপরিকল্পিত বরাদ্দে অপচয় ও বদনাম’। আলোচ্য খবরটিতে বলা হচ্ছে ‘উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে প্রকৃত দুস্থ মানুষের সংখ্যা ও তাদের প্রয়োজনীয় ত্রাণের চাহিদার বিপ

রীতে বরাদ্দের পরিমাণ অপ্রতুল। কোনো কোনো ইউনিয়নে যেখানে কয়েক হাজার দুস্থ মানুষ র
য়েছে, সেখানে বরাদ্দকৃত খাদ্যসামগ্রী বণ্টন করা সম্ভব হচ্ছে মাত্র ১০০-
১৫০ জনকে।' এসব সংবাদ খারাপ সংবাদ। সারা দেশে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে সরকারের বদনাম হবে বলে কাগজটি সরকারকে সতর্ক করে দিয়েছে। বলা বাহুল্য, সদ্ব্যবহারের ইস্যু বাদেও আরো জরুরি দুটো বিষয় আছে। দেশে রফতানিমুখী শিল্প বাদেও আরো শিল্প-
কারখানা আছে। প্রকৃত পক্ষে অনানুষ্ঠানিক খাতেই বেশি কারখানা-ব্যবসা-
কাজ ইত্যাদি। লোকও বেশিসংখ্যক সেখানেই কাজ করে। এ অবস্থায় সাহায্যের হাত ওইদিকেও বাড়িয়ে দেয়া একান্ত জরুরি। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে শ্রমিক সংখ্যা অনেক। সেখানে বিনিয়োগও ক
ম নয়। ওইদিকেও নজর দেয়া দরকার। দেশে যত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সংঘঠিত হয়, তার হিসাব সরকারের কাছে আছে। এরা প্রণোদনার বাইরে থাকলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ থাকবে সাহায্য বঞ্চিত। মুশকিল হচ্ছে এর বাইরেও থাকবে অনেক লোক, যারা মধ্যবিত্ত বলে পরিচিত। এরা কারো কা
ছে হাত পাততে পারে না। আগামী বাজেটের কাজ চলছে। ওই বাজেটে তাদের দিকেও নজর দি
তে হবে। ক্রেতা যারা, ভোক্তা যারা, যারা বাজারের মূল শক্তি, তাদের প্রতিও সরকারকে সদয় থাক
তে হবে। বাজেট বড় বেশি ব্যবসায়ীবান্ধব হয়ে যাচ্ছে। অথচ তা হওয়া উচিত ব্যবসাবান্ধব। ব্যবসা
য়ীবান্ধব বাজেট করার পক্ষে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও সাধারণ মানুষ অনেক সেবা থেকে বঞ্চিত হ
চ্ছে। আমি মনে করি, সরকারকে আগামী দুই বছরের হিসাব ধরে এগোতে হবে। যে ক্ষয়ক্ষতি হ
বে, তা যেন দুই বছরের মধ্যে পুষিয়ে আমরা লাভে থাকতে পারি, তার ব্যবস্থার কথা ভাবতে হবে। দি ইকোনমিস্টের এক জরিপে আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধির ওপর এক দুশ্চিন্তার খবর ছাপা হয়েছে। সরকার আশা করি এ সম্পর্কে সজাগ। সামনে পহেলা বৈশাখ, তারপর পবিত্র রমজান মাস এবং এর পরই বাজেট। এপ্রিল-
জুন সময়টি হচ্ছে অর্থবছরের শেষ তিন মাস। এমনিতেই বছরটি ভালো যাচ্ছিল না। রাজস্ব কম। সরকারকে ব্যাংক থেকে প্রচুর ঋণ করতে হচ্ছে। আমদানি-
রফতানির পরিমাণ কম। রেমিট্যান্সও এখন কমতে শুরু করেছে। বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ পরিমিত—
অধিকতর কোনো ঝুঁকি সামলানোর মতো অবস্থায় তা নেই। অতএব খুব সাবধানে এগোতে হবে। বিভিন্ন 'চেম্বার অব কমার্স' যেসব দাবি নিয়ে আসছে, তার প্রতি সম্পূর্ণ নজর দিতে হলে সরকার চালানো অসম্ভব হয়ে পড়বে। তারা শুধু চাইছেই। কী কী অবদান তারা রাখবে, তার কথা বলছে না। মুশকিল হচ্ছে ব্যবসায়ীরা বাদেও দেশে ১৬ কোটি মানুষ আছে। তাদের বাঁচিয়ে রাখাও সরকারেরই দায়িত্ব। এ 'গোল্ডেন সিন' কীভাবে রক্ষিত হয়, তাই দেখার বিষয়। ব্যবসায়ীদের যে অবদান ও ভূমিকার কথা বললাম, তার একটা নজির প্রায়ই দেখি। এবারও দেখছি। অনেক বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করে ছবি তুলছেন। এখানেও কথা আছে। ১০০ টাকা দান করলে এতে সরকারের টাকাই থাকে কমপক্ষে ৩৫-৪০-
৪৫ শতাংশ। দান না করলে কোম্পানির মুনাফা হতো। তার ওপর সরকার কর পেত। তার পরও কথা আছে। যেকোনো কোম্পানির শেয়ারে, ব্যাংক-বীমা-
আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের মধ্যে সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের পুঁজিই বেশি। তার অর্থ দান যাচ্ছে সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের পকেট থেকে। দান না করলে তারা বেশি লভ্যাংশ পেতেন। এ লুকোচুরির মধ্যে মহাসংকটের দিনে বড় বড় ব্যবসায়ীর অবদানের কথাটি ন্যায্যতই আলোচনায় আসে না কি?

ড. আর এম দেবনাথ: অর্থনীতি বিশ্লেষক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষ

বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

এপ্রিল ০৮, ২০২০

তৈরি পোশাক রফতানি মার্চে কমেছে ২৭%

বৈশ্বিক মহামারী কভিড-১৯-
এর প্রাদুর্ভাবে দেশের তৈরি পোশাক খাতের রফতানি গন্তব্যে দেশগুলোর প্রায় সবকয়টিই এখন আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ লকডাউনে। একের পর এক ক্রয়াদেশ বাতিল ও স্থগিতের পাশাপাশি নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে বাংলাদেশেও গত ২৬ মার্চ থেকে চলছে অঘোষিত লকডা উন। এ পরিস্থিতিতে রফতানি কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। পোশাক খাতের উৎপাদন ও রফতা নিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ জানিয়েছে, মার্চে বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাকের রফতানি কমেছে ২৭ শতাংশ।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) থেকে সংগৃহীত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে বিজিএমইএ জানিয়েছে , মার্চে বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক রফতানি হয়েছে ১৯৭ কোটি ২২ লাখ ৪০ হাজার ডলার মূ ল্যের। এর আগে গত বছরের একই সময়ে এ রফতানির পরিমাণ ছিল ২৬৯ কোটি ৫ লাখ ৪০ হা জার ডলার। এ হিসাবে রফতানি কমেছে ৭১ কোটি ৮৩ লাখ ডলার বা ২৬ দশমিক ৭০ শতাংশ।

প্রসঙ্গত, চীনের উহানে কভিড-১৯-
এর প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় গত ডিসেম্বরের শেষে। ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে তা বিশ্বের অধিকাং শ দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এ প্রেক্ষাপটে চলতি বছরের জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারিতেও তৈরি পোশাকের র ফতানি ছিল কমতির দিকে। এ ধারা অব্যাহত ছিল মার্চেও।

চীনে নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ছড়ানোর পর দেশটি থেকে কাঁচামাল আনতে পারছিলে ন না তৈরি পোশাক খাতের উৎপাদনকারীরা। কারণ করোনার প্রভাবে দেশটির বাণিজ্যিক কার্য ক্রম সে সময় পুরোপুরি বন্ধ হয়ে পড়ে। ফলে শুরুতেই কাঁচামাল সরবরাহ সংকটে পড়ে যায় তৈ রি পোশাক খাত। কারণ দেশের তৈরি পোশাক খাতের ওভেন পণ্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কাপ ড়ের আনুমানিক ৬০ শতাংশই আমদানি হয় চীন থেকে। অন্যদিকে নিটওয়্যারের ক্ষেত্রে চীন থে কে কাঁচামাল আনতে হয় আনুমানিক ১৫-
২০ শতাংশ। পরবর্তী সময়ে ধীরগতিতে হলেও কাঁচামাল সরবরাহ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু করে। কিন্তু এ মুহূর্তে চাহিদা সংকট মোকাবেলা করতে হচ্ছে তৈরি পোশাক খাতকে।

সূত্রমতে, বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠানকে দেয়া ক্রয়াদেশ বাতিল-
স্থগিত করা ক্রেতাদের মধ্যে প্রাইমার্কের মতো বড় ক্রেতা প্রতিষ্ঠানও আছে। আয়ারল্যান্ডভিত্তিক

প্রাইমার্কের পাশাপাশি ক্রয়াদেশ বাতিল-স্থগিত করছে ইউরোপের ছোট-মাঝারি-
বড় সব ধরনের ক্রেতাও। আবার এইচঅ্যান্ডএম, ইন্ডিটেক্স, মার্কস অ্যান্ড স্পেনসার, কিয়াবি, টা র্গেট, পিভিএইচসহ আরো কিছু ক্রেতা ক্রয়াদেশ বহাল রাখার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে। ফলে সামনে র দিনগুলোয় ক্রয়াদেশ বাতিল-
স্থগিতের পরিমাণ কমে আসতে পারে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

বিজিএমইএর তথ্য বলছে, গতকাল সকাল ৭টা পর্যন্ত ১ হাজার ১১৬ কারখানায় ৩০৫ কোটি ডলা রের ক্রয়াদেশ বাতিল ও স্থগিত হয়েছে। এসব ক্রয়াদেশের আওতায় ছিল ৯৫ কোটি ৩০ লাখ পি স পোশাক। এসব কারখানার মোট শ্রমিক সংখ্যা ২১ লাখ ৯০ হাজার।

পোশাক খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, চলতি বছরের শুরু থেকেই পোশাক রফতানির পরিস্থিতি ছিল বে শ টালমাটাল। ক্রেতারা ক্রয়াদেশ কমিয়ে দিচ্ছিলেন। তাদের বিক্রয় কেন্দ্রগুলো একের পর এক বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ক্রয়াদেশ প্রাপ্তির পরিমাণও ছিল তুলনামূলক কম। ক্রয়াদেশ যতটুকু পাওয়া যা চ্ছিল, তার দামও ছিল কম। এ প্রবণতা ইউরোপের বাজারগুলোতেই বেশি। আবার সেখানকার পোশাক ক্রেতাদের ভোক্তা আচরণেও ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে এখন অনলা ইনভিত্তিক কেনাকাটার প্রবণতা বাড়ছে। এ অবস্থায় দেশের পোশাক খাতের ওপর অনেক বড় এ কটি আঘাত হানল নভেল করোনাভাইরাস।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিজিএমইএ সভাপতি ড. রুবানা হক বণিক বার্তাকে বলেন, পোশাক র ফতানি পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে পোশাক খাতের অ বস্থা কতটা নাজুক। সংকট এখনো চলমান।

রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে ৩৩ ১ কোটি ডলারের পোশাক রফতানি হয়েছিল। সে সময় গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৯ দশমিক ৭ শতাংশ। এর পরের মাসেই বড় ধরনের পতন হয় পোশাক রফতানি র। আগস্টের মধ্যে প্রবৃদ্ধি নেমে আসে ঋণাত্মক ১১ দশমিক ৪৬ শতাংশে। এরপর অক্টোবর ও নভেম্বরে এ প্রবৃদ্ধি আরো নেমে দাঁড়ায় যথাক্রমে ঋণাত্মক ১৯ দশমিক ৭৯ ও ঋণাত্মক ১১ দশমি ক ৯৮ শতাংশে।

এরপর ডিসেম্বরে রফতানি আবার ইতিবাচক প্রবৃদ্ধির ধারায় ফিরে আসে। ওই মাসে রফতানি প্রবৃ দ্ধি হয় ১ দশমিক ২৬ শতাংশ। কিন্তু জানুয়ারি থেকে আবারো নেতিবাচক বা ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধির ধারায় ফিরে আসে তৈরি পোশাক খাত। ওই সময় রফতানি প্রবৃদ্ধি ছিল ঋণাত্মক ২ দশমিক ৯৮ শতাংশ। এরপর ফেব্রুয়ারিতে আন্তর্জাতিক বাজারে পোশাক রফতানি হয় ২৫৯ কোটি ৪৫ লাখ ডলারের। যেখানে গত অর্থবছরের ফেব্রুয়ারিতে পোশাক রফতানি ছিল ২৭৫ কোটি ৩৬ লাখ ১০ হাজার ডলারের। এ হিসেবে ফেব্রুয়ারিতেও পোশাক রফতানি হ্রাস পায় ৫ দশমিক ৭৮ শতাংশ।

The Financial Express

Published: April 08, 2020

Coronavirus outbreak

Hotel workers passing difficult time without jobs

Thousands of workers of different hotels, restaurants and sweetmeat shops are going through a tough time without jobs as most eateries have been closed down amid a government-announced general holiday to tackle the coronavirus spread.

Some restaurant workers and their leaders said most owners shut their eateries without clearing their wages and dues, leaving them at lurch amid an apparent countrywide lockdown and halt in economic activities.

According to UNB, they want their employers to stand by them and help them survive with their family members at this critical time.

They also urged the government to create pressure on the hotel owners to pay their unpaid wages alongside introducing food rationing for them and announcing a small amount of grant or stimulus package for their sector to ease their woes.

“Our owner closed the hotel on March 24 giving us some small amounts of money. Now I’ve no income source, but I’ve to buy food and other essentials for my four family members. I’ve no alternative to begging which is also now not possible as law enforcers don’t allow people to go outside,” Bhara Mia, a waiter who used to work at a restaurant in the city’s Mouchak area, said.

He said he phoned his employer to clear his dues, but the owner said he is under pressure to pay the restaurant’s rent. “I don’t know how I’ll support my family and arrange their meals.”

Abul Kalam, a waiter of a restaurant in the city’s Rampura Bazar, said he could not go home as their owners assured that he’ll keep the eatery open.

“But the restaurant was shut on March 27. I along with some other co-workers are now staying inside the restaurant amid the risk of coronavirus. We get food from our employer, but he gave us partial salary what I sent

home. My family is in serious trouble to meet the daily expenses with that meager amount of money."

As a waiter, Kalam said, he used to get much more tips than his wage from the customers than his salary. "But now I've no tips either. Both the government and the owners should extend their helping hands to assuage our sufferings."

Contacted, general secretary of Bangladesh Hotel Restaurant and Sweetmeat Workers Federation Anwar Hossain said most hotel restaurant owners shut their shops without paying the dues and wages of their workers, putting them in serious hardship.

He said there are at least 10,000 hotels and restaurants in the capital where around 2,00000 waiters, chefs, cooks, severs and bread-makers work with small amount of wage. "Most waiters depend on tips from customers. Without job and wage, they're now passing through an inhuman life."

Anwar said some workers had been able to their village homes before the closure of the public transport while many of them are now stuck in the capital with their families.

He urged the government to ask the hotel owners to clear the dues of their employees and provide them wages until the situation gets normal.

Anwar also urged the government to introduce food rationing system for them and announce a grant so that huge number of low-income workers of the sector can survive with their families.

President of Bangladesh Hotel Restaurant, Sweetmeat and Backer Workers Union Akhtruzzaman said the owners violated the labour law by shutting down their eateries without paying the employees their salary.

As per the labour law, he said the owners should continue to pay their employees during this time of natural disaster. "The owners made good profit round the year. Now they've the responsibility to stand by their workers and clear their wages. The government should enforce the labour law in this regard."

Akhter said they submitted an application to the chief inspector of the Department of Inspection for Factories and Establishment on March 25 for taking action in this regard.

Bangladesh Restaurant Owners' Association secretary general Rezaul Karim Sarker Robin said their sector has been hit hard by the coronavirus shutdown. "There're around 12 lakh workers directly involved with our sector,

besides, over a crore, including fish traders, meat traders, vegetable sellers and grocers are also involved with our sector. With the closure of our eateries all of these people are affected."

He claimed most eatery owners cleared the wages of their staff, but it's not enough. "We're helping our employees as much as we can. But we're also under pressure. Though the hotels are shut we've to pay huge amount of rents and bills of the utility services. We can't give them wages if our hotels remain closed. It's only the government which can help our poor workers by providing food and giving some grant."

সমকাল
০৮ এপ্রিল ২০২০

দিনে ক্ষতি ৫০০ কোটি টাকা, আর্থিক প্রণোদনা চান পরিবহন মালিকরা

করোনাভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে সরকারি সিদ্ধান্তে গণপরিবহন বন্ধ রাখায় দৈনিক ৫০০ কোটি টাকা ক্ষতি হচ্ছে বলে দাবি করেছেন পরিবহন মালিকরা। লোকসান পোষাতে সরকারের কাছে আর্থিক প্রণোদনার দাবি জানিয়েছেন তারা।

বুধবার বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির সভাপতি মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ ও মহাসচিব খন্দকার এনায়েত উল্যাহ যুক্ত বিবৃতিতে এ দাবি জানিয়েছেন। এতে বলা হয়েছে, গত ২৬ মার্চ থেকে গণপরিবহন বন্ধ থাকায় কর্মহীন হয়ে পড়েছেন চালক-শ্রমিকরা। তারা মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

লকডাউনের অংশ হিসেবে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের নির্দেশে আগামী ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ থাকবে গণপরিবহন। এতে যেসব চালক-শ্রমিক দৈনিক মজুরিতে কাজ করেন তাদের আয়-রোজগার পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। এমন শ্রমিকদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে মালিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ ও খন্দকার এনায়েত উল্যাহ।

দূরপাল্লা ও অভ্যন্তরীণ রুটে চলাচল করা বাসপ্রতি একজন শ্রমিককে পাহারার জন্য দিনে খোরাকি বাবদ ৩০০ টাকা দিচ্ছেন মালিকরা। বাকি শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়েছেন। অটোরিকশা, লেগুনাসহ অন্যান্য যাত্রীবাহী যানের শ্রমিকরাও কর্মহীন। এ ছাড়া পরিবহন খাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত শ্রমিক, কর্মচারী, ওয়ার্কশপ-গ্যারেজ মেকানিকরাও বেকার হয়েছেন। যাত্রী কল্যাণ সমিতি নামে সংগঠনের হিসাব অনুযায়ী করোনার কারণে পরিবহন ও সংশ্লিষ্ট খাতের ৯০ লাখ চালক-শ্রমিকের ৯৮ শতাংশ কাজ হারিয়েছেন।

সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে অসহায় পরিবহন শ্রমিকদের পরিবারের প্রতি সহায়তার হাত বাড়ানো একান্ত জরুরি। ক্ষতি বিবেচনায় এ খাতের মালিক-শ্রমিকদের জন্য বিশেষ প্রণোদনাও দরকার।

সমকাল

প্রকাশ: ০৯ এপ্রিল ২০২০

বিভিন্ন জেলায় শ্রমজীবীর মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে দেশের অধিকাংশ শ্রমজীবী মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। এসব শ্রমজীবীর সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান।**অফিস, প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর**-ফুলবাড়িয়া (ময়মনসিংহ) : ফুলবাড়িয়া উপজেলার পাঁচ ইউনিয়নের ৭০০ হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান ফারজানা শারমীন বিউটি। সকালে স্থানীয় কালাদহ প্রভাতী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে তিন ফুট সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইউপি চেয়ারম্যান শিমুল তরফদার, ইউপি চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম মাস্টার, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি ইমান আলী মাস্টার, উপজেলা আওয়ামী লীগ সদস্য মোবারক আলী মাস্টার, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নুরুল ইসলাম প্রমুখ।নেত্রকোনা :আটপাড়া ও দুর্গাপুরে খাদ্য সহায়তা দেওয়া হয়েছে। মঙ্গল ও বুধবার পৃথকভাবে এ সহায়তা প্রদান করা হয়। নেত্রকোনা-১ আসনের এমপি অসীম কুমার উকিলের পক্ষে জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য আবদুল কাইয়ুম রোকন আটপাড়ার তেলিগাতী ইউনিয়নে ১০০ হতদরিদ্র মানুষের মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বিতরণ করেন। অন্যদিকে দুর্গাপুর পৌর মেয়র মাওলানা আবদুস ছালাম পৌর শহরে ভাসমান বেদে, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, হিজড়া, মেথর ও সুইপার কলোনিতে প্রায় ৬০০ প্যাকেট খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেন।সখীপুর (টাঙ্গাইল) :সখীপুরে আওয়ামী লীগ নেতা আনোয়ার হোসেন ব্যক্তিগত উদ্যোগে কর্মহীন হয়ে পড়া দিনমজুর ও হতদরিদ্রদের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেন। বুধবার উপজেলার গজারিয়া ইউনিয়নের ৫-৬টি গ্রামের ২০০ পরিবারের প্রত্যেককে আট কেজি করে খাদ্যসামগ্রী বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেন। এ সময় গজারিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আবদুল মান্নান মিঞা ও মুক্তিযোদ্ধা নুরুল আমীন উপস্থিত ছিলেন।রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) :বসুন্ধরা গ্রুপ এবং রংধনু গ্রুপ রূপগঞ্জে দুটি ইউনিয়নে ১০ হাজার প্যাকেট খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেছে। বুধবার রূপগঞ্জ সদর ও দাউদপুর ইউনিয়নের ১০ হাজার লোকের মধ্যে এসব খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন রংধনু গ্রুপের চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম রফিক। আরও উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ জেলা পরিষদের সদস্য মিজানুর রহমান মিজান, দাউদপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম জাহাঙ্গীর মাস্টার ও রূপগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছালাউদ্দিন ভূঁইয়া। এছাড়া রূপগঞ্জে শতাধিক দুস্থ ও অসহায় মানুষের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেছে উপজেলা ছাত্রদল। বুধবার মুড়াপাড়ার শিবগঞ্জ, দড়িকান্দি, গঙ্গানগর, সরকারপাড়া, মঙ্গলখালী, ব্রা?ক্ষণগাঁও, মীরকুটিরছাও, নগর, মতিন মার্কেট এলাকায় গিয়ে দুস্থ ও অসহায়দের বাড়িতে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দেয় তারা। রূপগঞ্জ উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক আবু মো. মাসুম, আজিম সরকার ও সুলতান মাহমুদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে দুস্থদের বাড়ি বাড়ি খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়।মদন (নেত্রকোনা) :মোহনগঞ্জের সন্তান

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান সাজ্জাদুল হাসানের পক্ষে বুধবার বাড়ি বাড়ি খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দেন ইউএনও মো. ওয়ালীউল হাসান। উপজেলার অসহায়, হতদরিদ্র, কর্মহীন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার পাঁচশ' পরিবারে বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী প্রদান করা হয়। এ সময় পৌর মেয়র আব্দুল হান্নান তালুকদার শামীম, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান তোফায়েল আহমেদ, গৌবিন্দশ্রী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ইফতেখারুল আলম চৌধুরী আজাদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।কেন্দুয়া (নেত্রকোনা) :উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, পৌর মেয়র ও ১৩টি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের মধ্যে জনসাধারণকে বিতরণের জন্য ৫ হাজার ৬০০ মাস্ক, ১০০ গ্লাভস ও ৩ হাজার ৫০০ চাকা সাবান বিতরণ করা হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আল ইমরান রুহুল ইসলাম জানান, উপজেলা পরিষদের রাজস্ব ও এডিবি তহবিল থেকে করোনাভাইরাস প্রতিরোধে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সচেতন থাকার জন্য এসব সামগ্রী বিতরণ করা হয়।এদিকে অসহায় মানুষের ঘরে ঘরে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছেন এমপি অসীম কুমার উকিল। পৌর শহরে তার নিজস্ব উদ্যোগে ও সরকারি জিআর চাল বিতরণ করেন।

সমকাল

০৮ এপ্রিল ২০২০

সিঙ্গাপুরে অভিবাসী শ্রমিকদের মধ্যে সংক্রমণ বাড়ছে

সিঙ্গাপুরে দক্ষিণ এশিয়াসহ অন্যান্য অঞ্চলের অভিবাসী শ্রমিকদের মধ্যে করোনভাইরাসের সংক্রমণ বাড়ছে। স্ট্রেইট টাইমস অনলাইনের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

মঙ্গলবার দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় নতুন করে ১০৬ জনের আক্রান্ত হওয়ার তথ্য দিয়েছে। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে ১০৩ জন স্থানীয় ও তিনজন বিদেশফেরত। সবমিলিয়ে দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৪৮১ জনে।

৫২টি গুচ্ছ সংক্রমণের সন্ধান পাওয়া গেছে সিঙ্গাপুরে। তার মধ্যে ৩৯টি গুচ্ছই প্রবাসী শ্রমিকদের থাকার জায়গার (ডরমেটরি) সঙ্গে সম্পৃক্ত। প্রবাসী শ্রমিকদের মধ্যে আক্রান্তের সংখ্যাও বাড়ছে।

দু'টি ডরমেটরিতে ২০ হাজার শ্রমিক কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন। শ্রমিকদের কয়েকজন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলে অন্যদের মধ্যে সংক্রমণ ঠেকাতে গত সোমবার এ পদেক্ষপ নেয় সিঙ্গাপুর সরকার। এ শ্রমিকদের সবাই দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর বাসিন্দা।

ওই দু'টি ডরমেটরির একটি পুঙ্গলে অবস্থিত এস১১ ডরমেটরিতে মঙ্গলবার নতুন করে ১০ জন আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে এই ডরমেটরির ৯৮ জন আক্রান্ত হলেন। এই ডরমেটরিতে কোয়ারেন্টাইনে আছেন ১৩ হাজার শ্রমিক।

অপরটি ওয়েস্টলাইট তোহ গুয়ান ডরমেটরি। সেখানে নতুন করে ৫ জন আক্রান্ত হয়েছেন। মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৪ জনে। এই ডরমেটরিতে সাড়ে ছয় হাজারের বেশি শ্রমিক কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন।

এই দুটি ডরমেটরিতে থাকা শ্রমিকদের মধ্যে বাংলাদেশি শ্রমিকরা রয়েছেন কিনা তা স্ট্রেইট টাইমসের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি।

অভিবাসী শ্রমিকদের অন্য যে ডরমেটরিগুলোর মধ্যে সংক্রমণ ছড়িয়েছে সেগুলো হলো তোহ গুয়ান রোড পূর্বে অবস্থিত তোহ গুয়ান ডরমেটরি, চোয়া চু কাং রোডে অবস্থিত সুঙ্গে তেঙ্গা লজ, তামপাইনেস ডরমেটরি, কোকারনে লজ ১ ও ২।

বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

এপ্রিল ০৯, ২০২০

পরিবহন শ্রমিক সংগঠন

শ্রমিকের কাজে আসছে না শত কোটি টাকার কল্যাণ তহবিল

দেশের পরিবহন শ্রমিকদের সবচেয়ে বড় সংগঠন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন। দেশজুড়ে বিস্তৃত এর কার্যক্রম। বিভিন্ন যানবাহন থেকে প্রতিদিন আদায় করে বড় অংকের চাঁদা। শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য সংগঠনটির রয়েছে শতকোটি টাকার 'শ্রমিক কল্যাণ ফান্ড'। তবে চলমান করোনা পরিস্থিতিতে উপার্জনহীন শ্রমিকদের কোনো কাজেই আসছে না এ টাকা।

শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে প্রায় ১০০ কোটি টাকা জমা থাকার বিষয়টি বণিক বার্তাকে নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের এক শীর্ষ নেতা। পরিবহন শ্রমিকরা যখন 'অনাহারে-
অর্ধাহারে' দিন পার করছেন, তখন সংগঠনটির সেই নেতা বলছেন, নিয়োগপত্র না থাকায় কল্যাণ ফান্ডের টাকা এ দুর্যোগকালে তাদের প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। বিষয়টাকে 'আইনি জটিলতা' হিসেবে দেখছেন তিনি।

নভেল করোনাভাইরাসের বিস্তার রোধে গত ২৬ মার্চ থেকে দেশে চলছে সাধারণ ছুটি। একই দিন থেকে বন্ধ রয়েছে গণপরিবহন। এরই মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে ১৩ দিন। অন্য অনেক পেশার মতো আয়-
রোজগার বন্ধ ৫০ লাখের বেশি পরিবহন শ্রমিকের। আছে ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি নিয়ে অনিশ্চয়তা। আয়-
রোজগার না থাকায় মানবেতর জীবনযাপন করছেন পরিবহন শ্রমিকরা। শ্রমিক নেতাদের দাবি, পরিবার-পরিজন নিয়ে তাদের দিন কাটছে 'অর্ধাহারে-
অনাহারে'। এমন অবস্থায় শ্রমিকদের সহায়তার জন্য সরকারের কাছে খাদ্য ও অর্থসহায়তা এবং প্রণোদনার দাবি জানিয়েছেন শ্রমিক নেতারা। গত সোমবার বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কোটি কোটি মানুষকে পরিবহনের কাজে নিয়োজিত পরিবহন শ্রমিকরা দিন-
রাত কাজ করেন। গাড়ি চললে পরিবহন শ্রমিকদের সংসার চলে। সব সময় মানুষের সংস্পর্শে

আসায় পরিবহন শ্রমিকদের স্বাস্থ্যঝুঁকিও বেশি। এদিকে উপার্জন বন্ধ থাকায় হাজার হাজার পরি
বহন শ্রমিক মানবেতর জীবনযাপন করছেন। উপায়হীন হয়ে অনেক পরিবহন শ্রমিক রাস্তায় না
মারও চেষ্টা করছেন। পরিবার-পরিজন নিয়ে অর্ধাহারে-
অনাহারে থাকার যন্ত্রণা শ্রমিকদের কাছে করোনা সংক্রমণের ভয়ের চেয়ে বড় হয়ে উঠছে।

করোনার এ দুর্দিনে সরকারের কাছ থেকে অর্থসহায়তা ও প্রণোদনা চাইলেও এতদিন আদায় করা চাঁদার অর্থ দিয়ে সাধারণ শ্রমিকদের পাশে থাকছে না সংশ্লিষ্ট মালিক-শ্রমিক সংগঠনগুলো।

বাংলাদেশ ট্যাংক-
লরি শ্রমিক ফেডারেশন, বিপ্লবী শ্রমিক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, সংযুক্ত ট্রাক বন্দোবস্তকা
রী পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, ট্যাক্সিক্যাব-মাইক্রোবাস চালক ফেডারেশন, অটোরিকশা-
অটোটেম্পো পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ পণ্য পরিবহন মালিক-
শ্রমিক ঐক্য পরিষদ, বাংলাদেশ রিকশা-
ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের মতো অসংখ্য শ্রমিক সংগঠন আছে দেশজুড়ে। সারা দেশে ২৪৯টি শ্র
মিক ইউনিয়ন রয়েছে। ঢাকায় বাস ও ট্রাক টার্মিনালকেন্দ্রিক শ্রমিক ইউনিয়ন ছাড়াও প্রতি জেলা
য় অন্তত দুটি করে বাস ও ট্রাকের শ্রমিক ইউনিয়ন আছে। শ্রম মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থা
য়ী কমিটির তথ্য বলছে, দেশের সড়ক পরিবহন সেক্টরে মালিক ও শ্রমিকদের সংগঠনের সংখ্যা
৯৩২। পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকাকালে এ শ্রমিক সংগঠনগুলোকে প্রতিদিন কোটি কোটি টাকা চাঁ
দা দিয়েছেন শ্রমিকরা।

ঠেলাগাড়ি, ভ্যান, রিকশা, ভটভটি, টেম্পো, মিশুক, অটোরিকশা, সিএনজি অটোরিকশা, হিউ
ম্যান হলার, বাস, মিনিবাস, ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান, ট্রেইলার—
এমন কোনো বাহন নেই যেগুলো থেকে চাঁদা আদায় করে না শ্রমিক সংগঠনগুলো। ইউনিয়ন প
র্যায় থেকে রাজধানী—
চাঁদা আদায়ে সবখানেই একই চিত্র। আর এসব চাঁদা আদায় করা হয় শ্রমিকদের কল্যাণের নামে।
শত শত কোটি টাকা আদায় হয়েছে শ্রমিক কল্যাণ ফান্ডের নামে। দুর্দিনে এ ফান্ড থেকে ছিটে
ফোঁটাও সাহায্য পাচ্ছেন না পরিবহন শ্রমিকরা।

পরিবহন মালিক-
শ্রমিক সংগঠনগুলোর আয়ের প্রধান উৎস যানবাহন থেকে দৈনিক আদায় হওয়া চাঁদার টাকা।
ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির কার্যকরী সভাপতি আবুল কালাম গত বছর এক অনুষ্ঠানে
জানিয়েছিলেন, ঢাকায় চলাচল করা প্রতিটি বাস থেকে দৈনিক ৪০ টাকা আদায় করে ঢাকা সড়ক
পরিবহন মালিক সমিতি। ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক-
শ্রমিক ঐক্য পরিষদ আদায় করে আরো ৩০ টাকা। সংগঠন দুটির হিসাবে ঢাকায় প্রতিদিন প্রায়
পাঁচ হাজার বাস চলাচল করে। এ হিসাবে প্রতি মাসে আদায় হচ্ছে ১ কোটি ৫ লাখ টাকা। সংগঠ
ন পরিচালনা ও শ্রমিকদের কল্যাণে এ টাকা ব্যয় করা হয় বলেও জানান তিনি।

তবে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও সাবেক নৌ-
পরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খানের দাবি, ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত সব ইউনিয়নের নেতাদের ‘শ্রমিক
কল্যাণ তহবিল’ থেকে সামগ্রী বিতরণের অনুরোধ করা হয়েছে। তিনি বলেন, শ্রমিকদের একটি

তালিকা ডিসিদের কাছে দেয়া হয়েছে। এছাড়া শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর কল্যাণ তহবিল থেকেও ত্রাণ দেয়া হবে। এছাড়া মালিক সমিতির পক্ষ থেকে শ্রমিকদের সাহায্য-সহযোগিতা করা হচ্ছে।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন
প্রকাশ :৭ এপ্রিল, ২০২০ ০৯:৩২

গার্মেন্টস শ্রমিকদের চাকরি রক্ষার্থে অবিলম্বে অধ্যাদেশ জারী করা হোক

গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতন পরিশোধের জন্য ৫০০০ কোটি টাকার প্রণোদনার পরও বিপুল সংখ্যক গার্মেন্টস শ্রমিককে লে অফ করে, তাদেরকে ছাঁটাই করে দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে খোদ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদফতর।

এইসব নথিপত্র, অভিযোগ, স্মারক, চিঠি চালাচালি করতে করতেই গার্মেন্টস শ্রমিকরা সর্বশান্ত হয়ে যাবে। তাই জাতির এই ক্রান্তিকালে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারী করে দ্রুত শ্রমিক ছাটাই বন্ধের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা ১২, ১৬, ১৭ এবং ১৮ এর বিধানাবলীতে যা বর্ণিত থাকুক না কেন। রাষ্ট্রপতির এই অধ্যাদেশ জারীর মাধ্যমে পরবর্তী ৯০ দিন পর্যন্ত দেশের সকল গার্মেন্টস শ্রমিককে সবধরনের লে অফ করা এবং তাদেরকে সবধরনের ছাঁটাই করে দেয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে অবিলম্বে এই অধ্যাদেশ জারী ও বলবৎ করা হোক।

গার্মেন্টস মালিকরা শ্রমিকের বেতনের টাকার জোগান দিতে না পারলে প্রয়োজনে বেতন পরিশোধের জন্য আরও আর্থিক প্রণোদনা দিতে হবে। তবুও কোন অবস্থাতেই যেন ৪০ লাখ শ্রমিকের পরিবার অনাহারে না মরে।

লেখক: আইনজ্ঞ ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ।

প্রথম আলো
১০ এপ্রিল ২০২০

করোনার কোপ পড়বে ১৭০ দেশের মাথাপিছু আয়ে :আইএমএফ

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) প্রধান ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা। ছবি: রয়টার্স

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) প্রধান ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা সতর্ক করে বলেছেন, করোনভাইরাস মহামারির কারণে চলতি বছর বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি 'তীব্র নেতিবাচক' হবে। ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা বলেছেন, ১৯৩০ সালের মহামন্দার পর বিশ্ব সবচেয়ে খারাপ অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হয়েছে। ২০২১ সাল নাগাদ আংশিক পুনরুদ্ধার হবে বলে পূর্বাভাস দেন তিনি। বিবিসি অনলাইনের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

করোনাভাইরাস মহামারির প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায় দেশে দেশে জারি হয়েছে লকডাউন। এতে অনেক প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। অনেকে ছাঁটাই করছেন কর্মীদের। জর্জিয়েভা বলেন, উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হবে, শত শত বিলিয়ন ডলার বিদেশি সহায়তার প্রয়োজন হবে। মাত্র তিন মাস আগে ২০২০ সালে আমাদের সদস্য ১৬০টি দেশের মাথাপিছু আয়ে প্রবৃদ্ধি হবে বলে আশা করেছিলাম। আজ এই পরিসংখ্যান একদম ঘুরে গেছে। আমরা আশঙ্কা করছি ১৭০টি দেশে মাথাপিছু আয়ে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হবে। তিনি বলেন, প্রকৃতপক্ষে মহামন্দার পর সবচেয়ে খারাপ অর্থনৈতিক সংকটের আশঙ্কা করছি আমরা।

জর্জিয়েভা বলেন, যদি এই বছরের মাঝামাঝি এসে এই মহামারির প্রকোপ কমে তাহলে আগামী বছর আংশিক পুনরুদ্ধার হতে পারে বলে আশা করা যায়। তবে তিনি সতর্ক করেছেন পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। তিনি বলেন, আমি জোর দিয়ে বলছি কি হবে তা নিয়ে প্রচণ্ড অনিশ্চয়তা আছে। কত দিন এই মহামারি থাকবেসহ বেশ কিছুর ওপর নির্ভর করে পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ হতে পারে।

আগামী সপ্তাহে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের বসন্তকালীন বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

এদিকে গতকাল বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থা অক্সফাম সতর্ক করে বলেছে, করোনা মহামারি বিশ্বজুড়ে ৫০ কোটি মানুষকে দারিদ্রের মুখে ঠেলে দেবে। দাতব্য সংস্থাটি বলছে, মহামারিটি শেষ হওয়ার পর বিশ্বের ৭ দশমিক ৮ বিলিয়ন জনসংখ্যার অর্ধেক লোক দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনযাপন করতে পারে। গতকাল দীর্ঘ আলোচনার পর ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতারা ৫৪৬ বিলিয়ন ডলারের সহায়তা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। করোনা মহামারি ঠেকাতে লকডাউন জারি করায় ইউরোপের যেসব দেশগুলো মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়েছে তাদের এখান থেকে অর্থসহায়তা দেওয়া হবে।

দুর্গতিতে পোশাকশ্রমিকেরা :বর্তমান নিরুপায়, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

কুররাতুল-আইন-তাহমিনা, ঢাকা
০৯ এপ্রিল ২০২০, ১৩:২৩

করোনার কালেও পেটে ভাত দিতে হয়। পেট অনেকগুলো। 'দেশে' দুটি ছোট মেয়ে, বুড়ো মা আর শ্বশুর। ঢাকায় নিজে আর স্বামী। 'কামাইকাজের লোক' শুধু স্বামী-স্ত্রী দুজন।
দুজন গাজীপুরের টঙ্গী বিসিক শিল্পনগরীতে একই কারখানায় কাজ করেন। ৩১ মার্চ কাজের শেষে শ্রমিকদের বেতন দিয়ে কারখানাটি বন্ধ হয়। তাঁরা সেদিনই দেশে চলে যান।

৫ এপ্রিল কারখানা খোলার কথা ছিল। মোসাম্মাত রাবেয়া বেগম সেদিন সকালে স্বামীর সঙ্গে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার নবীনর গ্রাম থেকে টঙ্গী ফিরে আসেন। এসে কারখানা বন্ধ পান।

সেদিনই দুপুর ১২টার দিকে পাগাড় সোসাইটির মাঠ এলাকায় তাঁদের ভাড়া বাসায় আমার সঙ্গে রাবেয়ার দেখা। বললেন, ওভারটাইমসহ দুজনে মিলে মাসে কমবেশি ২০ হাজার টাকা আয় করেন। তাই দিয়ে গ্রামের আর এখানকার দুই সংসার চলে।

রাবেয়া বলেন, আগের রাতে ট্রাকে করে, পায়ে হেঁটে, বহু কষ্টে ফিরেছেন—'একদিন অ্যাবসেন্ট করলে যদি আমাদের বাইর কইরা দেয়, তয় তো করার কিছু নাই।' ছুটি আরও বাড়বে জানলে এখন তাঁরা ফিরতেন না।

পথে পথে পুলিশ গাড়ি থামিয়েছে। ড্রাইভার বাড়তি টাকা নিয়েছেন। টাকা লেগেছে ২ হাজারের মতো। মার্চের বেতন থেকে বাড়িতে টাকা দিয়েছেন। গাড়িভাড়া দিয়ে হাতে এখন টাকা নেই। রাবেয়া বলেন, 'আর তো খাওয়ার মতো তৌফিক নাই ঘরে।'

টঙ্গীরই পূর্ব গোপালপুর এলাকায় স্বামী আর ছোট ছেলেকে নিয়ে ভাড়া বাসায় থাকেন মোসাম্মাত নাজমা আক্তার। তিনি আর তাঁর স্বামী দুজনই পোশাকশ্রমিক।

নাজমা বলেন, ৪ এপ্রিল পর্যন্ত কারখানা বন্ধ থাকবে জেনে ২৫ মার্চ তাঁরা বগুড়ার শেরপুরে গ্রামের বাড়িতে চলে যান। এপ্রিলের গোড়ায় সরকার সাধারণ ছুটি বাড়াল। নাজমা ভেবেছিলেন, তাঁদের ছুটিও বাড়বে।

নাজমার কথায়, ‘একটা মসজিদে যদি ১০০ জন লোক একসাথে যাইতে সরকার থেইকা নিষেধ করা হয়, তাইলে একটা গার্মেন্টসে দুই-তিন হাজার লোক কেমন করে কাজ করবে?’

নাজমা জানতেন, বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছিলেন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে পোশাক কারখানা খোলা রাখা যাবে। তবু তিনি ৩ মার্চ সন্ধ্যা পর্যন্ত তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ, সরকার অথবা কারখানার মালিকের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করেন।

এদিকে অফিসে ব্যবস্থাপকদের ফোন করলে তাঁরা তাড়াতাড়ি ফিরতে বলেন। ‘মালিক যদি খোলা রাখে, আর এই সময় যদি চাকরি চলে যায়, এই ভয়ে আমার বাধ্য হয়া জীবনের ঝুঁকি নিয়াই আসছি’—বলেন নাজমা।

৪ এপ্রিল রাতে টঙ্গী ফিরে নাজমা শোনেন, বিজিএমইএ কারখানা বন্ধ রাখতে অনুরোধ করছে। তাঁর প্রশ্ন, ‘এই যে আমাদের একটা ভোগান্তি, গ্রামে যারা ছিল, তারা বাড়িতেই ছিল, লক্ষ লক্ষ মানুষ যে আবার ঢাকা শহরে আইল, এটা কি বিজিএমইএ কিংবা সরকারের একটা জ্ঞানহীনতার পরিচয় না?’

কিন্তু প্রশ্নটা কি নিছক জ্ঞানহীনতার? প্রভাবশালী কারও হেলাফেলা আর স্বার্থচিন্তার চূড়ান্ত প্রকাশও কি এটা নয়?

বাণিজ্যমন্ত্রী পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি। গত প্রায় ২০ দিনে বিজিএমইএ ও নিট পোশাক মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএ একাধিকবার কারখানা খোলা রাখার পক্ষে সায় দিয়েছে। শ্রম মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকেও একাধিকবার এই বার্তা গেছে যে সুরক্ষা সরঞ্জাম তৈরি করাসহ জরুরি প্রয়োজনে কড়াকড়িভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কারখানা খোলা রাখা যাবে।

অবশেষে মালিকদের সংগঠন দুটিও ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত কারখানা বন্ধ রাখার সুস্পষ্ট যৌথ ঘোষণা দিয়েছে। বলেছে, সংগঠনকে জানিয়ে কেবল পিপিই বানানো আর জরুরি রপ্তানি ক্রয়াদেশের কাজ চলতে পারবে।

যাক। আমরা ধাপে ধাপে সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বিশ্বাসী। আজ মনে হলো এতটুকু করি, কাল মনে হলো কড়াকড়ি আরেকটু বাড়াই। ছুটি বাড়াই দুদিন করে করে। করোনাভাইরাসকে ধাপে ধাপে বরণ করি অথবা অল্পে অল্পে কুলার বাতাস দিয়ে তাড়াতে চাই।

এদিকে করোনা-বন্ধ বা লকডাউন না চললেও রাবেয়া এখন দেশে ফিরতে পারতেন না। তাঁর মার্চের বেতন শেষ, দোকানে বাকি পাওয়া অনিশ্চিত। তিনি বলেন, ‘এই যে বন্ধের পর বন্ধ দিতাছে, সামনের স্যালারি পাব কি না, হের তো কোনো নিশ্চয়তা নাই।’

এসে থেকে শুনছেন, কারখানার কাজের আদেশ বাতিল হয়ে যাচ্ছে। কারখানা চলবে কি না, সেটা জানা তাঁর বড় দরকার। তিনি বলেন, ‘গার্মেন্টস ছাড়া তো আমাদের কিছু নাই। বাড়ি যায়া করব কী?’ মালিকেরা কী করেন, সেই আশাতেই থাকতে হবে।

নাজমাও অপেক্ষা করছেন। প্রথমত, মার্চের বেতনের জন্য। দ্বিতীয়ত, তিনি শুনেছেন, সরকার তিন মাসের বেতন-ভাতার জন্য সাহায্য দেবে। কীভাবে কখন তা পাবেন, সেটা জানতে চান।

বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ ১৬ এপ্রিলের মধ্যে মার্চের বেতন দিয়ে দিতে সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনুরোধ করেছে। টঙ্গী থেকে ফিরে রাতে ফোন করি বিজিএমইএর সহসভাপতি আরশাদ জামালকে। তিনি বললেন, বেশির ভাগ কারখানা শ্রম আইনের ১৬-এর ২ ধারায় কাজ বন্ধ করেছে।

এতে করে শ্রমিকেরা লে-অফের নিয়মে বন্ধের পর ৪৫ দিন পর্যন্ত বেতন-ভাতা পাবেন। বাড়িভাড়া, চিকিৎসাভাতা ও খাদ্যভাতা পুরোপুরি, আর মূল বেতনের অর্ধেক। কারখানা যদি আরও অন্তত ১৫ দিন বন্ধ থাকে, তবে শ্রমিকেরা মূল বেতনের এক-চতুর্থাংশ এবং ভাতাগুলো পাবেন। তবে আইন বলছে, সে ক্ষেত্রে মালিক আইনের ২০ ধারায় প্রাপ্য বুঝিয়ে দিয়ে ছাঁটাইও করতে পারবেন।

আরশাদ জামাল বলছেন, কারখানা কাজ হারিয়ে পথে বসতে নিলে তেমন ছাঁটাই হতে পারে। বন্ধ অত দিন গড়ালে কারখানাগুলোর কাজে অন্য রকম জট লেগে যাবে।

মালিকেরা কিন্তু আরও আগে থেকেই এসব সমস্যার কথা বলে সরকারের কাছ থেকে সুবিধা চেয়ে আসছেন। সরকার একাধিক আর্থিক প্রণোদনা ঘোষণাও করেছে। এগুলোর একটি হচ্ছে রাবেয়া নাজমাদের মতো শ্রমিকদের জুন পর্যন্ত তিন মাস বেতন দেওয়ার জন্য বাণিজ্যিক ঋণসুবিধা।

এই ঋণ পেতে হলে প্রতিষ্ঠানকে নিয়মিত বেতন দেওয়ার এবং রপ্তানি চলমান থাকার প্রমাণপত্র দেখাতে হবে। ঋণদাতা ব্যাংক সরাসরি বেতনের টাকাটা শ্রমিকের ব্যাংক অথবা মোবাইলের অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেবে। বেতন ধরা হবে আগের তিন মাসের গড় বেতনের নিরিখে।

কথাবার্তা বলে যা বুঝলাম, শিল্পমালিকেরা এই ঋণ ও বেতন দেওয়ার পথটি খুব সহজ বলে ভাবছেন না। পরিশোধ করতে হবে, সেটা একটা জটিলতা। লে-অফের নিয়মে আধা বেতন না কি তিন মাসের গড় বেতনের সমপরিমাণ, সে নিয়েও একটা বাহাস লেগে যেতে পারে।

তা ছাড়া বদলি বা সাময়িক শ্রমিকেরা কিন্তু এসব কোনো সুযোগের দাবিদার হবেন না। শুনলাম, তেমন শ্রমিকেরা এখনই ছাঁটাই হচ্ছেন। বড় কারখানার পাশাপাশি ঠিকা ছোট কারখানাতেও অনেক শ্রমিক কাজ করেন। এগুলো বন্ধ হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকবে।

এটা ঠিক যে করোনার আসর মালিকদের রেয়াত দেবে না। তবে সরকারের কাছে দেনদরবার করার পথ তাঁদের সর্বদা খোলা থাকে। রাবেয়া বা নাজমার গলা কার কানেই-বা পৌঁছাবে?

বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী
এপ্রিল ০৯, ২০২০

কভিড-১৯-এর প্রভাব

বিশ্বজুড়ে পূর্ণকালীন চাকরি হারাবে সাড়ে ১৯ কোটি শ্রমিক

বৈশ্বিক মহামারী নভেল করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে বিশ্বজুড়ে পূর্ণকালীন চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছে ১৯ কোটি ৫০ লাখ মানুষ। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) বলছে, ২০২০ সালের জুলাই-ডিসেম্বরের মধ্যে কভিড-১৯-
এর প্রভাবে বিশ্বজুড়ে মোট কর্মঘণ্টা নষ্ট হবে ৬ দশমিক ৭ শতাংশ। ফলে বিশ্বব্যাপী এ বিপুলসংখ্যক শ্রমিক তাদের চাকরি হারাবেন। খবর বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড।

আইএলও জানিয়েছে, নভেল করোনাভাইরাসের কারণে বৈশ্বিক শ্রমবাজারে যে প্রভাব পড়তে যাচ্ছে, তা ২০০৮-
০৯ সালের অর্থনৈতিক সংকটকেও ছাড়িয়ে যাবে। কর্মঘণ্টা বা চাকরি হারানোর মারাত্মক ক্ষতির শিকার হবে আরব অঞ্চল। আইএলওর পূর্বাভাস অনুযায়ী, আরব রাষ্ট্রগুলোয় কর্মঘণ্টা নষ্ট হবে ৮ দশমিক ১ শতাংশ, যা ৫০ লাখ পূর্ণকালীন চাকরির সমান। অন্যদিকে ইউরোপে ৭ দশমিক ৮ শতাংশ কর্মঘণ্টা নষ্ট হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে চাকরি হারাবে ১ কোটি ২০ লাখ পূর্ণকালীন চাকরিরত শ্রমিক। এছাড়া এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলে কর্মঘণ্টা নষ্ট হবে ৭ দশমিক ২ শতাংশ। ফলে এ দুই অঞ্চলে পূর্ণকালীন চাকরি হারাতে হতে পারে ১২ কোটি ৫০ লাখ শ্রমিককে। বিভিন্ন আয়সীমার

জনগোষ্ঠীকেই ভয়াবহ এ ক্ষতির শিকার হতে হবে। বিশেষ করে সবচেয়ে বড় ধাক্কা সামলাতে হ
বে উচ্চ-
মধ্যম আয়ের দেশগুলোকে। এসব দেশে ৭ শতাংশ কর্মঘণ্টা নষ্ট হওয়ার বিপরীতে চাকরি হারা
তে হতে পারে ১০ কোটি মানুষকে।

আইএলওর মহাপরিচালক গাই রাইডার এক বিবৃতিতে বলেন, বিশ্বজুড়ে বর্তমানে ব্যবসা ও শ্রমি
করা অভাবনীয় বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। উন্নত কিংবা উন্নয়নশীল কোনো অর্থনীতিই এ বিপর্য
য়ের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাচ্ছে না। পরিস্থিতি মোকাবেলায় আমাদের সবাইকে একসঙ্গে খুব দ্রু
ত এবং অবিচলভাবে এগিয়ে যেতে হবে। সঠিক ও জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্য দিয়েই আমরা
হয়তো এ বিপর্যয় এড়াতে পারব। না হলে অর্থনীতিসহ বৈশ্বিক অবকাঠামো ভেঙে পড়া রোধ ক
রা যাবে না।

নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির ঝুঁকিতে রয়েছে আবাসন ও খা
দ্য পরিষেবা, ম্যানুফ্যাকচারিং, খুচরা বিক্রি এবং ব্যবসা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম। এছাড়া বৈশ্বিক
পর্যটন খাতেও কভিড-১৯-
এর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এ অবস্থায় ২০২০ সালে বৈশ্বিক বেকারত্ব বৃদ্ধি নির্ভর
করছে রোগটির ভবিষ্যৎ বিস্তার এবং তা রোধে গৃহীত নীতি ও পদক্ষেপের ওপর।

‘এলএলও মনিটর সেকেন্ড এডিশন: কভিড-
১৯ অ্যান্ড দি ওয়ার্ল্ড অব ওয়ার্ক’ শীর্ষক আইএলওর প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রাথমিকভাবে এর আ
গে সংস্থাটির পক্ষ থেকে নভেল করোনাভাইরাসজনিত অর্থনৈতিক সংকটের কারণে সারা বিশ্বে
আড়াই কোটি লোক কর্মসংস্থান হারাবে বলে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে
বছর শেষে এ সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র আংশিক কিংবা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যা
ওয়ায় এরই মধ্যে বিশ্বের মোট শ্রমশক্তির চার-পঞ্চমাংশের (৮১ শতাংশ) ওপর কভিড-১৯-
এর প্রভাব পড়েছে। নতুন গবেষণা অনুযায়ী, ১২৫ কোটি মানুষ ঝুঁকিপূর্ণ এমন সব খাতের সঙ্গে
যুক্ত আছে, যেগুলো ছাঁটাইয়ের পাশাপাশি আরো বেশি বেতন ও কর্মঘণ্টা হ্রাসের দিকে ঝুঁকছে।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, বহু মানুষ নিম্ন মজুরি ও স্বল্প-
দক্ষ খাতের চাকরিতে যুক্ত আছেন। এসব খাতে হঠাৎ করেই আয় বন্ধ হয়ে গেলে পরিস্থিতি মারা
ত্মক আকার ধারণ করবে। বিশ্বব্যাপী উন্নয়নশীল ও উঠতি অর্থনীতির দেশগুলোয় অনানুষ্ঠানিক
খাতে যুক্ত ২০০ কোটি মানুষ এ ঝুঁকিতে রয়েছে।

রাইডার বলেন, গত ৭৫ বছরেরও বেশি সময়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্য এ হলো স
বচেয়ে বড় পরীক্ষা। নভেল করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কোনো একটি দেশ ব্যর্থ হলে আ
মরা সবাই ব্যর্থ হব। ফলে বৈশ্বিক সমাজকে রক্ষায় ও সহযোগিতায় আমাদের সমাধান খুঁজে বের

করতে হবে। বিশেষ করে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর দিকে, যারা নিজেরা এ দুর্যোগ সামাল দেয়ার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী নয়।

বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

এপ্রিল ০৯, ২০২০

কভিড-১৯-এর প্রভাব

বিশ্বজুড়ে পূর্ণকালীন চাকরি হারাবে সাড়ে ১৯ কোটি শ্রমিক

বৈশ্বিক মহামারী নভেল করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে বিশ্বজুড়ে পূর্ণকালীন চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছে ১৯ কোটি ৫০ লাখ মানুষ। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) বলছে, ২০২০ সালের জুলাই-ডিসেম্বরের মধ্যে কভিড-১৯-
এর প্রভাবে বিশ্বজুড়ে মোট কর্মঘণ্টা নষ্ট হবে ৬ দশমিক ৭ শতাংশ। ফলে বিশ্বব্যাপী এ বিপুলসংখ্যক শ্রমিক তাদের চাকরি হারাবেন। খবর বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড।

আইএলও জানিয়েছে, নভেল করোনাভাইরাসের কারণে বৈশ্বিক শ্রমবাজারে যে প্রভাব পড়তে যাচ্ছে, তা ২০০৮-
০৯ সালের অর্থনৈতিক সংকটকেও ছাড়িয়ে যাবে। কর্মঘণ্টা বা চাকরি হারানোর মারাত্মক ক্ষতির শিকার হবে আরব অঞ্চল। আইএলওর পূর্বাভাস অনুযায়ী, আরব রাষ্ট্রগুলোয় কর্মঘণ্টা নষ্ট হবে ৮ দশমিক ১ শতাংশ, যা ৫০ লাখ পূর্ণকালীন চাকরির সমান। অন্যদিকে ইউরোপে ৭ দশমিক ৮ শতাংশ কর্মঘণ্টা নষ্ট হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে চাকরি হারাবে ১ কোটি ২০ লাখ পূর্ণকালীন চাকরিরত শ্রমিক। এছাড়া এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলে কর্মঘণ্টা নষ্ট হবে ৭ দশমিক ২ শতাংশ। ফলে এ দুই অঞ্চলে পূর্ণকালীন চাকরি হারাতে হতে পারে ১২ কোটি ৫০ লাখ শ্রমিককে। বিভিন্ন আয়সীমার জনগোষ্ঠীকেই ভয়াবহ এ ক্ষতির শিকার হতে হবে। বিশেষ করে সবচেয়ে বড় ধাক্কা সামলাতে হবে উচ্চ-
মধ্যম আয়ের দেশগুলোকে। এসব দেশে ৭ শতাংশ কর্মঘণ্টা নষ্ট হওয়ার বিপরীতে চাকরি হারাতে হতে পারে ১০ কোটি মানুষকে।

আইএলওর মহাপরিচালক গাই রাইডার এক বিবৃতিতে বলেন, বিশ্বজুড়ে বর্তমানে ব্যবসা ও শ্রমিকরা অভাবনীয় বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। উন্নত কিংবা উন্নয়নশীল কোনো অর্থনীতিই এ বিপর্যয়ের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাচ্ছে না। পরিস্থিতি মোকাবেলায় আমাদের সবাইকে একসঙ্গে খুব দ্রুত এবং অবিচলভাবে এগিয়ে যেতে হবে। সঠিক ও জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্য দিয়েই আমরা হয়তো এ বিপর্যয় এড়াতে পারব। না হলে অর্থনীতিসহ বৈশ্বিক অবকাঠামো ভেঙে পড়া রোধ করা যাবে না।

নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির ঝুঁকিতে রয়েছে আবাসন ও খাদ্য পরিষেবা, ম্যানুফ্যাকচারিং, খুচরা বিক্রি এবং ব্যবসা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম। এছাড়া বৈশ্বিক পর্যটন খাতেও কভিড-১৯-
এর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এ অবস্থায় ২০২০ সালে বৈশ্বিক বেকারত্ব বৃদ্ধি নির্ভর করছে রোগটির ভবিষ্যৎ বিস্তার এবং তা রোধে গৃহীত নীতি ও পদক্ষেপের ওপর।

'এলএলও মনিটর সেকেন্ড এডিশন: কভিড-
১৯ অ্যান্ড দি ওয়ার্ল্ড অব ওয়ার্ক' শীর্ষক আইএলওর প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রাথমিকভাবে এর আগে সংস্থাটির পক্ষ থেকে নভেল করোনাভাইরাসজনিত অর্থনৈতিক সংকটের কারণে সারা বিশ্বে আড়াই কোটি লোক কর্মসংস্থান হারাবে বলে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে বছর শেষে এ সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র আংশিক কিংবা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এরই মধ্যে বিশ্বের মোট শ্রমশক্তির চার-পঞ্চমাংশের (৮১ শতাংশ) ওপর কভিড-১৯-
এর প্রভাব পড়েছে। নতুন গবেষণা অনুযায়ী, ১২৫ কোটি মানুষ ঝুঁকিপূর্ণ এমন সব খাতের সঙ্গে যুক্ত আছে, যেগুলো ছাঁটাইয়ের পাশাপাশি আরো বেশি বেতন ও কর্মঘণ্টা হ্রাসের দিকে ঝুঁকছে।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, বহু মানুষ নিম্ন মজুরি ও স্বল্প-
দক্ষ খাতের চাকরিতে যুক্ত আছেন। এসব খাতে হঠাৎ করেই আয় বন্ধ হয়ে গেলে পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করবে। বিশ্বব্যাপী উন্নয়নশীল ও উঠতি অর্থনীতির দেশগুলোয় অনানুষ্ঠানিক খাতে যুক্ত ২০০ কোটি মানুষ এ ঝুঁকিতে রয়েছে।

রাইডার বলেন, গত ৭৫ বছরেরও বেশি সময়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্য এ হলো সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। নভেল করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কোনো একটি দেশ ব্যর্থ হলে আমরা সবাই ব্যর্থ হব। ফলে বৈশ্বিক সমাজকে রক্ষায় ও সহযোগিতায় আমাদের সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। বিশেষ করে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর দিকে, যারা নিজেরা এ দুর্যোগ সামাল দেয়ার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী নয়।

বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

এপ্রিল ১১, ২০২০

করোনায় চাহিদা সংকট
এশিয়ার তৈরি পোশাক অর্থনীতিতে অশনিসংকেত

এশিয়ার উন্নয়নশীল বেশ কয়েকটি দেশের জন্যই তৈরি পোশাক একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন ও রফতানি খাত। এশিয়ার অগ্রসরমান অর্থনীতিগুলোর বেশির ভাগেরই ৫০ শতাংশের বেশি রফতানি আয় আসে এ খা

ত থেকে। কিন্তু বৈশ্বিক মহামারী রূপ ধারণ করা নভেল করোনাভাইরাসের কারণে মুখ থুবড়ে প ড়েছে এশিয়ার রফতানিমুখী পোশাক খাত। খবর বিবিসি।

করোনা পরিস্থিতিতে এশিয়ার পোশাক উৎপাদকদের সামনে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে দুটি বিষ য়। প্রথমত, এ অঞ্চলে উৎপাদিত তৈরি পোশাকের সিংহভাগ কাঁচামালই আসে চীন থেকে। আর নভেল করোনাভাইরাসের উত্পত্তি এ চীনে। দেশটিতে ভাইরাসটির সংক্রমণ দ্রুত বাড়তে শুরু ক রলে প্রতিরোধের জন্য লকডাউনের মতো কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয় সরকার। এতে চীনে একের পর এক বস্ত্র কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। বিশ্বের সবচেয়ে বড় বস্ত্র রফতানিকারক দেশটি থে কে তৈরি পোশাকের কাঁচামাল সরবরাহে এ অচলাবস্থার শুরু গত ফেব্রুয়ারিতে।

আর এখন যখন করোনা পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় চীনে কিছু বস্ত্র কারখানা উৎপাদনে ফিরেছে, তখন তৈরি পোশাক রফতানিকারকদের জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে চাহিদা ইস্যু। এ শিয়ার তৈরি পোশাকের প্রধান ক্রেতা উন্নত দেশগুলোর রিটেইলাররা, বিশেষ করে ইউরোপ ও উ ত্তর আমেরিকা। করোনা হানা দিয়েছে সেখানেও। ভাইরাসটির সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার পর সেসব দেশের সরকার কঠোরভাবে লকডাউন পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। আর এতে বেশির ভাগ রিটেইলার তাদের দোকানগুলো বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়।

বিদেশী ক্রেতাদের ব্যবসা সংকোচনের প্রভাব পড়েছে এশিয়ার তৈরি পোশাক উৎপাদন খাতে। অনেক রিটেইলারই এখন তাদের কার্যাদেশ প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় থাকা পণ্যের কার্যাদেশ বাতিল করে দিচ্ছে তারা। এমনকি শিপমেন্টের জন্য প্রস্তুত এমন পণ্যও তারা আর নিতে চাইছে না। ফলে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো পড়েছে বিপাকে। তারা তাদের কর্মীদে র বেতন-ভাতা পরিশোধে হিমশিম খাচ্ছে।

আমবাত্তুর ফ্যাশন ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান বিজয় মাহতানি একটি করুণ সত্য তুলে ধরেছেন। তি নি বলেন, ‘আমাদের কর্মীরা যদি নভেল করোনাভাইরাসে মারা না-
ও যায়, তারা না খেতে পেয়েই মরবে।’

স্বাভাবিক সময়ে বিজয় মাহতানি এবং তার দুই ব্যবসায়িক অংশীদার অমিত মাহতানি ও শাওন ই সলামের পরিচালনাধীন কারখানায় কাজ করে প্রায় ১৮ হাজার কর্মী। করোনা মহামারীর কারণে তারা তাদের প্রায় সব কার্যক্রমই বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছেন। কেবল একটি কারখানায় আংশি ক কার্যক্রম চলছে।

বিজয় ও তার অংশীদাররা জানান, তারা যে কর্মীদের বেতন দিতে পারছেন না—
এর জন্য কেবল নভেল করোনাভাইরাসই দায়ী নয়। মূল সমস্যা অন্যখানে। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরা জ্যে তৈরি পোশাকের শীর্ষ ক্রেতারা চাহিদা কমিয়ে দিয়েছে, যা উৎপাদকদের বেতন দেয়ার সক্ষ মতা হারানোর ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখছে।

তাসকার অ্যাপারেল জর্ডানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অমিত মাহতানি বলেন, ‘কিছু ব্র্যান্ড ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বের নীতিবোধ ধরে রাখছে। তারা নগদ অর্থের প্রবাহ কিছুটা হলেও অব্যাহত রাখার চেষ্টা করছে, যেন অন্তত আমরা কর্মীদের বেতনটা দিতে পারি। কিন্তু আমাদের এর বিপরীত দৃশ্যও দেখতে হচ্ছে। অনেক ক্রেতাই উৎপাদিত ও উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় থাকা পণ্যের কার্যাদেশ বাতিল করে দিচ্ছে। অনেকে আবার সরবরাহকৃত ও ট্রানজিটে থাকা পণ্যের মূল্য কম দিতে চাচ্ছে। এছাড়া তারা চুক্তি অনুযায়ী মূল্য পরিশোধের সময়সীমা ৩০ থেকে ১২০ দিন বাড়ানোর জন্য ও জোরাজুরি করছে।’

এ প্রসঙ্গে অমিতের ব্যবসায়িক অংশীদার বিজয় মাহতানি বলেন, ‘ক্রেতারা কেবল শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থই দেখছে। পোশাক কর্মীদের কষ্টের বিষয়টা তারা ভেবে দেখছে না।’

অবশ্য অব্যাহত সমালোচনা ও চাপের মুখে এইচঅ্যান্ডএম ও জারার মতো কয়েকটি ফ্যাশন ব্র্যান্ড বলেছে, যেসব কার্যাদেশ চালু রয়েছে, সেগুলোর জন্য তারা পুরো মূল্যই পরিশোধ করবে।

নভেল করোনাভাইরাসের কারণে রফতানিমুখী তৈরি পোশাক খাতের বর্তমান সংকট তো রয়েছেই, ভবিষ্যতেও এর প্রভাব কম নেতিবাচক হবে না। আর এ প্রভাব হতে পারে দীর্ঘমেয়াদি। শ্রমিক সংকট তৈরি হতে পারে। বেড়ে যেতে পারে কাঁচামালের মূল্য। অন্যদিকে কমে যেতে পারে কারখানাগুলোর উৎপাদন সক্ষমতা।

এ অবস্থায় এশিয়ার পোশাক শিল্পকে বাঁচাতে কেবল আপত্কালীন নগদ সহায়তা দিলেই চলবে না, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হিসেবে কর অবকাশের মতো দীর্ঘমেয়াদি প্রণোদনার কথাও চিন্তা করতে হবে নীতিনির্ধারকদের।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

৯ এপ্রিল, ২০২০

সিঙ্গাপুরে বহাল রয়েছে বাংলাদেশি শ্রমিকদের বেতনসহ সব সুবিধা

‘সার্কিট ব্রেকার কর্মসূচি’র আওতায় সিঙ্গাপুরে সব ধরনের নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে বাংলাদেশি শ্রমিকদের সম্পূর্ণ বেতনসহ আনুষঙ্গিক সুবিধা বহাল রাখা হয়েছে। এছাড়া সকল শ্রমিককে বিনামূল্যে খাবার ও চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

সিঙ্গাপুরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভিভিয়ান বালাকৃষ্ণান আজ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেনের সঙ্গে ফোনে আলাপকালে এসব কথা বলেন।

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, সিঙ্গাপুরে ১৪৮১ জন করোয়ায় আক্রান্তের মধ্যে ২৪৪ জন বাংলাদেশি। আরও বেশকিছু সংখ্যক বাংলাদেশিকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। তাদের চিকিৎসাসহ সার্বিক তত্ত্বাবধানে সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করছে সিঙ্গাপুর।

এসময় আরও জানানো হয়, সিঙ্গাপুরে প্রথম আক্রান্ত পাঁচজনের মধ্যে চারজনই এখন সুস্থ। গুরুতর অসুস্থ একজনের অবস্থারও উন্নতি হয়েছে।

বিডি প্রতিদিন/আরাফাত

প্রকাশনার ৩য় বছর
সংবাদ
বাংলাদেশের মুখপত্র

নিউজ আপলোড :ঢাকা , শুক্রবার, ১০ এপ্রিল ২০২০

সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশি শ্রমিকদের সব সুবিধা বহাল আছে

সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশি শ্রমিকদের সম্পূর্ণ বেতনসহ আনুষঙ্গিক সুবিধা বহাল রাখা হয়েছে বেল জানা গাে◌ছ।
৯ এপ্রিল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র তথ্য অফিসার মো : তৌহিদুল ইসলামের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানা যায়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সিঙ্গাপুরে 'সার্কিটব্রেকার কর্মসূচি'র আওতায় সিঙ্গাপুরে সব ধরনের নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে বাংলাদেশি শ্রমিকদের সম্পূর্ণ বেতনসহ আনুষঙ্গিক সুবিধা বহাল রাখা হয়েছে। তা ছাড়া সকল শ্রমিককে বিনা মূল্যে খাবার ও চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে ।
সিঙ্গাপুরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভিভিয়ান বালাকৃষনান ৯ এপ্রিল পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড .এ .কে .আব্দুল মোমেনের সাথে ফোনে আলাপকালে এসব কথা বলেন।

ভিভিয়ান বলেন,সিঙ্গাপুরে ১৪৮১ জন করোনায় আক্রান্তের মধ্যে ২৪৪ জন বাংলাদেশি। আরও বেশকিছু সংখ্যক বাংলাদেশিকে কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে। তাদের চিকিৎসাসহ সার্বিক তত্ত্বাবধানে সবধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করছে সিঙ্গাপুর।
সিঙ্গাপুরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সিঙ্গাপুরে প্রথম আক্রান্ত ৫ জনের মধ্যে ৪ জনই এখন সুস্থ। গুরুতর অসুস্থ ১জনের অবস্থারও উন্নতি হয়েছে।

বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

এপ্রিল ০৭, ২০২০

ত্রাণ না পেয়ে রাস্তায় অনেক পরিবহন শ্রমিক

নভেল করোনাভাইরাস ঠেকাতে সাধারণ ছুটি চলছে দেশে। অফিস-
ব্যবসা বন্ধ। বন্ধ গণপরিবহনও। পরিবহন শ্রমিকরাও কর্মহীন। জেলা প্রশাসনকে ত্রাণ সরবরাহের নির্দেশ দেয়া হলেও অনেক জেলায়ই তা পাননি পরিবহন শ্রমিকরা। ত্রাণ না পাওয়ার অভিযোগ এসেছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের কাছ থেকে। ফেডারেশনের নেতারা জানিয়েছেন, ত্রাণ না পাওয়ায় জীবিকার তাগিদে অনেকেই রাস্তায় নামার চেষ্টা করছেন। এমন অবস্থায় করোনা ঠেকাতে মানুষের চলাচল নিয়ন্ত্রণে সরকারের কৌশল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তারা।

গতকাল এক বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও সাবেক নৌপরিবহন মন্ত্রী শাজাহান খান এবং সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক ওসমান আলী পরিবহন শ্রমিকদের না পাওয়ার বিষয়টি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তারা বলেন, কোটি কোটি মানুষকে পরিবহনের কাজে নিয়োজিত পরিবহন শ্রমিকরা দিনরাত কাজ করেন। গাড়ি চললে পরিবহন শ্রমিকদের সংসার চলে। সবসময় মানুষের সংস্পর্শে আসায় পরিবহন শ্রমিকদের স্বাস্থ্যঝুঁকিও বেশি। এদিকে উপার্জন বন্ধ থাকায় হাজার হাজার পরিবহন শ্রমিক মানবেতর জীবন যাপন করছেন। উপায়হীন হয়ে অনেক পরিবহন শ্রমিক রাস্তায় নামারও চেষ্টা করছেন। পরিবার-
পরিজন নিয়ে অর্ধাহারে-
অনাহারে থাকার যন্ত্রণা শ্রমিকদের কাছে করোনা সংক্রমণের ভয়ের চেয়ে বড় হয়ে উঠছে।

এমন অবস্থায় পরিবহন শ্রমিকদের জন্য বিশেষ বরাদ্দের আহ্বান জানিয়েছেন সংগঠনটির নেতা রা। তারা বলছেন, অর্থনীতিকে সচল রাখতে পরিবহন শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করাটা জ রুরি। ট্রেড ইউনিয়নগুলো থেকে তালিকা সংগ্রহ করে শ্রমিক পরিবারগুলোকে বিনা মূল্যে খাবার ও করোনা সুরক্ষা উপকরণ সরবরাহ করতে হবে।

পাশাপাশি শ্রমিকদের জন্য বিশেষ বরাদ্দেরও দাবি জানিয়েছেন তারা।

শ্রমিক নেতারা জানিয়েছেন, শ্রমিকদের একটি তালিকা ডিসিদের কাছে দেয়া হয়েছে। এছাড়া শ্র মিক ইউনিয়নগুলোর কল্যাণ তহবিল থেকেও ত্রাণ দেয়া হবে। এছাড়া মালিক সমিতির পক্ষ থে কে শ্রমিকদের সাহায্য-
সহযোগিতা করা হচ্ছে। এই জাতীয় দুর্যোগে সড়ক পরিবহনসহ সব শ্রেণীর শ্রমিকদের শান্ত থে কে এবং নিয়ম মেনে নিজ নিজ এলাকায় অবস্থানেরও অনুরোধ জানিয়েছেন তারা।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিপুল পরিমাণ মানুষ পরিবহন পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত। টিকিট কাউন্টার পরিচালনা, রুট পরিচালনাসহ বিভিন্ন ধরনের কাজ করেন তারা। দেশের বিভিন্ন পরিবহন শ্রমিক সংগঠনের হিসাবে সারা দেশে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে পরিবহন শ্রমিকের সংখ্যা ৫০ লাখের বেশি।

খাদ্য সহযোগিতার পাশাপাশি সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের কাছে প্রণোদনাও দাবি করে আবেদন করেছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন। এছাড়া পরিবহন শ্রমিকদের জন্য ১০ টাকা কেজি চাল বরাদ্দ রাখার দাবি জানিয়ে গত ২৭ মার্চ সরকারের কাছে চিঠি দেয় সং গঠনটি। শ্রমিক ও শ্রমিক নেতাদের দাবি, এর কোনোটাই এখনো পর্যন্ত তারা পাননি।

বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

এপ্রিল ০৮, ২০২০

তৈরি পোশাক রফতানি মার্চে কমেছে ২৭%

বৈশ্বিক মহামারী কভিড-১৯-
এর প্রাদুর্ভাবে দেশের তৈরি পোশাক খাতের রফতানি গন্তব্যে দেশগুলোর প্রায় সবকয়টিই এখন আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ লকডাউনে। একের পর এক ক্রয়াদেশ বাতিল ও স্থগিতের পাশাপাশি নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে বাংলাদেশেও গত ২৬ মার্চ থেকে চলছে অঘোষিত লকডা উন। এ পরিস্থিতিতে রফতানি কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। পোশাক খাতের উৎপাদন ও রফতা নিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ জানিয়েছে, মার্চে বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাকের রফতানি কমেছে ২৭ শতাংশ।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) থেকে সংগৃহীত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে বিজিএমইএ জানিয়েছে , মার্চে বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক রফতানি হয়েছে ১৯৭ কোটি ২২ লাখ ৪০ হাজার ডলার মূ

ল্যের। এর আগে গত বছরের একই সময়ে এ রফতানির পরিমাণ ছিল ২৬৯ কোটি ৫ লাখ ৪০ হাজার ডলার। এ হিসাবে রফতানি কমেছে ৭১ কোটি ৮৩ লাখ ডলার বা ২৬ দশমিক ৭০ শতাংশ।

প্রসঙ্গত, চীনের উহানে কভিড-১৯-
এর প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় গত ডিসেম্বরের শেষে। ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে তা বিশ্বের অধিকাংশ দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এ প্রেক্ষাপটে চলতি বছরের জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারিতেও তৈরি পোশাকের রফতানি ছিল কমতির দিকে। এ ধারা অব্যাহত ছিল মার্চেও।

চীনে নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ছড়ানোর পর দেশটি থেকে কাঁচামাল আনতে পারছিলেন না তৈরি পোশাক খাতের উৎপাদনকারীরা। কারণ করোনার প্রভাবে দেশটির বাণিজ্যিক কার্যক্রম সে সময় পুরোপুরি বন্ধ হয়ে পড়ে। ফলে শুরুতেই কাঁচামাল সরবরাহ সংকটে পড়ে যায় তৈরি পোশাক খাত। কারণ দেশের তৈরি পোশাক খাতের ওভেন পণ্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কাপড়ের আনুমানিক ৬০ শতাংশই আমদানি হয় চীন থেকে। অন্যদিকে নিটওয়্যারের ক্ষেত্রে চীন থেকে কাঁচামাল আনতে হয় আনুমানিক ১৫-
২০ শতাংশ। পরবর্তী সময়ে ধীরগতিতে হলেও কাঁচামাল সরবরাহ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু করে। কিন্তু এ মুহূর্তে চাহিদা সংকট মোকাবেলা করতে হচ্ছে তৈরি পোশাক খাতকে।

সূত্রমতে, বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠানকে দেয়া ক্রয়াদেশ বাতিল-
স্থগিত করা ক্রেতাদের মধ্যে প্রাইমার্কের মতো বড় ক্রেতা প্রতিষ্ঠানও আছে। আয়ারল্যান্ডভিত্তিক প্রাইমার্কের পাশাপাশি ক্রয়াদেশ বাতিল-স্থগিত করছে ইউরোপের ছোট-মাঝারি-
বড় সব ধরনের ক্রেতাও। আবার এইচঅ্যান্ডএম, ইন্ডিটেক্স, মার্কস অ্যান্ড স্পেনসার, কিয়াবি, টার্গেট, পিভিএইচসহ আরো কিছু ক্রেতা ক্রয়াদেশ বহাল রাখার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে। ফলে সামনের দিনগুলোয় ক্রয়াদেশ বাতিল-
স্থগিতের পরিমাণ কমে আসতে পারে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

বিজিএমইএর তথ্য বলছে, গতকাল সকাল ৭টা পর্যন্ত ১ হাজার ১১৬ কারখানায় ৩০৫ কোটি ডলারের ক্রয়াদেশ বাতিল ও স্থগিত হয়েছে। এসব ক্রয়াদেশের আওতায় ছিল ৯৫ কোটি ৩০ লাখ পিস পোশাক। এসব কারখানার মোট শ্রমিক সংখ্যা ২১ লাখ ৯০ হাজার।

পোশাক খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, চলতি বছরের শুরু থেকেই পোশাক রফতানির পরিস্থিতি ছিল বেশ টালমাটাল। ক্রেতারা ক্রয়াদেশ কমিয়ে দিচ্ছিলেন। তাদের বিক্রয় কেন্দ্রগুলো একের পর এক বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ক্রয়াদেশ প্রাপ্তির পরিমাণও ছিল তুলনামূলক কম। ক্রয়াদেশ যতটুকু পাওয়া যাচ্ছিল, তার দামও ছিল কম। এ প্রবণতা ইউরোপের বাজারগুলোতেই বেশি। আবার সেখানকার পোশাক ক্রেতাদের ভোক্তা আচরণেও ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে এখন অনলাইনভিত্তিক কেনাকাটার প্রবণতা বাড়ছে। এ অবস্থায় দেশের পোশাক খাতের ওপর অনেক বড় একটি আঘাত হানল নভেল করোনাভাইরাস।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিজিএমইএ সভাপতি ড. রুবানা হক বণিক বার্তাকে বলেন, পোশাক র ফতানি পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে পোশাক খাতের অ বস্থা কতটা নাজুক। সংকট এখনো চলমান।

রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে ৩৩ ১ কোটি ডলারের পোশাক রফতানি হয়েছিল। সে সময় গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৯ দশমিক ৭ শতাংশ। এর পরের মাসেই বড় ধরনের পতন হয় পোশাক রফতানি র। আগস্টের মধ্যে প্রবৃদ্ধি নেমে আসে ঋণাত্মক ১১ দশমিক ৪৬ শতাংশে। এরপর অক্টোবর ও নভেম্বরে এ প্রবৃদ্ধি আরো নেমে দাঁড়ায় যথাক্রমে ঋণাত্মক ১৯ দশমিক ৭৯ ও ঋণাত্মক ১১ দশমিক ৯৮ শতাংশে।

এরপর ডিসেম্বরে রফতানি আবার ইতিবাচক প্রবৃদ্ধির ধারায় ফিরে আসে। ওই মাসে রফতানি প্রবৃদ্ধি হয় ১ দশমিক ২৬ শতাংশ। কিন্তু জানুয়ারি থেকে আবারো নেতিবাচক বা ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধির ধারায় ফিরে আসে তৈরি পোশাক খাত। ওই সময় রফতানি প্রবৃদ্ধি ছিল ঋণাত্মক ২ দশমিক ৯৮ শতাংশ। এরপর ফেব্রুয়ারিতে আন্তর্জাতিক বাজারে পোশাক রফতানি হয় ২৫৯ কোটি ৪৫ লাখ ডলারের। যেখানে গত অর্থবছরের ফেব্রুয়ারিতে পোশাক রফতানি ছিল ২৭৫ কোটি ৩৬ লাখ ১০ হাজার ডলারের। এ হিসেবে ফেব্রুয়ারিতেও পোশাক রফতানি হ্রাস পায় ৫ দশমিক ৭৮ শতাংশ।

প্রথম আলো
০৮ এপ্রিল ২০২০

করোনাকালের দুর্যোগ

এটা কি জ্ঞানহীনতার পরিচয় না—পোশাকশ্রমিক নাজমার প্রশ্নের জবাব কে দেবে

কুর্‌রাতুল-আইন-তাহ্‌মিনা

করোনার কালেও পেটে ভাত দিতে হয়। পেট অনেকগুলো। ‘দেশে’ দুটি ছোট মেয়ে, বুড়ো মা আর শ্বশুর। ঢাকায় নিজে আর স্বামী। ‘কামাইকাজের লোক’ শুধু স্বামী-স্ত্রী দুজন।

দুজন গাজীপুরের টঙ্গী বিসিক শিল্পনগরীতে একই কারখানায় কাজ করেন। গত ৩১ মার্চ কাজের শেষে শ্রমিকদের বেতন দিয়ে কারখানাটি বন্ধ হয়। তাঁরা সেদিনই দেশে চলে যান। চার বছরের মেয়েটি অসুস্থ ছিল, তার জন্য মন পুড়ছিল।

৫ এপ্রিল কারখানা খোলার কথা ছিল। মোসাম্মাত রাবেয়া বেগম সেদিন সকালে স্বামীর সঙ্গে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার নবীনর গ্রাম থেকে টঙ্গী ফিরে আসেন। এসে কারখানা বন্ধ পান।

সেদিনই দুপুর ১২টার দিকে পাগাড় সোসাইটির মাঠ এলাকায় তাঁদের ভাড়া বাসায় আমার সঙ্গে রাবেয়ার দেখা। তিনি তখন উঠানে এজমালি রান্নার চালাঘরে নতুন মাটির চুলা ঠিকঠাক করছেন। খরচাপাতি করে গ্যাসের চুলা কিনেছিলেন। কিন্তু গ্যাস কিনতে পারছেন না।

রাবেয়া অপারেটর, স্বামী প্যাকিং বিভাগে কাজ করেন। ওভারটাইমসহ দুজনে মিলে মাসে কমবেশি ২০ হাজার টাকা আয় করেন। বিদ্যুৎ বিলসহ ঘরভাড়া কখনো ৪ হাজার টাকা ছাড়িয়ে যায়। বাকি টাকায় গ্রামের আর এখানকার দুই সংসার চলে।

রাবেয়া বলেন, আগের রাতে বাস ছিল না। ট্রাকে করে, পায়ে হেঁটে, বহু কষ্টে ফিরেছেন। খরচ পড়েছে ২ হাজার টাকার মতো। রাস্তায় রাস্তায় পুলিশ গাড়ি থামিয়েছে। ড্রাইভার বাড়তি টাকা নিয়েছে। যাওয়ার সময়ও গাড়ির সংকট ছিল, বেশি টাকা লেগেছে।

কারখানার লোকজন ফোনে সবাইকে জানিয়েছে, ৫ তারিখ থেকে আবার খোলা। সুতরাং আসতে হতোই। রাবেয়া বলেন, ‘এক দিন অ্যাবসেন্ট করলে যদি আমাদের বাইর কইরা দেয়, তয় তো করার কিছু নাই।’

ছুটি আরও বাড়বে জানলে এখন তাঁরা ফিরতেন না। মার্চের বেতন থেকে বাড়িতে টাকা দিয়েছেন। গাড়িভাড়া দিয়ে হাতে এখন টাকা নেই। রাবেয়া বলেন, ‘আর তো খাওয়ার মতো তৌফিক নাই ঘরে।’টঙ্গীরই পূর্ব গোপালপুর এলাকায় স্বামী আর ছোট ছেলেকে নিয়ে ভাড়া বাসায় থাকেন মোসাম্মাত নাজমা আক্তার। শিল্পনগরীর একটি কারখানায় তিনি কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর। তাঁর স্বামীও পোশাকশ্রমিক।

টিনচালা পাকা ঘরটির দরজায় দাঁড়িয়ে নাজমা বলেন, ২৪ তারিখ জেনেছিলেন, কারখানা ৪ এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। সেটা ছিল করোনাভাইরাস ঠেকাতে সরকারি-বেসরকারি অফিসে সাধারণ ছুটি ঘোষণার প্রথম দফা। তাঁরা তখন বগুড়ার শেরপুরে গ্রামের বাড়িতে চলে যান।

চলতি মাসের শুরুতে ১১ এপ্রিল পর্যন্ত ছুটি বাড়ার ঘোষণা এলে নাজমা ভেবেছিলেন, তাঁদের ছুটিও বাড়বে। তাঁর কথায়, ‘একটা মসজিদে যদি ১০০ জন লোক একসঙ্গে যাইতে সরকার

থেইকা নিষেধ করা হয়, তাইলে একটা গার্মেন্টসে দুই-তিন হাজার লোক কেমন করে কাজ করবে?'

নাজমা অবশ্য জানতেন, বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছিলেন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে পোশাক কারখানা খোলা রাখা যাবে। তবু তিনি ৩ মার্চ সন্ধ্যা পর্যন্ত তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ, সরকার অথবা কারখানার মালিকের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করেন।

আমাকে নাজমা বলেন, 'অফিসে যোগাযোগ করছি, স্যারেদের সাথে, বসেদের সাথে যে, আমাদের আসলেই ছুটিটা বাড়বে, নাকি নির্ধারিত সময়ে অফিসে যেতে হবে?' তাঁরা তাড়াতাড়ি ফিরতে বলেছেন।

হাজিরা না দিলে নাকি চাকরি চলে যেতে পারে অথবা এ কয়দিনের ছুটি আমলে না নেওয়া হতে পারে। 'মালিক যদি খোলা রাখে, আর এই সময় যদি চাকরি চলে যায়, এই ভয়ে আমার বাধ্য হয়া, জীবনের ঝুঁকি নিয়াই আসছি', বলেন নাজমা।

৪ এপ্রিল টঙ্গী ফেরার পর রাতে নাজমা শোনেন, বিজিএমইএ কারখানা বন্ধ রাখতে অনুরোধ করছে। তাঁর প্রশ্ন, 'এই যে আমাদের একটা ভোগান্তি—গ্রামে যারা ছিল, তারা বাড়িতেই ছিল—লক্ষ লক্ষ মানুষ যে আবার ঢাকা শহরে আইল, এটা কি বিজিএমইএ কিংবা সরকারের একটা জ্ঞানহীনতার পরিচয় না?'

আমি ভাবি, প্রশ্নটা কি নিছক জ্ঞানহীনতার? প্রভাবশালী কারও হেলাফেলা আর স্বার্থচিন্তার চূড়ান্ত প্রকাশও কি এটা নয়?

বাণিজ্যমন্ত্রী পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি। গত প্রায় ২০ দিনে বিজিএমইএ ও নিট পোশাক মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএ একাধিকবার কারখানা খোলা রাখার পক্ষে সায় দিয়েছে। শ্রম মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকেও একাধিকবার এই বার্তা গেছে যে সুরক্ষা পোশাক)পিপিই(, মাস্ক, জীবাণুনাশক ইত্যাদি তৈরি করাসহ জরুরি প্রয়োজনে কড়াকড়িভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কারখানা খোলা রাখতে বাধা নেই।

ইতিমধ্যে সাধারণ ছুটি আরও দুদিন বেড়েছে। অবশেষে মালিকদের সংগঠন দুটিও ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত কারখানা বন্ধ রাখার সুস্পষ্ট যৌথ ঘোষণা দিয়েছে। তবে তারা বলেছে, সংগঠনকে জানিয়ে কেবল পিপিই বানানো আর জরুরি রপ্তানি ক্রয়াদেশের কাজ চলতে পারবে।

যাক। আমরা ধাপে ধাপে সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বিশ্বাসী। আজ মনে হলো এতটুকু করি, কাল মনে হলো কড়াকড়ি আরেকটু বাড়াই। ছুটি বাড়াই দুদিন করে করে। করোনাভাইরাসকে ধাপে ধাপে বরণ করি অথবা অল্পে অল্পে কুলার বাতাস দিয়ে তাড়াতে চাই।

এদিকে করোনা-বন্ধ বা লকডাউন না চললেও রাবেয়া এখন দেশে ফিরতে পারতেন না। মার্চের বেতন শেষ, দোকান বাকি দেবে কি না তা অনিশ্চিত। তিনি বলেন, 'এই যে বন্ধের পর বন্ধ দিতাছে, সামনের স্যালারি পাব কি না, হের তো কোনো নিশ্চয়তা নাই।'

এসে থেকে শুনছেন, কারখানার কাজের আদেশ বাতিল হয়ে যাচ্ছে। কারখানা চলবে কি না, সেটা জানা তাঁর বড় দরকার। রাবেয়া বলেন, 'এখন তো আমাদের কিছু করার নাই। আরও অসহায় হইয়ে গেলাম।'

চার-পাঁচ বছর হয় রাবেয়ারা গাজীপুর এসেছেন, 'শুধু গার্মেন্টস করে খাইতেছি। গার্মেন্টস ছাড়া তো আমাদের কিছু নাই। বাড়ি যায়া করব কী?' রাবেয়া বলেন, মালিকেরা কী করতে পারেন, সেই আশাতেই থাকতে হবে।

নাজমাও অপেক্ষা করছেন। প্রথমত মার্চের বেতনের জন্য। দ্বিতীয়ত, তিনি শুনেছেন, সরকার তিন মাসের বেতন-ভাতার জন্য সাহায্য দেবে। কীভাবে কখন তা পাবেন, সেটা জানতে চান।

বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ ১৬ এপ্রিলের মধ্যে মার্চের বেতন দিয়ে দিতে সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনুরোধ করেছে। টঙ্গী থেকে ফিরে রাতে ফোনে কথা বলেছিলাম বিজিএমইএর সহসভাপতি আরশাদ জামালের সঙ্গে। তিনি বললেন, বেশির ভাগ কারখানা শ্রম আইনের ১৬-এর ২ ধারায় কাজ বন্ধ করেছে।

এতে শ্রমিকেরা লে-অফের নিয়মে বন্ধের পর ৪৫ দিন পর্যন্ত বেতন-ভাতা পাবেন। বাড়িভাড়া, চিকিৎসাভাতা ও খাদ্যভাতা পুরোপুরি, আর মূল বেতনের অর্ধেক। কারখানা যদি আরও অন্তত ১৫ দিন বন্ধ থাকে, তবে শ্রমিকেরা মূল বেতনের এক-চতুর্থাংশ এবং ভাতাগুলো পাবেন। তবে আইন বলছে, সে ক্ষেত্রে মালিক আইনের ২০ ধারায় প্রাপ্য বুঝিয়ে দিয়ে ছাঁটাইও করতে পারবেন।

আরশাদ জামাল বলছেন, তখন কোনো কারখানা কাজ হারিয়ে পথে বসতে নিলে তেমন ছাঁটাই হতে পারে। তিনি আরও বলছেন, বন্ধ অত দিন গড়ালে কারখানাগুলোর কাজে অন্য রকম জট লেগে যাবে।

মালিকেরা কিন্তু আরও আগে থেকেই এসব সমস্যার কথা বলে সরকারের কাছ থেকে সুবিধা চেয়ে আসছেন। সরকার একাধিক আর্থিক প্রণোদনা ঘোষণাও করেছে। এগুলোর একটি হচ্ছে রাবেয়া নাজমাদের মতো শ্রমিকদের জুন পর্যন্ত তিন মাস বেতন দেওয়ার জন্য বাণিজ্যিক ঋণসুবিধা।

এই ঋণ পেতে হলে প্রতিষ্ঠানকে নিয়মিত বেতন দেওয়ার এবং রপ্তানি চলমান থাকার প্রমাণপত্র দেখাতে হবে। ঋণদাতা ব্যাংক সরাসরি বেতনের টাকাটা শ্রমিকের ব্যাংক অথবা মোবাইলের অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেবে। বেতন ধরা হবে আগের তিন মাসের গড় বেতনের নিরিখে।
কথাবার্তা বলে যা বুঝলাম, শিল্পমালিকেরা এই ঋণ ও বেতন দেওয়ার পথটি খুব সহজ বলে ভাবছেন না। পরিশোধ করতে হবে, সেটা একটা জটিলতা। লে-অফের নিয়মে আধা বেতন নাকি তিন মাসের গড় বেতনের সমপরিমাণ, সে নিয়েও একটা বাহাস লেগে যেতে পারে।

আরেকটা কথা। বদলি বা সাময়িক শ্রমিক, যাঁদের নাম মাস্টাররোলে নেই, তাঁরা কিন্তু এসব কোনো সুযোগের দাবিদার হবেন না। বিশেষক করে তেমন শ্রমিকদের এখনই ছাঁটাই হওয়ার অনেক ঘটনার কথা কানে এল।

টঙ্গীতে বিসিক শিল্পনগরীটি রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক আর বস্ত্র খাতের একটি বড় কেন্দ্র। বড় কারখানার পাশাপাশি ঠিকা ছোট কারখানাতেও অনেক শ্রমিক কাজ করেন। এই কারখানাগুলো বন্ধ হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকবে।

এটা ঠিক যে করোনার আসর মালিকদের রেয়াত দেবে না। তবে সরকারের কাছে দেনদরবার করার পথ তাঁদের সর্বদা খোলা থাকে। রাবেয়া বা নাজমার গলা কার কানেই–বা পৌঁছাবে?

প্রথম আলো
০৭ এপ্রিল ২০২০

প্রতি ৫ কর্মজীবীর ৪ জনই ক্ষতিগ্রস্ত হবে

করোনার বিপর্যয়ে বিশ্বের পাঁচজন কর্মজীবীর চারজনই কোনো না কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। লকডাউনের কারণে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কারখানা পুরোপুরি বা আংশিক বন্ধ থাকায় তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। বর্তমানে ৩৩০ কোটি কর্মজীবী মানুষের মধ্যে ৮১ শতাংশ এমন অবস্থায় আছেন।

আজ মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা)আইএলও (প্রকাশিত করোনার বিপর্যয়ে কর্মসংস্থান ও কর্মঘণ্টায় প্রভাব বিষয়ক এক প্রতিবেদনে এই চিত্র ওঠে এসেছে।

আইএলও-এর ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ২০২০ সালে দ্বিতীয় প্রান্তিকে)এপ্রিল-জুন (বিশ্বব্যাপী মোট কর্মঘণ্টার ৬ দশমিক ৭ শতাংশ কমে যাবে। অর্থাৎ সাড়ে ১৯ কোটি পূর্ণকালীন শ্রমিকের কর্মঘণ্টার সমান কর্মঘণ্টা কমে যাবে। এর মধ্যে আরব বিশ্বে ৫০ লাখ পূর্ণকালীন শ্রমিকের কাজের সমান কর্মঘণ্টা নষ্ট হবে। এ ছাড়া ইউরোপে এক কোটি ২০ লাখ এবং এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ১২৫ কোটি পূর্ণকালীন শ্রমিকের কাজের সমান কর্মঘণ্টা নষ্ট হবে। উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশগুলোতেই কর্মঘণ্টায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হবে।

আইএলও-এর মহাপরিচালক গাই রাইডার বলেন, উন্নত ও উন্নয়নশীল -সব দেশের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও শ্রমিকেরা করোনার কারণে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে। দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে তা কার্যকর করতে পারলেই টিকে থাকা ও বিপর্যয়ের মধ্যে পার্থক্য গড়ে তোলা যাবে।

আইএলও-এর মতে, আবাসন)হোটেল-মোটেল(, খাবার ব্যবসা, উৎপাদন, খুচরা ব্যবসা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে আছে। করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর কি ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছে বা নেবে -এর ওপরেই শ্রমবাজারে ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি নির্ভর করছে।

আইএলও আরও বলছে, নতুন এক সমীক্ষা অনুযায়ী, সোয়া ১২৫ কোটি শ্রমিক সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে আছেন। তাঁরা এমন সব খাতে কাজ করেন যেগুলো করোনার প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এসব খাতের বহু প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যেতে পারে কিংবা মজুরি কমিয়ে দিতে পারে। আইএলও বলছে, আমেরিকা অঞ্চলের ৪৩ শতাংশ এবং আফ্রিকা অঞ্চলের ২৬ শতাংশ শ্রমিক কাজ হারানো বা মজুরি কমে যাওয়ার মতো ঝুঁকিপূর্ণ খাতগুলোতে কাজ করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
২২ এপ্রিল, ২০২০

‘ধ্বংসের মুখে বাংলাদেশি পোশাক শ্রমিকরা’

করোনা ভাইরাসের প্রাণঘাতী থাবায় ভেঙ্গে গেছে বিশ্ব অর্থনীতি। করোনা ভাইরাসের দিনগুলোতে কর্মহীন হয়ে পড়েছে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ। করোনা ঠেকানোর লকডাউন অসহায় করে দিয়েছে নিম্ন আয়ের শ্রমজীবী মানুষকে। বিশ্ব গণমাধ্যম সিএনএন বলছে ধ্বংসের মুখে পড়েছে বাংলাদেশি পোশাক শ্রমিকরা।

ফাতেমা আক্তার নামের ২৫ বছর বয়সী নারী এক পোশাক শ্রমিকের কর্ম হারানোর গল্প দিয়ে শুরু হয় আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের ওই প্রতিবেদন।

আলিফ ক’যাল ওয়ার গার্মেন্টস ফ্যাক্টোরিতে কাজ করতেন ফাতেমা। মার্চের শেষের দিকে তিনি যেদিন কাজে গিয়েছেন, তিনি জানতে পারেন সেদিনেই তার শেষ কর্ম দিবস। যা তার কল্পনাতেও ছিল না। ফাতেমা পাঁচ বছর যাবত কাজ করতো এ প্রতিষ্ঠানে। ফাতেমা বলেন, ‘আমাদের প্রধান লাইন ম্যান এসে আমাকে বললো আমি আর কাজ করতে পারবো না।’

তিনি বলেন, কম্পানি কোন মন্তব্য ছাড়াই কারখানা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যে কারণে মার্চ থেকেই তাকে কোন বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা ছাড়াই চলে যেতে হয়েছে।

বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যঅকচারার্স এ্যান্ড এক্সপোর্টার এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) বলছে, করোনা ভাইরাসের মহামারির কারণে প্রায় ৪১ লক্ষ পোশাক শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছে। যা দেশের মোট পোশাক শ্রমিকের অর্ধেকেরও বেশি।

ফাতেমার মতো তাদের বেশির ভাগই নারী যারা প্রতি মাসে ১১০ মার্কিন ডলার আয় করে যা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় সাড়ে ৯ হাজার। আবার এটাই তাদের পরিবারের এক মাত্র উপার্জনের রাস্তা।

ফাতেমা তার স্বামী এবং বাচ্চার জন্য কাজ করেন জানিয়ে বলেন, ‘আমার পরিবার আমার একমাত্র আয়ে চলতো। আমি এখন জানি না কি করে আমার পরিবার চলবে।’

বিশ্বজুড়ে লকডাউন আর অভূতপূর্ব কর্ম হারানো মানুষের মধ্যে এমন কিছুর চাহিদা এসেছে যা কেবল খাদ্য কিংবা বস্ত্র নয়। যার ফলে বাংলাদেশি পোশাক শ্রমিকদের সস্তা শ্রমের উপর নির্ভরশীল আন্তর্জাতিক ব্রান্ড কিংবা পরিবেশকদের চুক্তি বাতিল করেছে। বিজিএমইএ বলছে, এ অর্থের পরিমাণ হবে অন্তত ৩.১৭ বিলিয়ন ডলার বা ৩১৭ কোটি।

বিজিএমইএ সভাপতি ড. রুবানা হক বলছেন, ‘এটি অসত্য ও অবাস্তব।’

তিনি আরও বলেন, দেশে খুব সামান্য আইনি আশ্রয় নেওয়া সুযোগ আছে যেটার মাধ্যমে বিশ্বের খুচরা বিক্রেতাদের চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করার দাবি করতে পারে কারখানাগুলো।

ড. রুবানা বলেন, 'আমি কোন অনুদান চাই না, আমি কোনও ধরণের দাতব্য চাই না, আমি কেবল আমাদের কর্মীদের জন্য নূন্যতম ন্যায়বিচার চাই।'

বাংলাদেশের পোশাক কারখানা গুলো জিডিপিতে ১৬ শতাংশ অবদান রাখেছে। গত বছর রপ্তানির ৮০ শতাংশই পুরণ হয় দেশের তৈরি পোশাক দিয়ে। আর সে হিসেবে গতবছর ৩০ বিলিয়ন ডলার বা ৩ হাজার কোটি আয় করে। সিএনএন।

কালের কণ্ঠ

২২ এপ্রিল, ২০২০

প্রণোদনা প্যাকেজের সুবিধা নিতে বিপুল আগ্রহ ব্যবসায়ীদের

অনেকেই ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন শুধু করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ও নিয়মিত ঋণ পরিশোধকারীরা সুবিধা পাবেন

জিয়াদুল ইসলাম : করোনাভাইরাসের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষতি মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ নিয়ে ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিপুল আগ্রহ তৈরি হয়েছে। এর আওতায় কারা ঋণ সুবিধা পাবে এবং ঋণ পেতে কী কী শর্ত পূরণ করতে হবে এবং ঋণ বিতরণ ও আদায় (ফেরত) প্রক্রিয়া কী হবে সেটি জানতে অনেকেই ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। এরই মধ্যে রপ্তানিমুখী শিল্প খাতের শ্রমিকদের বেতন-ভাতার তহবিলের ঋণ পেতে ব্যাংকে আবেদন করেছেন আগ্রহীরা। বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে এমনটিই জানা গেছে।

ব্যবসয়ীরা বলছেন, করোনা নিয়ে ব্যবসায়ীরা যখন হতাশ হয়ে পড়ছিলেন, ঠিক তখনই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রণোদনা তহবিলের ঘোষণা দেন। এ ঘোষণা ব্যবসায়ীদের উজ্জীবিত করেছে, অনুপ্রাণিত করেছে। তবে এ তহবিলের সুবিধা যাতে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তরা পান সেটি নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়া সংকটকালীন সময়ে ব্যাংকঋণের সুদ চার্জ স্থগিতের মতো মধ্যমেয়াদি পদক্ষেপ নেওয়ারও অনুরোধ করেন তাঁরা।

করোনাভাইরাসে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষতি পূরণে গত ৫ এপ্রিল ৭২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী। এগুলো হলো ক্ষতিগ্রস্ত বড় শিল্প ও সেবা খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাবদ ৩০ হাজার কোটি, ক্ষুদ্র (কুটিরশিল্পসহ) ও মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর ওয়ার্কিং ক্যাপিটালে ২০ হাজার কোটি, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবর্তিত এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের (ইডিএফ) আকার পাঁচ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত তথা ১২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা, প্রিশিপমেন্ট ক্রেডিট রিফাইন্যান্স স্কিম নামে বাংলাদেশ ব্যাংক পাঁচ হাজার কোটি টাকার একটি নতুন ঋণ সুবিধা চালু এবং রপ্তানিমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধ করার জন্য পাঁচ হাজার কোটি টাকার আপৎকালীন প্রণোদনা। এ ছাড়া গত ১২ এপ্রিল কৃষি খাতের জন্য পাঁচ হাজার কোটি টাকার তহবিল গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

জানা গেছে, ক্ষতিগ্রস্ত যেসব ব্যবসায়ীর সঙ্গে ব্যাংকের সম্পর্ক ভালো, নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করেছেন, মূলত তাঁরাই এ প্যাকেজ থেকে ঋণ পাবেন। কোনো খেলাপি এসব প্যাকেজের সুবিধা পাবেন না। এরই মধ্যে প্যাকেজগুলো বরাদ্দ নিয়ে নীতিমালা জারি করা হয়েছে।

এ বিষয়ে এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি মীর নাসির হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, করোনার কারণে এমনিতেই সারা দেশ লকডাউন হয়ে গেছে। কারখানাগুলোর সবই প্রায় বন্ধ। কিন্তু কারখানা বন্ধ থাকলেও কর্মীদের বেতন দেওয়ার প্রশ্ন রয়ে গেছে। আবার কারখানার উৎপাদন না থাকলেও কিছু অপারেশনাল এক্সপেন্স থেকে যায়। অফিস ভাড়া, ইউটিলিটি বিল—এ রকম আরো খরচ আছে। কারখানার আয় চলমান না থাকলে যে কারো পক্ষে এটা দেওয়া কঠিন। তারপর আছে ব্যাংকঋণ, দীর্ঘমেয়াদি ঋণের পাশাপাশি চলতি মূলধন ঋণ রয়ছে।?এগুলোতে প্রতি মাসেই সুদ চার্জ হচ্ছে। তাই এখানে প্রণোদনা না দিলে ব্যবসায়ীরা টিকতে পারতেন না।

তিনি বলেন, সরকার প্রণোদনা হিসেবে যেটা দিয়েছে সেটা হলো শিল্পের চলতি মূলধন ঋণ। এটা অবশ্যই ভালো পদক্ষেপ। তবে এর সুবিধা যেন প্রকৃতপক্ষে উৎপাদনে যারা আছে সেসব শিল্পপ্রতিষ্ঠান পায়, সেটা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি আরো বলেন, করোনার ক্ষতি পোষাতে শুধু প্রণোদনা প্যাকেজেই হবে না, আরো নীতি সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন। এর মধ্যে সংকটকালে দীর্ঘমেয়াদি ঋণের সুদ চার্জ স্থগিত রাখার নির্দেশনা দিতে পারে সরকার।

এ বিষয়ে এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ইএবি) সভাপতি আব্দুস সালাম মুর্শেদী কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘করোনাভাইরাসের ক্ষতি নিয়ে ব্যবসায়ীরা যখন হতাশ, ঠিক তখনই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাঁচটি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেন। এটা আমাদের কাছে অনেকটা অপ্রত্যাশিত ছিল। এর মধ্যে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বড় এবং সেবা শিল্প ও রপ্তানি খাত রয়েছে। সর্বশেষ কৃষি খাতের জন্যও প্রণোদনা ঘোষণা করা হয়েছে। বলা চলে সব খাতই প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় এসেছে। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত প্রণোদনা সব খাতের ব্যবসায়ীকে উজ্জীবিত করেছে, অনুপ্রাণিত করেছে। ঘুরে দাঁড়ানোর অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। আমি মনে করি এ সুবিধা নিয়ে আমরা সবাই ঘুরে দাঁড়াতে পারব এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে সেই আগের গতি ফিরে আসবে।’

এ বিষয়ে ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি মো. সবুর খান কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘আমি ব্যবসা হিসেবে অনেকগুলো সেক্টরের সঙ্গে জড়িত ছিলাম এবং আছি। আমি কম্পিউটার সমিতির

সভাপতি ছিলাম। সেই সুবাদে আমি দেখলাম এখান দুই হাজার ব্যবসায়ী করোনার কারণ ক্ষতিগ্রস্ত, তারা কান্নাকাটি করছে। আবার আমি বেসিসের একজন ফাউন্ডার। এখানে তথ্য-প্রযুক্তির উদ্যোক্তাদেরও একই অবস্থা। আমি আইএফসির সঙ্গেও জড়িত। অর্থাৎ সবখানেই একই অবস্থা। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের সিদ্ধান্ত ভালো। এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু বাস্তবায়নে যারা থাকবে, তারা এটা আদৌ সঠিক লোক দেবে কি না, রাইট জাজমেন্ট করবে কি না, সেটা নিয়ে শঙ্কা থেকে যায়।'

তিনি আমেরিকার উদাহরণ টেনে বলেন, 'আমেরিকা নিম্ন আয়ের প্রত্যেককে এক হাজার ২০০ ডলার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সুবিধা পেতে অনলাইনে একটি ফরম পূরণ করলেই হচ্ছে। তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছে গেছে। আর যাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই তাদের বাসায় পে-অর্ডার চলে যাচ্ছে। যদি আমাদের দেশে এ সিস্টেম করা যেত, একাধিক হাত না ঘুরত, কোনো তদবির না থাকত, তাহলে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তরা প্রণোদনার সুবিধাভোগী হতো।'

বাংলাদেশ গার্মেন্ট অ্যাকসেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএপিএমইএ) সভাপতি আবদুল কাদের খান বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী যে প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন, সেটাকে আমরা স্বাগত জানাই। এরই মধ্যে রপ্তানি খাতের শ্রমিকদের বেতন-ভাতা দিতে পাঁচ হাজার কোটি টাকার তহবিলের সার্কুলার জারি করা হয়েছে। আমরা এ তহবিলের আওতায় সুবিধা পাওয়ার চেষ্টা করছি।' তিনি আরো বলেন, 'আমাদের সংগঠনের অধীনে এক হাজার ২০০ কারখানা রয়েছে। সবই এখন বন্ধ। কিন্তু বন্ধ হলে কী হবে, কর্মীদের বেতন, কারখানার ভাড়া, ইউটিলিটি বিল এগুলো ঠিকই দিতে হচ্ছে।'

বড় ও সেবা শিল্পের জন্য ৩০ হাজার কোটি টাকার তহবিল : করোনাভাইরাসের অর্থনৈতিক ক্ষতি মোকাবেলায় বড় ও সেবা শিল্পের জন্য চলতি মূলধন ঋণ জোগানে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ৩০ হাজার কোটি টাকার তহবিলের ব্যবহার নিয়ে ১২ এপ্রিল নীতিমালা জারি করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, যেসব শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠান করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শুধু সেসব প্রতিষ্ঠানই এর আওতায় সুবিধা পাবে। যেসব ব্যবসায়ী এখনো ব্যাংক থেকে কোনো ঋণ সুবিধা নেননি কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত, তাঁরাও এ তহবিল থেকে ঋণ নিতে পারবেন। এ জন্য তাঁদের আর্থিক বিবরণীর যে রেটিং তা ন্যূনতম মার্জিনাল বা প্রান্তিক হতে হবে। তবে কোনো খেলাপি গ্রহীতা এ তহবিলের ঋণ পাবেন না। এ ছাড়া যেসব প্রতিষ্ঠানের ঋণ মন্দ ঋণে পরিণত হওয়ায় এরই মধ্যে তিনবারের বেশি পুনঃ তফসিল সুবিধা নিয়েছে, তারাও এই প্যাকেজের সুবিধা পাবে না। এ প্যাকেজের মেয়াদ হবে তিন বছর। তবে কোনো একক গ্রাহকের অনুকূলে প্রদত্ত ঋণের জন্য সর্বোচ্চ এক বছর মেয়াদের জন্য এ প্যাকেজের আওতায় সরকার থেকে ভর্তুকি পাওয়া যাবে।

রপ্তানিমুখী শিল্প খাতের শ্রমিকদের বেতন-ভাতা দিতে পাঁচ হাজার কোটি টাকার তহবিল গঠন : গত ২ এপ্রিল এসংক্রান্ত নীতিমালা জারি করে বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে বলা হয়েছে, এ তহবিল থেকে শুধু সচল রপ্তানিমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিকরা ঋণ পাবেন। এ জন্য তাঁদের এককালীন গুনতে হবে ২ শতাংশ সুদ বা সার্ভিস চার্জ। ছয় মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ এই ঋণের টাকা পরিশোধে সময় পাবে দুই বছর। শুধু শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধের জন্য ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। ঋণের টাকা শ্রমিকদের ব্যাংক বা মোবাইল ব্যাংকিং হিসাবের মাধ্যমে সরাসরি দেওয়ার কথা বলা হয়।

ইডিএফ প্যাকেজ : রপ্তানিমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ সুবিধা দিতে বিদ্যমান রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের (ইডিএফ) আকার ৩৫০ কোটি ডলার থেকে বাড়িয়ে ৫০০ কোটি ডলারে উন্নীত করে গত ৭ এপ্রিল সার্কুলার জারি করা হয়। এতে নতুন করে ইডিএফ তহবিলের যোগ হলো ১৫০ কোটি ডলার, যা বাংলাদেশি টাকায় দাঁড়ায় প্রায় ১২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা। শুধু তহবিলের আকারে নয়, এ তহবিলের সুদের হারও কমিয়ে ২ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। ১ এপ্রিল থেকে এই সুবিধা কার্যকর হয়েছে।

সিএমএসএমই খাতে ২০ হাজার কোটি টাকার তহবিল : সিএমএসএমই খাতের উৎপাদন ও সেবা উপখাতকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। তবে ব্যবসা/ট্রেডভিত্তিক মাইক্রো ও ক্ষুদ্র শিল্প এ সুবিধার আওতাভুক্ত হবে। এই প্যাকেজের আওতায় উৎপাদন, সেবা ও ব্যবসা (ট্রেড) উপখাতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বাৎসরিক মোট ঋণ/বিনিয়োগের আনুপাতিক হার হবে যথাক্রমে ৫০, ৩০ ও ২০ শতাংশ। এ তহবিল থেকে ৪ শতাংশ সুদে ঋণ নিতে পারবেন উদ্যোক্তারা। তবে সরকারের দেওয়া ৫ শতাংশ ভর্তুকিসহ ব্যাংক সুদ পাবে ৯ শতাংশ। কোনো ঋণখেলাপি এবং খেলাপি হিসেবে সুবিধা নিয়েছেন এমন কেউ প্রণোদনার ঋণ পাবেন না। করোনার ক্ষতি কাঠিয়ে উঠার উদ্দেশ্যে গঠিত এই তহবিলের ঋণ বিতরণে কোনো ধরনের অনিয়ম হলে প্রদত্ত সুবিধা বাতিল করা হবে। ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোনো অনিয়ম করলে তাদের বিরুদ্ধে জরিমানা আরোপ করবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

প্রিশিপমেন্ট ঋণের জন্য পাঁচ হাজার কোটি টাকার পুনরর্থায়ন তহবিল : স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত যেকোনো খাতের রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠান এই তহবিলের আওতায় ঋণ পাবে। গ্রাহক পর্যায়ে এর সুদের হার হবে সর্বোচ্চ ৬ শতাংশ। বাংলাদেশ ব্যাংকের শিডিউল অব চার্জেস নীতিমালার বাইরে গ্রাহকের কাছ থেকে কোনো ধরনের ফি আদায় করা যাবে না। একজন গ্রাহককে সর্বোচ্চ এক বছরের জন্য বিভন্ন মেয়াদে একাধিকবার ঋণ দিতে পারবে ব্যাংক।

কৃষি খাতের ক্ষতি মোকাবেলায় পাঁচ হাজার কোটি টাকার তহবিল : এ তহবিলের নাম দেওয়া হয়েছে ‘কৃষি খাতে বিশেষ প্রণোদনামূলক পুনরর্থায়ন স্কিম’। এ তহবিল থেকে মাত্র ৪ শতাংশ সুদে চলতি মূলধন ঋণ পাবেন কৃষকরা। আর ব্যাংকগুলো বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে নির্ধারিত ১ শতাংশ সুদ হারে পুনরর্থায়ন সুবিধা পাবে। এ ঋণের মেয়াদ হবে ছয় মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ ১৮ মাস বা দেড় বছর।

দৈনিক ইত্তেফাক

২১ এপ্রিল, ২০২০

মালয়েশিয়ায় খাদ্য সঙ্কটে বাংলাদেশি শ্রমিকরা

অনলাইন ডেস্ক : **মালয়েশিয়ায় করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় জারি করা লকডাউনের ফলে খাদ্য সংকটে ভুগছেন বাংলাদেশি শ্রমিকরা।**

কুয়ালালামপুর থেকে মানবাধিকার কর্মী হারুন আল রশিদের বরাত দিয়ে বিবিসি বাংলার প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়।

তিনি জানান, লকডাউনের পর মালয়েশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাংলাদেশি শ্রমিকরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে খাদ্য সঙ্কটের কথা জানিয়েছেন।

পরিবহন এবং চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞার কারণে এদের কাছে খাদ্য সাহায্য পৌঁছানো যাচ্ছে না বলে জানান রশিদ।

রশিদ মালয়েশিয়া ভিত্তিক বেশ কয়েকটি মানবাধিকার সংগঠনের সঙ্গে কাজ করছেন।

তিনি বলেন, 'বড় প্ল্যান্টেশন কিংবা কারখানায় কাজ করছেন যেসব শ্রমিক তাদের বিশেষ কোন সমস্যা হচ্ছে না। বিপদে পড়েছেন ছোট ছোট কারখানার শ্রমিক। যারা লেবার কনট্রাকটরদের অধীনে কাজ করেন।

এই মানবাধিকার কর্মী বলেন, 'এ মাসের শুরুতে আমরা এসব শ্রমিকের ওপর একটি ডেটাবেজ তৈরি করেছি। সেই পরিসংখ্যান বলছে ৬০ হাজার শ্রমিক খাদ্য সাহায্য চেয়ে আমাদের কাছে আবেদন করেছেন।'

মালয়েশিয়ায় বৈধ-অবৈধ মিলিয়ে পাঁচ লাখের বেশি বাংলাদেশি শ্রমিক কাজ করছেন বলে ধারণা করা হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

২২ এপ্রিল, ২০২০

অনাহারে তিন কোটি মানুষ মারা যেতে পারে: বিশ্ব খাদ্য সংস্থা

অনলাইন ডেস্ক : **বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে ১৮৫টি দেশে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৮২টি দেশ পুরোপুরি বা আংশিকভাবে লকডাউন প্রয়োগ করেছে। কিন্তু এই লকডাউনে পুরো অর্থনীতি অচল হয়ে পড়ার কারণে বিশ্বের অনেক দেশ লকডাউন শিথিল করার কথা ভাবতে শুরু করেছে।**

বিশ্ব খাদ্য সংস্থা সতর্কবাণী দিয়েছে, অর্থনীতি এভাবে চলতে থাকলে বিশ্বের অন্তত তিন কোটি মানুষ অনাহারে মারা যেতে পারে।

আর আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল পূর্বাভাস দিয়েছে যে, করোনাভাইরাসের কারণে অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়ায় বিশ্বের প্রবৃদ্ধি তিন শতাংশ হারিয়ে যেতে পারে।

এদিকে বিশ্বব্যাপী এই ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ২৫ লাখ ৫৬ হাজার ৭৪৫ জনে দাঁড়িয়েছে। মারা গেছে ১ লাখ ৭৭ হাজার ৬১৯ জন।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীনের উহানে সর্বপ্রথম এই ভাইরাসের আবির্ভাব ঘটে। এর পর একে একে বিশ্বের ১৮০ টির বেশি দেশে ছড়িয়ে পড়ে এই ভাইরাস। বিবিসি।

কালের কণ্ঠ

২২ এপ্রিল, ২০২০

বিপাকে খুলনার পাটকল শ্রমিকরা

মজুরি নেই ১২ সপ্তাহ

কৌশিক দে, খুলনা : স্ত্রী-সন্তান নিয়ে চার সদস্যের পরিবার ইউনুস হোসেনের। প্লাটিনাম জুটমিলের শ্রমিক ইউনুস আলী থাকেন মিলের শ্রমিক কলোনিতে। করোনা সংক্রমণ ঝুঁকিতে থাকায় অনেক আগেই বন্ধ হয়েছে এ শ্রমিকের মিল। তাই অনেকটাই অলস সময় পার করছেন তিনি। ঘরে খাবার শেষ, মজুরি ভাতা না পাওয়ায় হাতেও টাকা নেই তাই বিপাকে পড়েছেন তিনি। ইউনুস আলী বলেন, 'ঘরে খাবার

বলতে তেমন কিছু নেই। আধা কেজি চাল ছিল তাও শেষ। কোথাও হাত পাততে পারি না। মজুরিও পাচ্ছি না। কী করব কিছুই বুঝতে পারছি না।'

শুধু রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল শ্রমিক ইউনুস আলীই নন, খুলনা-যশোর অঞ্চলের প্রায় ৩০ হাজার শ্রমিকের পরিবারে এখন দুর্দিন চলছে। মিল বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে ১২ সপ্তাহের বকেয়া বেতন মজুরি না পেয়ে কষ্টের জীবন পার করছে। সাধারণ শ্রমিক ও শ্রমিক নেতারা বলেছেন, 'আমরা কোনো ত্রাণ চাই না, নিজেদের বকেয়া পাওনা চাই। তাহলে আমরা বেঁচে থাকতে পারব।'

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, খুলনা-যশোর অঞ্চলের ৯টি রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল। এগুলোর মধ্যে খুলনায় প্লাটিনাম, ক্রিসেন্ট, স্টার, খালিশপুর, দৌলতপুর, ইস্টার্ন, আলিম ও যশোরের জেজেআই, কার্পেটিং জুটমিল। এসব মিলে বর্তমানে শ্রমিক সংখ্যা ৩০ হাজার। করোনা সংক্রমণ রোধে ইতিমধ্যে মিলগুলো বন্ধ ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি)।

সাধারণ শ্রমিক ও শ্রমিক নেতারা জানান, রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলোয় শ্রমিকদের গড়ে ১২ সপ্তাহের মজুরি, কর্মচারীদের তিন-চার মাসের বেতন বকেয়া পড়েছে। ফলে এসব পরিবারের সদস্যরা মানবেতর জীবন যাপন করছে।

প্লাটিনাম জুবিলী জুটমিলস শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি শাহানা শারমীন বলেন, 'মজুরি-বেতন না পেয়ে শ্রমিকরা মানবেতর জীবন যাপন করছে। অনেকের ঘরেই খাবার নেই। বিজেএমসির চেয়ারম্যান ও পাটসচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করেও বেতন প্রাপ্তির নিশ্চয়তা মেলেনি। সাধারণ শ্রমিকরা আবার মাঠে নামার হুমকি দিচ্ছে। আমরা ত্রাণ নয়, আমাদের মজুরি চাই।'

রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল সিবিএ-ননসিবিএ সংগ্রাম পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. খলিলুর রহমান বলেন, দেশে করোনা প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ার পর থেকে প্রায় এক মাস মিলগুলো বন্ধ। কিন্তু এখনো শ্রমিকদের পাওনা মজুরি পরিশোধ করেনি বিজেএমসি। এমনকি খাদ্য সহায়তা নিয়েও শ্রমিকদের পাশে নেই কেউ। ফলে শ্রমিকরা কষ্টের দিন পার করছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে ঝুঁকি নিয়ে শ্রমিকরা আবার রাস্তায় নামতে পারে।

বিজেএমসির আঞ্চলিক সমন্বয়কারী বণিজ উদ্দিন সাংবাদিকদের বলেন, খুলনা-যশোর অঞ্চলের শ্রমিক কর্মচারীদের পাওনা পরিশোধে এ মুহূর্তে প্রয়োজন ২০০ কোটি টাকা, যা আমাদের কাছে নেই। অন্যদিকে করোনার কারণে মিল বন্ধ থাকায় প্রতিদিন কোটি টাকার বেশি লোকসান হচ্ছে। বিষয়টি কেন্দ্রীয় দপ্তরকে জানানো হয়েছে।

কালের কণ্ঠ

২২ এপ্রিল, ২০২০

শ্রমিকদের বেতনে ২০০০ কোটি টাকা ছাড়

নিজস্ব প্রতিবেদক : রপ্তানিমুখী শিল্পের শ্রমিকদের বেতন-ভাতা দিতে দুই হাজার কোটি টাকা ছাড় করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত শ্রমিকদের বেতন-ভাতাসংক্রান্ত পাঁচ হাজার কোটি টাকার তহবিল থেকে এ অর্থ ছাড় করা হয়েছে। শর্ত পূরণ সাপেক্ষে বাকি অর্থও ছাড় করবে অর্থ মন্ত্রণালয়। তবে দুই হাজার কোটি টাকা ছাড় করার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের নাম-ঠিকানা ও মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট দেওয়ার শর্ত আপাতত শিথিল করা হয়েছে। তবে দ্বিতীয় কিস্তি ছাড় করার আগে অবশ্যই এসব শর্ত পূরণ করতে হবে। গত সোমবার অর্থ বিভাগ থেকে অর্থ ছাড়করণের ক্ষেত্রে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। অর্থ বিভাগের এক দায়িত্বশীল কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে কালের কণ্ঠকে বলেন, করোনা পরিস্থিতির পরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরা বেতনের দাবিতে রাস্তায় নামছে। এতে তাদের করোনা ঝুঁকি আরো বেড়ে যাচ্ছে। তাই শর্ত কিছুটা শিথিল করে অর্থ ছাড় করা হয়েছে।

সমকাল

২২ এপ্রিল ২০২০

করোনা মোকাবিলায় জনশক্তি খাতে করণীয়

ড. এ কে এম নজরুল ইসলাম

বাংলাদেশ সরকারের জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর হিসাবমতে, ১৯৭৬ থেকে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে মোট এক কোটি ৩০ লাখ ২৮ হাজার ৪১০ জন বাংলাদেশি কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিদেশে গমন করেছেন। এই বিশাল অভিবাসীদের ঠিক কত অংশ এই মুহূর্তে বিদেশের মাটিতে কর্মরত আছেন, তার কোনো সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া বেশ দুরূহ ব্যাপার। তাদের অনেকেই হয়তো স্বল্পমেয়াদি কর্মভিসা নিয়ে বিদেশ গমন করেছেন। তবে সেই সংখ্যা যাই হোক না কেন, এই জনশক্তি প্রেরিত অর্থ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি বিরাট ভূমিকা রেখে চলেছে। করোনাভাইরাস সংক্রমণ-পূর্ব বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতির সূচকে এই প্রেরিত অর্থ ছিল আমাদের অর্থনীতির একটি উলেল্লখযোগ্য একটি ইতিবাচক দিক। কভিড-১৯-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সেই বিশেষ খাতটির অবদান যে আগের মতো আর থাকবে না, সেটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

বাংলাদেশের মোট জনশক্তি রপ্তানির একটি বিশাল অংশই মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বেশ কিছু দেশে হয়ে থাকে। সারাবিশ্বের মতো এই দেশগুলোতেও অর্থনৈতিক মন্দাভাব এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। তাই করোনাভাইরাস-পরবর্তী অর্থনৈতিক মন্দার সময়ে বাংলাদেশি অভিবাসীরা এসব দেশে বেশ ঝুঁকির মধ্যে পড়তে যাচ্ছে, সেটা এখন অনেকটাই পরিস্কার। এই

ঝুঁকি শুধু আমাদের অর্থনীতিতে বৈদেশিক আয় কমিয়ে দেবে সেটাই নয়, বিদেশফেরত হাজারো শ্রমিক হঠাৎ করে দেশে এসে কর্মহীন হয়ে যেতে পারেন, সেই আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। করোনাভাইরাস পরিস্থিতি বিবেচনায় কয়েকটি দেশ থেকে যাচাই-বাছাইসাপেক্ষে বিপদগ্রস্ত বাংলাদেশিদের দেশে ফিরিয়ে আনার একটি বিশেষ উদ্যোগ সরকার হাতে নিয়েছে, যা মানবিক ও সময়োপযোগী। বিদেশে অবস্থানরত অনেক অভিবাসীই হয়তো অর্থনৈতিক মন্দাজনিত কারণে তাদের চাকরি হারাতে পারেন। এই পরিস্থিতিতে দেশকে একদিকে যেমন বর্তমানে বিদেশে কর্মরত অনেক অভিবাসীকে পুনঃগ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে, ঠিক তেমনি প্রতিবছর যে পরিমাণে বাংলাদেশি কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশ বিভুঁইয়ে পরিগমন করে থাকেন, সেই সংখ্যাতেও একটি বড় ধরনের নিম্নমুখী প্রবণতার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

এই পরিস্থিতিতে চাই একটি সময়োপযোগী ও সঠিক পরিকল্পনা। মনে রাখতে হবে, এই পরিস্থিতির শিকার শুধু বাংলাদেশ একা নয়, সারাবিশ্বের লাখ লাখ অদক্ষ এবং স্বল্প দক্ষ শ্রমিক থেকে শুরু করে উচ্চ পেশাগত যোগ্যতাসম্পন্ন অনেকেই শ্রমবাজারে নিজেদের উদ্‌বৃত্ত শ্রমিকের তালিকায় দেখতে পেতে পারেন।

সর্বপ্রথম বাংলাদেশ কূটনৈতিকভাবে যে যে দেশে বাংলাদেশি অভিবাসীরা সাময়িক কিংবা স্থায়ীভাবে অভিবাসন সুবিধা হারাতে পারেন, সেখানের সরকারের সঙ্গে দক্ষভাবে দেনদরবার করে আসন্ন এই বিপরীত গতিকে যতটুকু প্রশমন করার চেষ্টা করা। মনে রাখতে হবে, অভিবাসীদের পাঠানো আয় বাংলাদেশ অর্থনীতির একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র এবং আগামী দিনগুলোতেও এই আয়ের সহজ বিকল্প পাওয়া বেশ কঠিন হবে। তাই এই বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

বিদেশফেরত অভিবাসীদের একটি বিস্তারিত তথ্যপুঞ্জি তৈরি করা উচিত, যেখানে আগত ব্যক্তিরা কোন দেশ থেকে ফেরত আসছেন, কতদিন থেকে বিদেশে ছিলেন এবং কোথায় কোথায় কাজ করেছেন, সেখানে কী ধরনের কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাদের শিক্ষাগত ও দক্ষতার বিস্তারিত তথ্য, বর্তমানে বাংলাদেশে পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং ফেরত এসে কী ধরনের কাজের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে পারেন- তার একটি বিস্তারিত তথ্যপুঞ্জি তৈরি করা দরকার। এই তথ্যভাণ্ডার-পরবর্তীকালে বিদেশফেরত শ্রমিকদের পুনঃঅভিবাসনে সহায়তাকরণে কিংবা দেশে কোন ধরনের পুনর্বাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

বিদেশফেরত অভিবাসীদের পুনর্বাসনে সরকার দুই ধরনের উদ্যোগ হাতে নিতে পারে। প্রথমত, যেসব অভিবাসী স্বল্প সময়ের মধ্যে (এ ক্ষেত্রে সময়ের একটা মাপকাঠি নির্ধারণ করা যেতে পারে) বিদেশ থেকে ফেরত এসেছেন, তাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পুনঃঅভিবাসনের সুযোগ দেওয়া। সেসব ক্ষেত্রে পুনঃঅভিবাসন-প্রত্যাশীকে সুযোগমতো দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া। অন্যদিকে, যেসব বিদেশফেরত বাংলাদেশি অনেক বছর ধরে বিদেশে অবস্থান করেছেন এবং নতুন করে তাদের পুনঃঅভিবাসনের সুযোগ কম, তাদের দক্ষতা

ও অভিজ্ঞতার বিচারে বিশেষ ঋণ সুবিধা দিয়ে উদ্যোক্তা বানাতে সরকারের বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া উচিত। সেই বিষয়টি বিবেচনায় রেখে আগামী ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে সরকারকে বিদেশফেরত অভিবাসীদের পুনর্বাসনে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া দরকার।

বাংলাদেশি দক্ষ জনশক্তির জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টিকল্পে সরকারের একটি বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া উচিত। যেমন- প্রতি বছর হাজার হাজার শিক্ষক, ডাক্তার, নার্স, প্রকৌশলী, প্রযুক্তিবিদ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভারতীয় উন্নত বিশ্বের পাশাপাশি উন্নয়নশীল, এমনকি স্বল্পোন্নত দেশে চাকরির জন্য যাচ্ছেন। আফ্রিকা মহাদেশের ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়া, কেনিয়া, মিসর, মরক্কো, ঘানা, গেবনসহ নানা দেশে প্রতিবছর হাজারো ভারতীয় চাকরি নিয়ে যান। উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের পাশাপাশি বাংলাদেশ এই দেশসহ অন্যান্য দেশে অনেক সহজেই দক্ষ শ্রমিকদের জন্য একটি বাজার তৈরি করতে পারেন। ঠিক একইভাবে উন্নত দেশের শ্রমবাজারের চাহিদা মেটাতে দেশের অভ্যন্তরে সঠিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। সহযোগী অধ্যাপক এবং সমন্বয়ক, পরিবেশ অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা স্কুল অব ইকোনমিকস

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

২২ এপ্রিল, ২০২০

ধেয়ে আসছে গভীর সংকট

নিজস্ব প্রতিবেদক : দীর্ঘ লকডাউনে দেশের সব কর্মকান্ড স্থবির হয়ে যাওয়ায় ধেয়ে আসছে গভীর সংকট। সংকটে বিপর্যস্ত হতে পারে সামাজিক জীবনও। অবনতি ঘটতে পারে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির। সর্বগ্রাসী এই ভবিষ্যৎ সংকট থেকে মুক্তি পেতে নতুন করে ভাবছে সরকার। পরিকল্পনা করা হচ্ছে স্বাস্থ্য উপযোগী পরিবেশ বজায় রেখে আগামী মাস থেকে শিল্পকারখানা সীমিত আকারে চালুর। ব্যাংকিং খাতে স্বাভাবিক গতি রাখা নিয়েও চিন্তা করা হচ্ছে। খেটে খাওয়া মানুষের কথা মাথায় রেখে আর্থিক কর্মকান্ড চালু করতেই সরকারের এ উদ্যোগ। ফলে আগামী মাস থেকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে লকডাউন শিথিল করা হতে পারে।

জানা গেছে, গত কিছু দিন থেকে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ত্রাণবাহী গাড়ি লুটের ঘটনা ঘটেছে। খাদ্যের দাবিতে বিক্ষোভ করেছে সাধারণ মানুষ। বেতন-ভাতার দাবিতে গার্মেন্ট শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন। একই সঙ্গে কৃষিপণ্য সরবরাহে মারাত্মক সমস্যা দেখা দিয়েছে। কৃষিপণ্য পরিবহন করা যাচ্ছে না। ফলে কৃষক বঞ্চিত হচ্ছে ন্যায্যমূল্য থেকে। সিরাজগঞ্জ, পাবনাসহ বিভিন্ন এলাকায় দুগ্ধ খামারিরা দুধ বিক্রি করতে পারছে না। বিপাকে পড়েছেন পোলট্রি খামারিরা। উৎপাদিত মুরগি, ডিম বিক্রি করা যাচ্ছে না, পরিবহন সংকটে কোথাও যানবাহন পাওয়া যায় না। এসব ঘটনা চিন্তায় ফেলেছে সাধারণ মানুষকে। সরকার এসব পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে করোনা মোকাবিলায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নিয়ম মেনে শিল্পকারখানা সীমিত আকারে চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছু বন্ধ থাকায় শ্রমজীবী মানুষ চরম সংকটে পড়েছে। ব্যাংকিং-ব্যবস্থা পুরোপুরি চালু করতে না পারলে চরম বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। তাই সরকার অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নতুন এ চিন্তাভাবনা করছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, স্বাস্থ্য নীতিমালার সঙ্গে সংগতি রেখে আর্থিক খাত নিয়ে ভাবতে হবে। সীমিত হলেও আর্থিক খাত চলমান রাখতে সবকিছু চালু করা উচিত; যা সার্বিকভাবে ইতিবাচক হবে বলে অনেকে মনে করছেন। এভাবে সবকিছু বন্ধ থাকলে আইনশৃঙ্খলার অবনতি হতে পারে। চুরি, ডাকাতি বাড়তে পারে। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ বেশি সংকটে আছে। বিশৃঙ্খলা বেশি হলে তা আরও সংকট তৈরি করবে। আর্থিক খাত বিশেষ করে রপ্তানি শিল্প, নিত্যপ্রয়োজনীয় উৎপাদিত শিল্পকারখানা, কৃষিপণ্য উৎপাদন, পরিবহন খাত চালু করা উচিত। তবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বিশ্বের অন্যান্য দেশের কর্মকান্ড বিবেচনায় রেখে চালু করা উচিত। জানতে চাইলে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. জামালউদ্দিন আহমেদ বলেন, লকডাউনের কারণে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সবকিছু বন্ধ। এটা চলমান থাকলে আমাদের বিপদ হবে। ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশগুলো তাদের লকডাউন কিছু প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেখানকার অর্থনীতি বা তাদের সক্ষমতা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। তাই বাংলাদেশে যদি লকডাউন দীর্ঘমেয়াদি হয় তা বড় ধরনের বিপদ ডেকে আনবে। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ না খেয়ে থাকার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এটা পুরো রাষ্ট্রের ওপর যে প্রভাব ফেলতে তা আমরা সামাল দিতে পারব না। দেশের অর্থনীতি হচ্ছে রক্ত সঞ্চালক। তা বন্ধ থাকলে বাঁচা যাবে না। লকডাউনের কারণে শিল্পকারখানা শুধু নয়, বন্দর, পরিবহন, কৃষি, রাজস্ব আদায়

সবকিছু বন্ধ থাকলে মানুষ কয়েকদিন পর কী খাবে? দুনিয়ার সব স্টক মার্কেট খোলা। পরিস্থিতি বিবেচনায় সরকারের উচিত ধীরে ধীরে এটা শিথিল করা। সামাজিক দূরত্ব মেনে, স্বাস্থ্যবিধি মেনে সবকিছু খুলে দিতে হবে। একজনের আয় আরেকজনের ব্যয়। যে ব্যক্তি চাকরি করে তার বেতন দিয়ে পরিবার চলে। সে দোকান থেকে পণ্য কেনে। দোকান মালিকের আয় হয়। এখন যদি চাকরিজীবী বেতন না পায় এর মানে ক্ষতিগ্রস্ত বা সংকটে সে একা থাকবে না। পুরো পদ্ধতিই আটকে যাবে। প্রয়োজনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সেনাবাহিনী আরও বৃদ্ধি করে লকডাউন শিথিল করতে হবে। তিনি বলেন, বসুন্ধরা গ্রুপ যেমন হাসপাতাল করছে, মানুষকে সহায়তা করছে এভাবে বিত্তশালীদের এগিয়ে আসতে হবে। তারা কেন আসছে না। তাদের বাধ্য করতে হবে। তারা এই দেশ থেকেই আয় করেছে, এই দেশে এখন ব্যয় করতে হবে। জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ বলেন, সরকার ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য প্রচার করেছে। আমরা আগেই বলেছি, এ প্রবৃদ্ধি সঠিক চিত্র নয় বাংলাদেশের। এখন সেটা বোঝা যাচ্ছে। প্রবৃদ্ধির সুবিধাপ্রাপ্ত লোকের সংখ্যা একেবারে সীমিত। দেশের অধিকাংশ লোক দরিদ্র। দারিদ্র্যসীমার নিচের সংখ্যা অনেক বেশি। এখন এভাবে লকডাউন করে রাখায় পরিস্থিতি খুবই মারাত্মক হয়েছে। যারা নির্বাচিত হয়ে আসছেন এমপি, জনপ্রতিনিধিদের খুঁজে পাওয়া যায় না। সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে এখন? আয় বৈষম্যের এ চিত্র বঙ্গবন্ধুর অর্থনীতির বিপরীত। সরকার ঘোষণা দিয়েছে ৫ কোটি মানুষকে খাদ্যসহায়তা দেবে। এর অর্থ সংকটে রয়েছে আরও বেশি মানুষ। করোনা পরিস্থিতিতে আমাদের যে সংকট প্রকাশ পেয়েছে তা খুবই মারাত্মক আকার নেবে এ লকডাউনের কারণে। এখন করোনাভাইরাসের পরিস্থিতি কী তা সংশ্লিষ্ট গবেষক-চিকিৎসকরা ভালো বলতে পারবেন। আমার মনে হয়, তাদের সঙ্গে কথা বলে লকডাউনের বিষয়ে ভিন্ন চিন্তা করা যেতে পারে। আগামী মাস থেকে শিথিল করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সচল না রাখতে পারলে কোনো কিছুই ঠিক থাকবে না।

যুগান্তর

২২ এপ্রিল ২০২০

[করোনার ছোবল]

চট্টগ্রামে লে-অফ ৪৬ পোশাক কারখানা

চট্টগ্রাম ব্যুরো : করোনাভাইরাসের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে বড় ক্ষতির মুখে পড়েছে চট্টগ্রামের পোশাক খাত।

শিপমেন্ট না হওয়া, কার্যাদেশের অভাবসহ নানা কারণে চট্টগ্রামের দু'টি ইপিজেডের (এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন) ৪৬টি পোশাক কারখানা লে-অফ ঘোষণা করেছে।

ইতোমধ্যে লে-অফের আবেদন মঞ্জুর করেছে বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন কর্তৃপক্ষ (বেপজা)। আরও কিছু কারখানা লে-অফে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। বেপজাসহ সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এদিকে সিইপিজেডের কর্মকর্তারা জানান, যেসব পোশাক কারখানা লে-অফে যাবে তারা সরকারের ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের বাইরে থাকবে। অর্থাৎ তারা প্রণোদনা পাবে না।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, করোনাভাইরাসের কারণে কারখানায় কাঁচামালের স্বল্পতা, তৈরি মালামাল জমে যাওয়া, শিপমেন্ট ও ক্রয়াদেশ বাতিল হওয়া, যন্ত্রপাতি নষ্ট হওয়া, শ্রমিক কাজ দিতে না পারার অক্ষমতাসহ নানা কারণ দেখিয়ে সিইপিজেডের বেশ কিছু কারখানা কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন মেয়াদে (১৫, ২০, ৩০, ৪৫ দিন) কারখানা লে-অফ ঘোষণার আবেদন জানিয়েছে। একেকটি কারখানা একেক ধরনের সমস্যার কথা তাদের আবেদনে উল্লেখ করেছে।

চট্টগ্রাম ও কর্ণফুলী ইপিজেডে দেশি-বিদেশি মিলিয়ে দুই শতাধিক কারখানা আছে। এর মধ্যে কর্ণফুলী ইপিজেডে কারখানা আছে ৪১টি। এসব কারখানায় শ্রমিক কাজ করে ৭৬ হাজারের মতো। চট্টগ্রাম ইপিজেডে কারখানার সংখ্যা ১৫৮টি এবং শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় দুই লাখ। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ইপিজেডগুলোতে তৈরি পোশাক খাত, তাঁবু, জুতা ও ইলেকট্রনিক্স কারখানা মিলিয়ে মোট ৪৬টি কারখানা কর্তৃপক্ষ লে-অফের জন্য তাদের কাছে অনুমোদন চেয়েছে। কাজ না থাকা, বিদেশি ক্রেতাদের শিপমেন্ট বাতিল করা, কাজের আদেশের অনিশ্চয়তা সব মিলিয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষ লে-অফের আবেদন করছে।

আইনানুযায়ীই তারা আবেদন করেছে। সূত্র জানায়, শ্রম আইন অনুযায়ী, লে-অফ চলাকালে প্রথম ৪৫ দিনের ক্ষেত্রে পূর্ণকালীন শ্রমিকের মোট মূল মজুরি, মহার্ঘ্য ভাতার অর্ধেক দিতে হয় মালিককে। পরের ১৫ দিনের জন্য শ্রমিক পাবে ২৫ শতাংশ মূল বেতন এবং বাড়ি ভাড়া।

কারখানা লে-অফের বিষয়ে ট্রেড ইউনিয়ন চট্টগ্রামের সাংগঠনিক সম্পাদক রাহাত উল্লাহ জাহিদ যুগান্তরকে বলেন, এ করুণ অবস্থায় লে-অফ ঘোষণা কাম্য নয়। সরকার সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে লে-অফ শ্রমিকদের আরও বেশি ঝুঁকিতে ফেলে দেবে।'

সিইপিজেডের ব্যবস্থাপক আশিক মোহাম্মদ শাহাদত বলেন, 'করোনাভাইরাসের কারণে বেশ কিছু পোশাক কারখানা লে-অফের ঘোষণা দিয়ে আমাদের কাছে আবেদন করেছিল। সব আবেদন আমরা ঢাকার প্রধান কার্যালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। ইতোমধ্যে ৪৬টি পোশাক কারখানার লে-অফ আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে। আরও কিছু পাইপ লাইনে আছে।

অনেক কারখানার কর্তৃপক্ষ আমাদের টেলিফোনে বা প্রতিনিধি পাঠিয়ে বিষয়টি জানিয়েছে। তাদের আবেদন পেলে প্রধান কার্যালয়ে পাঠিয়ে দেব। আবার কয়েকটি পোশাক কারখানা লে-অফের আবেদন করেও আবার লে-অফে না যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। ওইসব প্রতিষ্ঠান বলছে, তারা নতুন করে কার্যাদেশ পেয়েছে।

বেপজার মহাব্যবস্থাপক খুরশিদ আলম বলেন, 'সিইপিজেড ও কর্ণফুলী ইপিজেডের বেশ কিছু কারাখানা লে-অফের জন্য আবেদন করেছিল। আমরা তা ঢাকায় পাঠিয়ে দিয়েছি। কিছু কিছু

আবেদন ইতোমধ্যে মঞ্জুরও হয়েছে। তিনি আরও বলেন, 'কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান যদি লে-অফ ঘোষণা করে তাহলে ওইসব প্রতিষ্ঠান সরকারি প্রণোদনা প্যাকেজের তহবিল থেকে ঋণ পাবে না।'

২২ এপ্রিল ২০২০,

করোনা সংকটেও থেমে নেই প্রবাসী আয়

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা: প্রতীকী ছবিবিশ্বজুড়ে করোনাভাইরাসের প্রকোপের মধ্যেও দেশের বাইরে থাকা বাংলাদেশিরা আয় (রেমিট্যান্স) পাঠানো অব্যাহত রেখেছে। সারা দেশের ব্যাংক শাখা, এজেন্ট ব্যাংকিং,মোবাইলে আর্থিক সেবা (এমএফএস) ও এনজিওদের মাধ্যমে তা পৌঁছে যাচ্ছে সুবিধাভোগীদের কাছে। চলতি মাসের প্রথম ১৬ দিনে প্রবাসীরা ৪৪ কোটি ২০ লাখ ডলার আয় পাঠিয়েছেন। বাংলাদেশি টাকায় যার পরিমাণ ৩ হাজার ৭৫৭ কোটি টাকা। আর গত মার্চের পুরো সময়ে এসেছিল এসেছিল ১২৮ কোটি ৬৮ লাখ ডলার।

ব্যাংক কর্মকর্তারা বলছেন, বাংলাদেশি শ্রমিকেরা আছেন, এমন অনেক দেশ এখনো লকডাউন হয় নি। আবার লকডাউন হলেও পরিবার চালাতে ঋণ করে হলেও অনেকে টাকা পাঠাচ্ছেন। করোনার কারণে উন্নত দেশ থেকেও আয় আসা বেড়েছে। তবে এভাবে কতদিন আসবে তা অনিশ্চিত। এখনই প্রবাসীদের সহায়তায় সরকারের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

জানা গেছে, বাংলাদেশের অর্থনীতির সবচেয়ে ভালো সূচক ছিল প্রবাসী আয়। করোনার কারণে কমে গেছে প্রবাসী আয়। প্রবাসী–অধ্যুষিত দেশগুলো ভাইরাসে নাস্তানাবুদ, দীর্ঘদিন ধরে চলছে লকডাউন। সবচেয়ে বেশি আয় আসে ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে।

ব্যাংকটির উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবু রেজা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া প্রথম আলোকে বলেন,'মধ্যপ্রাচ্যে থাকা লোকজন পরিবার চালাতে এখনো আয় পাঠাচ্ছে। তবে এভাবে কতদিন পাঠাবে, এটা অনিশ্চিত। আমরা শাখা ও এজেন্টদের মাধ্যমে রেমিট্যান্স বিতরণ অব্যাহত রেখেছি।'

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত মার্চ আয় এসেছিল ১২৮ কোটি ৬৮ লাখ ডলার। গত বছরের মার্চ মাসে এসেছিল ১৪৫ কোটি ৮৬ লাখ ডলার। ফলে গত মার্চেই আয় কমেছে প্রায় ১২ শতাংশ। গত ফেব্রুয়ারিতে এসেছিল ১৪৫ কোটি ডলারের আয় এসেছিল। আর দেশে গত ডিসেম্বরে প্রবাসী আয় এসেছিল ১৬৯ কোটি ডলার, যা জানুয়ারিতে ৫ কোটি ডলার কমে নেমে যায় ১৬৪ কোটি ডলারে।

জানা গেছে, যেসব দেশ থেকে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় আসে, সেসব দেশে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে রেমিট্যান্স হাউস ও ব্যাংকগুলো বন্ধ রাখা হয়েছে। বাংলাদেশি শ্রমিকেরাও পড়েছেন বিপদের মুখে। দেশের প্রবাসী আয় আহরণের শীর্ষ ১৫টি উৎস

দেশ হলো সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই), যুক্তরাষ্ট্র, কুয়েত, যুক্তরাজ্য, মালয়েশিয়া, ওমান, কাতার, ইতালি, বাহরাইন, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ আফ্রিকা, ফ্রান্স, দক্ষিণ কোরিয়া ও জর্ডান।

বৈধ পথে প্রবাসী আয় বাড়াতে চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে ২ শতাংশ হারে প্রণোদনা ঘোষণা করে সরকার। সেই অনুযায়ী, ১ জুলাই থেকে প্রবাসীরা প্রতি ১০০ টাকার বিপরীতে ২ টাকা প্রণোদনা পাচ্ছেন। বাজেটে এ জন্য ৩ হাজার ৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। এর ফলে প্রবাসী আয় আসা বেড়ে গিয়েছিল। এখন তাতে বড় আঘাত হানল করোনাভাইরাস।

এদিকে বিকাশ জানিয়েছে, গত জানুয়ারি থেকে ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত কেবল বিকাশের মাধ্যমে ১৩৮ কোটি টাকা আয় এসেছে। সবচেয়ে বেশি আয় এসেছে মালয়শিয়া,সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ ও যুক্তরাজ্য থেকে। এছাড়াও, যেসব প্রবাসী বিকাশের মাধ্যমে রেমিটেন্স পাঠাচ্ছেন- তাদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবার উদ্যোগ নিয়েছে বিকাশ ও ডিজিটাল হেলথকেয়ার। এই কার্যক্রমের আওতায় প্রবাসীর পরিবারের সদস্যরা ঘরে থেকেই জরুরী প্রয়োজনে তিন মাসে ৯০ মিনিট পর্যন্ত ফোনে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সেবা নিতে পারবেন। এছাড়া যাদের হাসপাতালে ভর্তি হবে,তারা হাসপাতাল থেকে ৮ হাজার টাকা পর্যন্ত নগদ সহায়তা পাবেন।

কালের কণ্ঠ

২৩ এপ্রিল, ২০২০

সহস্রাধিক ফুলচাষি দেউলিয়া হবার পথে

নয়ন খন্দকার, কালীগঞ্জ (ঝিনাইদহ) : দক্ষিণাঞ্চলে ফুলের রাজধানী নামে খ্যাত যশোরের গদখালী। আর দ্বিতীয় রাজধানী নামে খ্যাতি পেয়েছে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ। অথচ এ উপজেলার সহস্রাধিক ফুলচাষি দেউলিয়া হবার পথে। উপজেলার প্রায় ১৩০ হেক্টর জমির ফুল নষ্ট হচ্ছে। চাষিরা প্রতিদিন ক্ষেত থেকে ফুল তুলে তা বাইরে ফেলে দিচ্ছে। অনেকে গরুকে দিয়ে ফুল খাওয়াচ্ছেন। চরম আর্থিক ক্ষতির মুখে এ উপজেলার ফুলচাষিরা। গত প্রায় দেড় মাসে সহস্রাধিক ফুলচাষির প্রায় ৯ থেকে ১০ কোটি টাকার ফুল নষ্ট হয়েছে বলে জানিয়েছেন একাধিক চাষি।

কালীগঞ্জ উপজেলার বড় ফুলচাষি এস এম টিপু সুলতান জানান, গত দেড় মাস যাবৎ ফুল বিক্রি বন্ধ রয়েছে। ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী, ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস ও পহেলা বৈশাখে তারা ফুলের বাজার ধরতে পারেননি। এসব দিবসে ফুল বিক্রি বেশি হয়ে থাকে। কিন্তু করোনার কারণে ফুল বিক্রি হয়নি। তার মতো উপজেলার

সহস্রাধিক ফুলচাষি ফুল বিক্রি করতে পারেনি। যার কারণে তারা আর্থিকভাবে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

তিনি আরো জানান, তার আড়াই বিঘা জমিতে গোলাপ, সাড়ে ৬ বিঘা জমিতে জারবেরা, আড়াই বিঘা জমিতে ভুট্টা ফুল, ২ বিঘা জমিতে গ্লাডিওলাস, ২ বিঘা জমিতে চন্দ্রমল্লিকাসহ প্রায় ১৬ বিঘা জমিতে ফুলের আবাদ রয়েছে। প্রতিমাসে তিনি ৫ থেকে ৬ লাখ টাকার ফুল, ঢাকা, সিলেট, চট্রাগ্রাম, বরিশাল, ফরিদপুরসহ বিভিন্ন জেলায় পাঠাতেন। কিন্তু করোনার কারনে গত দেড় মাসে ফুল বিক্রি করতে পারেননি। দেড় মাসে তার ৫ থেকে ৬ লাখ টাকার ফুল নষ্ট হয়েছে। আর্থিকভাবে তিনি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এখন ফুল বিক্রি বন্ধ থাকায় বাধ্য হয়ে বাগান থেকে ফুল তুলে বাইরে ফেলে দিচ্ছেন। প্রতিদিন তিনি নিজেই ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকার ফুল ফেলে দিচ্ছেন। এর মধ্যে তিনি গ্লাডিওলাস, গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা ফুলের গাছ কেটে দিয়েছেন। শুধুমাত্র লিলিয়াম ফুল ও কিছু গোলাপ ফুল গাছ এখনো ক্ষেতে রয়েছে। গোলাপফুল গাছেই শুকিয়ে যাচ্ছে। লিলিয়াম ফুল তুলে ফেলে দিচ্ছেন। এভাবে চলতে থাকলে তাকে পথে বসতে হবে।

এ ফুলচাষি আরো জানান, শুধু ফুল নষ্ট নয়। ফুলের ক্ষেত ঠিক রাখতে প্রতিমাসে তার দেড় লাখ টাকা ব্যয় হচ্ছে। ফুলের ক্ষেত ঠিক রাখতে তার পাঁচজন স্থায়ী শ্রমিক ও পাঁচজন দিনমজুর প্রতিদিন ক্ষেতে কাজ করছেন। স্থায়ী শ্রমিকদের মাসে ৬০ হাজার টাকা ও পাঁচজন দিনমজুর (যারা একবেলা কাজ করে) কে মাসে ৩৭ হাজার ৫ শ টাকা দিতে হচ্ছে। অর্থাৎ বাগান পরিচর্যা বাবদ তার মাসে প্রায় ১ লাখ টাকা খরচ হচ্ছে। এ ছাড়া সার, কিটনাশক, সেচ বাবদ আরো ৫০ হাজার টাকা খরচ হচ্ছে। সব মিলিয়ে তার মাসে দেড় লাখ টাকা খরচ হচ্ছে। অথচ এক টাকারও ফুল তিনি বিক্রি করতে পারছেন না।

বর্তমানে কালীগঞ্জ উপজেলার সহস্রাধিক ফুলচাষি পথে বসার উপক্রম হয়েছে। করোনার এ ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে তারা সবাই দেউলিয়া হয়ে পথে বসবেন বলে জানান। কালীগঞ্জের ত্রিলোচনপুর, বালিয়াডাঙ্গা, তিল্লা, সিমলা, রোকনপুর, গোবরডাঙ্গা, পাতবিলা, পাইকপাড়া, তেলকূপ, গুটিয়ানী, কামালহাট, বিনোদপুর, দৌলতপুর, রাড়িপাড়া, মঙ্গলপৈতা, মনোহরপুর, ষাটবাড়িয়া, বেথুলী, রাখালগাছি, ডুমুরতলা, রঘুনাথপুরসহ বিভিন্ন গ্রামে মাঠে ফুল চাষ বেশি হয়ে থাকে।

এসব এলাকার ফুলচাষি ও ফুল ব্যবসার সাথে জড়িত মিজানুর রহমান, শুকুর আলী, ইউসুফ আলী, প্রদীপ বাবু, শামীম, ফজলুর রহমান সহস্রাধিক ব্যক্তি ফুল বিক্রি করতে না পেরে এখন দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। অনেক চাষি গাঁদা ফুল ক্ষেত থেকে তুলে গরুকে খাওয়াচ্ছে।

কালীগঞ্জ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ জাহিদুল করিম ফুলচাষিরা ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার কথা স্বীকার করে বলেন, করোনার কারণে উপজেলার ১৩০ হেক্টর জমির ফুল নষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এতে কারো কোনো হাত নেই। তবে তাদের ক্ষতি পুষিয়ে উঠতে সরকার যে প্রণোদনা কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন সেখান থেকে তাদের প্রণোদনা দেওয়ার চেষ্টা করব।

কালের কণ্ঠ

২৩ এপ্রিল, ২০২০

হাজারে ৪ টাকা দিয়েই মোবাইলে বেতন তুলতে পারবেন শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদক: প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ক্যাশ আউটের ক্ষেত্রে হাজারে সর্বোচ্চ আট টাকা চার্জ আদায়ের নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এর মধ্যে শ্রমিকদের থেকে কাটা যাবে চার টাকা।

প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী এক হাজারে ১৮ থেকে ২০ টাকা ফি কেটে নেয় মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) প্রতিষ্ঠান। আজ বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেম ডিপার্টমেন্ট থেকে এ সংক্রান্ত সার্কুলার জারি করা হয়েছে।

সার্কুলারে বলা হয়, গত ২ এপ্রিল রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধের জন্য সবাইকে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) একাউন্ট খোলার নির্দেশনা দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। এই স্কিমের আওতায় পরিশোধিত বেতন ভাতা ক্যাশ আউটের ক্ষেত্রে শ্রমিক-কর্মচারীদের স্বার্থ বিবেচনায় ফি আদায়ে শুধুমাত্র কষ্ট লাঘব বা কোনো ক্ষেত্রে সাবসিডিটি প্রদানের জন্য অপারেটরদেরকে (নগদসহ) অনুরোধ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে শূন্য দশমিক আট শতাংশ বা হাজারে আট টাকার বেশি চার্জ আদায় করা যাবে না। এর মধ্যেও এমএফএস অপারেটরদের নিজেদের কমিশন থেকে চার টাকা প্রদান করবে ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক। বাকি চার টাকা পরিশোধ করবে গ্রাহক বা প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক।

গত ২ এপ্রিল রপ্তানিমুখী শিল্প খাতের শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধের জন্য পাঁচ হাজার কোটি টাকার তহবিল গঠন কররে সার্কুলার জারি করে বাংলাদেশ ব্যাংক। এই তহবিল থেকে কেবল সচল রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকরা ঋণ নিতে পারবেন।

বণিক বার্তা

সমৃদ্ধির সহযাত্রী

এপ্রিল ২১, ২০২০

প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিসিএসএমের খোলা চিঠি
অভিবাসী ও তাদের পরিবারের জন্য তহবিল গঠনের অনুরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক

কৃষি, চিকিৎসা ও রফতানিমুখী শিল্পের মতো অভিবাসীদের জন্যও সরকারি প্রণোদনা তহবিল চে য়েছে অভিবাসন খাতে কর্মরত ১৬টি সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশ সিভিল সোসাইটি ফর মাইগ্রেশন (বিসিএসএম)। তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে এক খোলা চিঠির মাধ্যমে বিশ্বের সব দেশে থাকা বিপন্ন অভিবাসী ও তাদের পরিবারের জন্য একটি তহবিল গঠন করার অনুরোধ জানিয়েছে। গতকাল বিসিএসএম সেক্রেটারিয়েটের পক্ষ থেকে রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভ মেন্ট রিসার্চ ইউনিটের (রামরু) প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার ড. তাসনিম সিদ্দিকী স্বাক্ষরিত খোলা চিঠিতে এ অনুরোধ জানানো হয়।

বিসিএসএমের সদস্য ১৬টি সংগঠনের মধ্যে রয়েছে রামরু ওয়ারবে ডিএফ, বমসা, ইমা রিসার্চ ফাউন্ডেশন, এমজেএফ, আসক, বাসুগ, ইনাফি, বিসিডব্লিউডব্লিউএফ, ইপসা, বোয়াফ, বাস্তব, রাইটস যশোর, ডেভ কম, ফিল্ম ফর পিস ফাউন্ডেশন ও চেঞ্জ মেকারস।

প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে খোলা চিঠিতে বলা হয়েছে, কভিড-১৯-
এর কারণে সৃষ্ট ক্রান্তিলগ্নে দেশের রফতানিমুখী শিল্প বাঁচাতে ও শ্রমিকদের বেতন নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রী এরই মধ্যে ৭২ হাজার কোটি টাকার তহবিল তৈরি করেছেন। এছাড়া কৃষি খাতের বিপ র্যয় রোধে পাঁচ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা ঘোষণা করেছেন। চিকিৎসাকর্মীদের জন্য ঘোষণা করেছেন ১০০ কোটি টাকার জীবন বিমা প্রকল্প।

মধ্যপ্রাচ্যে ফ্রি ভিসায় কর্মরত অভিবাসী, অনিয়মিত অভিবাসী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, সেবা খাতে নিয়ো জিত কর্মী এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত অভিবাসীরা এখন কর্ম ও বেতনহীন। অন্য সময়ের তুলনায় গৃহকর্মীরা এখন একটু ভালো আছেন। কভিড-
১৯ সংক্রামক ব্যাধি হওয়ায় কর্মীদের নিরাপদ রাখতে নিয়োগদাতা পরিবারগুলো তত্পর। কিন্তু পুরুষ কর্মীদের পরিবারের মতো নারী কর্মীদের দেশে ফেলে যাওয়া সন্তানরা আজ রেমিট্যান্সের অভাবে খাদ্যনিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। এ কারণে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন, বিপদগ্রস্ত অভিবা সী ও তাদের পরিবারগুলোকে সংকটের সময়ে সহায়তা হিসেবে বিশেষ তহবিল গঠন করুন।

খোলা চিঠিতে আরো উল্লেখ করা হয়, এরই মধ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল য় এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল মধ্যপ্রাচ্যসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অভিবাসীদের সেবা দেয়ার জন্য অর্থ সরবরাহ করেছে। আরো ২০০ কোটি টাকার তহবিল গঠনের ঘোষণা দিয়েছে। এ উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু এক কোটি অভিবাসীর বিপদে পড়া অংশ ও তাদের পরিবা রের জন্য আরো অনেক বড় তহবিল গঠন প্রয়োজন। অভিবাসীদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরা

প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি, শুধু অভিবাসীদের নিজস্ব টাকায় গঠিত ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ ত হবিল থেকে নয়, সরকারের কোষাগার থেকে তাদের জন্য তহবিল নিশ্চিত করুন। বেশকিছু শ্রম গ্রহণকারী রাষ্ট্র অনিয়মিত অভিবাসীদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠিয়ে দিতে চাচ্ছে। বিসিএসএমের পক্ষ থেকে আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই।

চিঠিতে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে কয়েকটি অনুরোধ তুলে ধরে বলা হয়, বিশ্বের সব দেশে থাকা বিপন্ন অভিবাসী ও তাদের পরিবারের জন্য একটি তহবিল গঠন, রেমিট্যান্সের নিম্নগতি রোধে উদ্দীপক বাড়ানো, করোনা-উত্তর ট্রাফিকিংয়ের আশঙ্কা কমাতে প্রশাসনকে দায়বদ্ধ করা, করোনা-পরবর্তী শ্রমবাজার ধরার লক্ষ্যে শিক্ষানীতিতে পরিবর্তন আনা, বলিষ্ঠ কণ্ঠে সংকটের মুহূর্তে নিয় মিত-
অনিয়মিত সব অভিবাসীর প্রতি শ্রম গ্রহণকারী দেশগুলোর দায়িত্ব বহুপক্ষীয় ফোরামে তুলে ধরা এবং অভিবাসীদের সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি ও তাদের প্রতি মর্যাদার সঙ্গে আচরণকে উৎসাহিত করতে হবে।

বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

এপ্রিল ২১, ২০২০

তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের চাকরি দিল ‘স্বপ্ন’

সমাজের অবহেলিত ট্রান্সজেন্ডার বা তৃতীয় লিঙ্গের নয়জন মানুষকে কাজের সুযোগ করে দিয়েছে দেশের অন্যতম জনপ্রিয় বৃহত্তম সুপারশপ ‘স্বপ্ন’। গতকাল বিকালে প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন বিভাগ থেকে তাদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেয়া হয়। এ সময় স্বপ্নের নির্বাহী পরিচালক সাব্বির হাসান নাসির, ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টারের প্রধান মহিবুর রহমান, মানবসম্পদ বিভাগের প্রধান শাহ মো. রিজভী রনী, বন্ধু সংগঠনের মিডিয়া ফেলো শরিফুল ইসলাম পলাশ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

নিয়োগপ্রাপ্তরা হলেন আব্দুল রহিম মুন, নিশি, আকাশ আহমেদ, লিটন, নীলা, তমা, সানি, তানিম মিয়া ও বিল্লাল। তারা এখন থেকে স্বপ্নের ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার ও আউটলেটে বিভিন্ন পদে কাজ করবেন।

স্বপ্নের নির্বাহী পরিচালক সাব্বির হাসান নাসির এ প্রসঙ্গে বলেন, তৃতীয় লিঙ্গ হলেও তারা আমাদের এ সমাজেরই মানুষ। শিক্ষিত হয়ে একজন স্বাবলম্বী মানুষ হিসেবে বেড়ে ওঠার পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করার অধিকার আছে তাদের। তবে বর্তমানে তাদের মধ্যে অনেকে কাজের সুযোগ পাচ্ছেন না। এবার স্বপ্ন তাদের পাশে দাঁড়াল। স্বপ্নই দেশের প্রথম রিটেইল চেইন, যারা প্রতিবন্ধী মানুষদের নিয়োগ দিয়েছে এবং এ প্রতিষ্ঠানে তাদের চাকরির ১০ শতাংশ কোটা রয়েছে। তাদের সবার পথচলা সুন্দর ও সহজ হোক।

বণিকবার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

এপ্রিল ২১, ২০২০

গৃহবন্দি না অর্থনীতি কোনটি চাই?

করোনায় অর্থনীতি বিকল। সরকার এরই মধ্যে প্রণোদনার নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। গত লেখায়ও লিখেছি, এ বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করে এগোনো উচিত। সিদ্ধান্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে গ্রহণ না করলে ফল ভালো না হয়ে খারাপ হবে। গত সংখ্যায় মনে করিয়ে দিয়েছিলাম ১৯৭৪ সালের কথা, কিন্তু বেশি বলিনি, কারণ অনেকে তা রাজনৈতিকভাবে নেবেন। নববর্ষের দিনে আইএমএফ বলেছে দুর্ভিক্ষের কথা। দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে খুব বেশি দেশের অভিজ্ঞতা নেই। আফ্রিকার কিছু দেশ আর বাংলাদেশ এ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এবারের অবস্থা আরো করুণ হতে পারে। তাই যত কথা।

দুর্ভিক্ষ সাধারণত আসে গুটি কয়েক দেশে, যাদের প্রাকৃতিক কারণে খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হয়। এবার? এবার প্রায় সব দেশই দুর্যোগে আক্রান্ত। আমার জানা কয়েকটি ঘটনা বলি।

এক. পরিচিত এক অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে একজন মারা গিয়েছেন করোনায়। তার স্বামী, কন্যা, জামাতা এমনকি নাতি-
নাতনি পর্যন্ত করোনা পজিটিভ। মরদেহ সত্কারে গোটা অ্যাপার্টমেন্টের প্রায় অর্ধশত বা তারও বেশি পরিবারের কেউ আসেনি। স্থানীয় মসজিদের ইমাম আসেননি। সরকারি ব্যবস্থায় তার দাফনের ব্যবস্থা হয়েছে। অতঃপর অ্যাপার্টমেন্টে বসবাসকারী অনেক পরিবার বলেছে, বাকিরাও যেন ভবন ছেড়ে চলে যান। সাহায্য তো নয়ই, বরং নিজের ঘরে থাকার অধিকারও যেন তাদের নেই।

দুই. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের স্ত্রী বহুদিন ধরে দুরারোগ্য রোগে ভুগছিলেন। তার স্ত্রী এই ডামাডোলের মাঝে গত হয়েছেন। তার মৃত্যু করোনায় হয়নি। তিনি বা তার মেয়েরা কাউকে পাননি মরদেহ সত্কারের জন্য। ইউটিউব দেখে মেয়েরা মায়ের গোসল করিয়েছেন। কেউ বিশ্বাস করেনি যে তিনি করোনায় মারা জাননি। পরে গ্রামের বাড়িতে তার দাফন সম্পন্ন করা হয়েছে।

তিন. চট্টগ্রামে এক পরিবারে স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। তার বড় বোন ও দুলাভাই এসেছেন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে। বাড়িওয়ালা নাখোশ। কেন বাইরের লোকজন এখন ভবনে এল? তার সাফ কথা। তাদের বিদায় করুন, নচেৎ বাড়ি ছেড়ে চলে যান।

চার. ত্রাণের ট্রাক যাচ্ছিল। জামালপুরের অদূরে একদল মানুষ ট্রাক থামিয়ে লুট করে নেয়। কারণ তাদেরও ঘরে খাবার নেই। তারা ত্রাণ পায়নি, অন্যেরা কেন পাবে? আবার এরই মাঝে ত্রাণের চাল চুরি হচ্ছে। ধরাও পড়ছে। তবে আমরা জানি, সবাই ধরা পড়বে না। ধরা পড়ার ঘটনা শুধু জানান দেয় যে চোর চারদিকে।

এই যখন অবস্থা তখন সরকারের উচিত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবেলা করা। গায়ের জোরে বা মুখের জোরে নয়। এ ধরনের ঘটনা আরো ঘটবে। ঘটনার সংখ্যা ও নিষ্ঠুরতাও বেড়ে যাবে। এর মধ্যে চলছে টাকা ওড়ানোর খেলা। অর্থনীতির তাত্ত্বিক কোনো জ্ঞান না থাকলে টাকা ওড়ানো সহজ। বিষয়গুলোর কিছু দিক পরিষ্কার করার জন্যই আজ লিখছি।

প্রথমত, অর্থনীতির চাকা স্তব্ধ। উৎপাদন ব্যবস্থার চাবিকাঠি হলো যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা। উৎপাদন করতে প্রয়োজন উপকরণ এবং সেই সঙ্গে বাজার ব্যবস্থা। আমার খামারে মুরগি আছে কিন্তু আমি মুরগির খাবার আনতে পারব না। উৎপাদন হবে না। আমার মুরগি আছে কিন্তু আমি বাজারে পাঠাতে পারব না, উৎপাদন নিরর্থক। আমার খামারে মাছ আছে কিন্তু মাছ ঢাকায় পাঠাতে পারব না, কারণ পরিবহন ও বিতরণ ব্যবস্থা বন্ধ। কী করব আমি মাছ নিয়ে? গোয়ালার দুধের অবস্থা, কৃষকের সবজি—
সবগুলোতেই একই অবস্থা। গ্রামগঞ্জে, হাটবাজারে হাজার হাজার আড়ত, পাইকার, পরিবহন ব্যবস্থা—
সব মিলিয়ে তৈরি হয় বাজার ব্যবস্থা। দুটো বাজার রয়েছে এখানে। একটি উপকরণের বাজার। অন্যটি পণ্যের বাজার। আমার জমিতে ধান কাটার অপেক্ষায় আছে। প্রয়োজন শ্রমিকের। কিন্তু এক জেলার শ্রমিক অন্য জেলায় যেতে পারবেন না বা গেলেও কোথাও থাকতে পারবেন না! শ্রমবাজার অচল। আমার ধান কাটা হবে না। আপনাদের কি মনে হয় যে ধান কাটার পর্যাপ্ত শ্রমিক প্রতিটি গ্রামে আছে? নিশ্চয়ই না। কৃষিকাজ সময়ের সঙ্গে বসে রয় না। সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড় কথাটা এজন্যই এসেছে। সময়মতো ধান না কাটলে, সময়মতো দুধ বাজারে না নিতে পারলে, সময়মতো মুরগির খাবার কিনতে না পারলে, সময়মতো পেঁপে না বেচতে পারলে কী হবে তা যেন আমরা ভুলেই গেছি।

দ্বিতীয়ত, করোনার প্রকোপ সহজে যাবে না। তাই দেখবেন বিশ্বের প্রায় প্রতিটি সরকার চেষ্টা করছে কত তাড়াতাড়ি অর্থনীতির চাকা খোলা যায় তার ব্যবস্থা করতে। যতদিন পর্যন্ত তা না হয় ততদিন সবাই গ্রহণ করেছে ‘প্রণোদনা’ ব্যবস্থা। অনেকেই ভুল করছেন এ প্রণোদনাকে উৎপাদন ব্যবস্থা সচল করার ব্যবস্থা বলে। এ প্রণোদনায় অর্থনীতি সচল হবে না। এ প্রণোদনায় উৎপাদন ব্যবস্থা চালু হবে না। তাহলে কেন এ প্রণোদনা? প্রণোদনা দেয়া হচ্ছে উৎপাদন সচল করার জন্য নয়, দেয়া হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষকে ন্যূনতম আয়ের বন্দোবস্ত করতে। তা না হলে সে না খেয়ে মরবে। প্রণোদনা কেন শিল্পপতি পাবেন? আমার বোধগম্য নয়। তবে তার যদি কোনো ঋণ থেকে থাকে এবং এ সময়ে তিনি যদি পরিশোধ করতে না পারেন, তবে তার দায়ভার কমাতে প্রণোদনা দেয়া যেতে পারে। নতুন করে ঋণ নিয়ে তিনি এখন কী করবেন? সরকারি নির্দেশে যদি কারখানা বন্ধ

হয়, তবে তিনি কেন ঋণের দায় বহন করবেন? তাই তিনি কিছু প্রণোদনা পাবেন। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, এজন্য তাকে ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে হবে। মোটেই তা হতে পারে না। তাহলে কু ঋণের পরিমাণ বাড়বে। প্রণোদনার টাকায় কুয়ালালামপুর, দুবাই, লন্ডন, নিউইয়র্ক বা টরন্টোতে বাড়ি হবে। অন্যদিকে নাজুক ব্যাংক ব্যবস্থা ধসে পড়বে।

তৃতীয়ত, কতদিন পর আমরা ফিরে পাব সুস্থ জীবন। চীনের অভিজ্ঞতা বলে চার মাস। ডব্লিউএই চও বলছে, যতদিন পর্যন্ত টিকা আবিষ্কার হবে না, ততদিন পর্যন্ত স্বাভাবিক হবে না। সেই অর্থে ২ ০২২ পর্যন্ত করোনা আসবে-
যাবে। ততদিন পর্যন্ত কি অপেক্ষা করা যাবে? নিশ্চয়ই নয়। টিকা আবিষ্কারের জন্য এখন সবাই মরিয়া। এমন লাভজনক ব্যবসা আর কখনো আসবে কিনা সন্দেহ। পৃথিবীর ৭০০ কোটি লোক কে টিকা দিতে হবে। যে কোম্পানি আগে টিকা বের করবে সে-
ই জিতবে। জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স সবাই নানাভাবে জানান দিচ্ছে যে টিকা আসছে। এরই মধ্যে চীন একটি টিকা আবিষ্কার করেছে বলে দাবি করেছে। জার্মানি করেছে। যুক্তরাষ্ট্রও করেছে। বুঝ তেই পারছেন যে বিলিয়ন ডলার ব্যবসায় সবার নজর আছে। ভারতও পিছিয়ে নেই। এ অবস্থায় টিকা আবিষ্কার হলেই যে বাংলাদেশের সবাই পাবে তা হবে না। তাই আমাদের ভাবতে হবে কী ক রা যায়। আমাদের বিকল্প ভাবতে হবে। স্পেন এরই মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে কিছু কার্যক্রম চালু করেছে। সুইডেন তাদের অর্থনীতির চাকা বন্ধ করতে রাজি হয়নি। সবাইকে বলেছে মুখোশ পরে বাইরে যেতে।

আমাদের অবস্থাটা একটু ভাবুন। ভালো মৌসুমে আমাদের বোরো ধানের উৎপাদন ১৯০ লাখ টন । এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে মে মাসের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহে সব হাওড়াঞ্চলের ধান না কাট লে তা পানিতে তলিয়ে যাবে। মে মাসের মধ্যে সারা দেশের সব ধান কাটতে হবে। একই সময়ে আউশ ফসলের কাজ শেষ করতে হবে। বর্ষার সবজিও বুনতে হবে। কৃষি খাতে তাই প্রয়োজন শ্র মিকের। অথচ যাতায়াত ব্যবস্থা বন্ধ (সংগত কারণেই)। এ সময়ে অর্জিত আয় কৃষি শ্রমিকদের ব র্ষায় খাবারের জোগান দেবে। তারপর আসবে আমন ফসলের ধুম। জুলাই, আগস্টে আমন ধান বোনার সময়। পাটের সময়। এ সময়েও প্রয়োজন হবে কৃষি শ্রমিকের। অন্যান্য বছর তা চোখে পড়ে না, কারণ ঢাকার শ্রমিকদের অনেকেই এ সময় বাড়ি যান কাজের খোঁজে। বর্ষায় শহরাঞ্চ লে রিকশাচালকসহ অনেক শ্রমিকই কমে যায় এ কারণে। তারপর সেপ্টেম্বর-
অক্টোবর হলো মঙ্গার মাস। দেশে প্রায় সাত কোটি লোক কর্মজীবী। তাদের অর্ধেককেও যদি সর কারকে ভাতার আওতায় আনতে হয়, তবে মাসিক ৫ হাজার টাকা করে দিলেও লাগবে প্রতি মা সে ১৭ হাজার কোটি টাকা, যদি ২ হাজার টাকা করে দিতে হয় তাহলে লাগবে মাসিক ৭ হাজার কোটি টাকা। আর মাসে ১ হাজার টাকা করে দিলে লাগবে সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকা। সরকারে র পক্ষে কি চার মাস ভাতা দেয়া সম্ভব হবে?

বলতে পারেন, আগস্ট পর্যন্ত কি আমাদের অন্তরীণ অবস্থা থাকবে? চীনে ডিসেম্বর থেকে শুরু করে এপ্রিল পর্যন্ত সবকিছু বন্ধ ছিল। তাদের পক্ষে যেভাবে মানুষকে গৃহ অন্তরীণ আইন মানতে

বাধ্য করা সম্ভব হয়েছিল, আমাদের ক্ষেত্রে তা হচ্ছে না বা করা সম্ভব হবে না। আমরা ভিন্ন সমাজে বাস করি। আমরা চীনা জাতি নই। আমরা এরই মধ্যে বিরক্ত। গরিবদের পক্ষে ঘরে বসে থাকা সম্ভব নয়। তাদের ঘর বলে যা আছে তা ঘর নয়। আমরাও ঘর বলি না, বলি ছাপড়া। তাদের ২০ দিনেই খাবারের অভাব হয়েছে। ১০০ দিন? অসম্ভব! আমাদের সামাজিক চেতনায় ঘুণ ধরেছে। আমরা নিজেদের নিয়েই ভাবি অথচ খোদ যুক্তরাষ্ট্রে যে সমাজ ব্যক্তিকেন্দ্রিক, সেখানে শুধু নিউ ইয়র্কেই এসেছে ৮৫ হাজার স্বেচ্ছাসেবী অন্য রাজ্য থেকে। আমাদের ত্রাণদাতারা এখনই ত্রাণ চুরিতে ব্যস্ত। যেন তারা ভাবছেন আগামীতে আরো দুর্দিন আসছে। আমারও চাল লাগবে বা চালের দাম বাড়লে ভালো ব্যবসা হবে!

কৃষি ক্ষেত্রে সরকারের দেয়া প্রণোদনা বাস্তবায়ন অসম্ভব। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে কি দেশে হাজার হাজার ট্রাক্টর দিয়ে ধান কাটা সম্ভব হবে? কে কিনবে? সরকার? বেশি দূর যেতে হবে না, গুটি কয়েক হাসপাতালে সরকারি খরচে যেসব ভেন্টিলেটর কেনা হয়েছিল, তা চালু রয়েছে কিনা জানতে সরকারের সময় লেগেছে এক মাস। ওয়েবসাইটে সংখ্যা দেয়া সহজ, বাস্তব অত্যন্ত কঠিন। এ বছর বিশ্বের খাদ্য উৎপাদনের পূর্বাভাস এমনিতেই সুবিধের নয়।

এরই মধ্যে সরকার ৭৫ হাজার কোটি টাকা বাজারে ঢালছে। উৎপাদনের চাকা অচল থাকলে এ টাকা কেবলই মূল্যস্ফীতি বাড়াবে। জিনিসপত্রের দাম বাড়াবে। আর সেই সঙ্গে প্রণোদনা গ্রহণের হাতের সংখ্যাও বাড়বে। এর মধ্যে মাত্র ৫ হাজার কোটি টাকা রয়েছে কৃষি খাতে, যার সিংহভাগ যাবে সার উৎপাদনে সরকারের ভর্তুকি হিসেবে। কেবল ঋণগ্রস্ত কৃষকরা পাবেন ঋণগ্রহণের সুবিধা। বাংলাদেশে হাজার হাজার একর জমির মালিক এক শিল্পপতি ও এনজিওগুলো। কিসের বিনিময়ে প্রকৃত কৃষক ঋণ পাবেন? কৃষিকে বাঁচাতে হলে প্রয়োজন বাজার ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখা। শ্রমিক বাদে অন্যরা প্রণোদনা পাবেন উৎপাদন চালু করার জন্য। তবে এখন নয়। তারও প্রয়োজন হবে আগামীতে। এ মুহূর্তে কেবল কর্মহীনরা পাবেন মাসোহারা, এ ব্যবস্থাই করা উচিত।

আমাদের বিপদ দুদিকেই। বাজার স্বাভাবিক করা হলে করোনার আক্রমণ কঠোর হবে। আবার তাই বলে ঘরে বসে থাকলে লাখ লাখ পরিবার না খেয়ে মারা যাবে আর আমরা বিত্তবানরা বেঁচে যাব। যেমন করে বেঁচেছি ১৯৭৪ সালে। মার্চের শেষেই লিখেছিলাম যে করোনা আমাদের বদলে দেবে। আমাদের ভাবতে হবে কী করে আমরা অর্থনীতির চাকা সচল করতে পারি এবং করোনা থেকে বাঁচতে পারি। দুটোই প্রয়োজন। অনেক দেশ তাই মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেছে। অনেকে জনঘনত্ব কমিয়েছে। পাশাপাশি দুজনকে দাঁড়াতে বা বসতে দিচ্ছে না। এক মিটার দূরত্ব আমাদের দেশে কেমন করে যেন ছয় ফুট হয়ে গেছে! কোন হিসাবে তা বুঝতে পারলাম না! জনঘনত্ব কমাতে হলে বাসে সিটের সংখ্যা অর্ধেক বা আরো কমাতে হবে। দোকানের আকার বড় করতে হবে। ক্লাসে বর্তমানের অর্ধেক ছাত্র ভর্তি করতে হবে। স্কুলের সংখ্যা বাড়াতে হবে নচেৎ 'ফ্লিপড ক্লাসরুম' চালু করতে হবে। সবাইকে 'করোনা ফ্রি' কিউআর কোডের আওতায় আনতে হবে (যা চীন করেছে)। আমাদের শিল্প-
কারখানায় শ্রমিকের সংখ্যা কমাতে হবে। এসব ব্যবস্থা চালু করার নীতি যত তাড়াতাড়ি করা হবে

ততই আমাদের জন্য মঙ্গল। গরিব মানুষ ঘরে থাকবে না। তাহলে তাদের না খেয়ে মরতে হবে। আর তারা ঘর থেকে বের হলে ধনীদের করোনায় মৃত্যু হবে। উৎপাদন ব্যবস্থা চালু না করে হাজার হাজার কোটি টাকার আয়োজন কেবল অবস্থাকে আরো নাজুক করবে। বুঝতে হবে আমরা কি নসীয় মন্দায় ভুগছি না। আমরা ভুগছি প্রাকৃতিক দুর্যোগে। চাহিদার সংকোচন এ অবস্থার সৃষ্টি করেনি। করেছে উৎপাদনের স্থবিরতা এবং তা থেকে সৃষ্ট আয়হীনতা। কেবল আয় বৃদ্ধি তাই সমাধান হবে না। উৎপাদনের চাকাও তাড়াতাড়ি সচল করা উচিত। আমাদের হাতে সময় কম। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তার কাজ করবে কিন্তু অন্য মন্ত্রণালয়গুলোকে ঘরে বসে থাকলে চলবে না। আমরা এরই মধ্যে জানি কারা করোনায় সংবেদনশীল। তাদের গৃহাভ্যন্তরে রেখে দূরত্ব বজায় রেখে ধীরে ধীরে অর্থনীতির চাকা চালু করাই হবে উত্তম ব্যবস্থা।

ড. এ. কে. এনামুল হক: অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়; পরিচালক, এশিয়ান
সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট

কালের কণ্ঠ

২১ এপ্রিল, ২০২০

মালদ্বীপ থেকে দেশে ফিরছেন প্রবাসীরা

মালদ্বীপ থেকে দেশে ফিরছেন আগ্রহী প্রবাসীরা। এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। রাজধানী মালে ও পার্শ্ববর্তী হুলুমালেতে থাকা এমন ৩১ জন বাংলাদেশিকে গতকাল সোমবার লাগেজসহ প্রস্তুত থাকতে বলেছে মালদ্বীপের বাংলাদেশ হাইকমিশন।

এক জরুরি বার্তায় হাইকমিশন গতকাল স্থানীয় সময় বেলা ২টার মধ্যে দেশে ফিরতে আগ্রহী বাংলাদেশিদের যোগাযোগ করতে বলেছিল। পরে তাঁদের মধ্য থেকে ৩১ জনের তালিকা করা হয়। করোনা মহামারিতে নিয়মিত ফ্লাইট বন্ধ থাকায় মালদ্বীপ থেকে প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশে ফেরা কঠিন হয়ে পড়েছে। বিশেষ ব্যবস্থায় কিছু কিছু বাংলাদেশিকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। মালদ্বীপের ৭১ জন নাগরিকসহ বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর ১০ সদস্যের একটি চিকিৎসকদল গতকাল বিমানবাহিনীর একটি পরিবহন বিমানে (সি-১৩০জে) মালদ্বীপ গেছে। চিকিৎসকদলটি মালদ্বীপে চিকিৎসাসেবা দেবে। বিমানটি ফেরার সময় কিছু বাংলাদেশিকে ফিরিয়ে আনা হবে বলে জানা গেছে।

মালদ্বীপের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল্লাহ শহিদ গত শনিবার এক টুইট বার্তায় বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সহায়তায় নেপাল ও বাংলাদেশে আটকে পড়া মালদ্বীপের নাগরিকদের দেশে ফেরানোর ঘোষণা দেন।

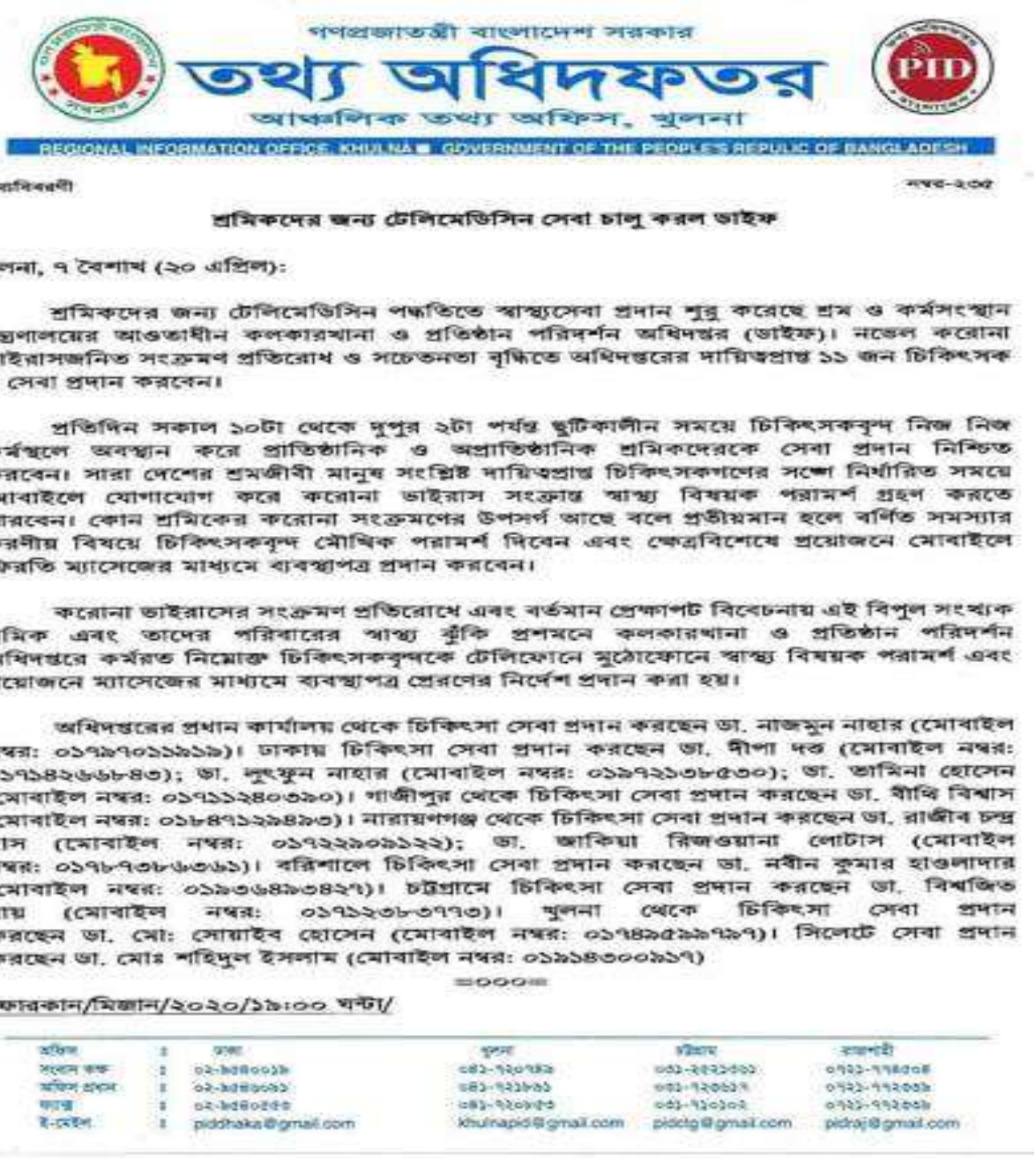

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তথ্য অধিদফতর

আঞ্চলিক তথ্য অফিস, খুলনা

REGIONAL INFORMATION OFFICE, KHULNA ■ GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

তথ্যবিবরণী

নম্বর-২৩৫

শ্রমিকদের জন্য টেলিমেডিসিন সেবা চালু করল ডাইফ

খুলনা, ৭ বৈশাখ (২০ এপ্রিল):

শ্রমিকদের জন্য টেলিমেডিসিন পদ্ধতিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান শুরু করেছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)। নভেল করোনা ভাইরাসজনিত সংক্রমণ প্রতিরোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ১১ জন চিকিৎসক এ সেবা প্রদান করবেন।

প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত ছুটিকালীন সময়ে চিকিৎসকবৃন্দ নিজ নিজ কর্মস্থলে অবস্থান করে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদেরকে সেবা প্রদান নিশ্চিত করবেন। সারা দেশের শ্রমজীবী মানুষ সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকগণের সঙ্গে নির্ধারিত সময়ে মোবাইলে যোগাযোগ করে করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবেন। কোন শ্রমিকের করোনা সংক্রমণের উপসর্গ আছে বলে প্রতীয়মান হলে বর্ণিত সমস্যার করণীয় বিষয়ে চিকিৎসকবৃন্দ মৌখিক পরামর্শ দিবেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োজনে মোবাইলে ফিরতি ম্যাসেজের মাধ্যমে ব্যবস্থাপত্র প্রদান করবেন।

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এই বিপুল সংখ্যক শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের স্বাস্থ্য ঝুঁকি প্রশমনে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে কর্মরত নিম্নোক্ত চিকিৎসকবৃন্দকে টেলিফোনে মুঠোফোনে স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ এবং প্রয়োজনে ম্যাসেজের মাধ্যমে ব্যবস্থাপত্র প্রেরণের নির্দেশ প্রদান করা হয়।

অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় থেকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন ডা. নাজমুন নাহার (মোবাইল নম্বর: ০১৭৯৭০১১৯১৯)। ঢাকায় চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন ডা. দীপা দত্ত (মোবাইল নম্বর: ০১৭১৪২৬৬৮৪৩); ডা. লুৎফুন নাহার (মোবাইল নম্বর: ০১৯৭২১৩৮৫৩০); ডা. আমিনা হোসেন (মোবাইল নম্বর: ০১৭১১২৪০৩৯০)। গাজীপুর থেকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন ডা. স্বাতি বিশ্বাস (মোবাইল নম্বর: ০১৮৪৭১২৯৪৯৩)। নারায়ণগঞ্জ থেকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন ডা. রাজীব চন্দ্র দাস (মোবাইল নম্বর: ০১৭২২৯০৯১২২); ডা. জাকিয়া রিজওয়ানা লোটাস (মোবাইল নম্বর: ০১৭৮৭৩৮৬৩৬১)। বরিশালে চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন ডা. নবীন কুমার হাওলাদার (মোবাইল নম্বর: ০১৯৩৬৪৯৩৪২৭)। চট্টগ্রামে চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন ডা. বিশ্বজিত রায় (মোবাইল নম্বর: ০১৭১২৩৮৩৭৭৩)। খুলনা থেকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন ডা. মো: সোয়াইব হোসেন (মোবাইল নম্বর: ০১৭৪৯৫৯৯৭৯৭)। সিলেটে সেবা প্রদান করছেন ডা. মোঃ শহিদুল ইসলাম (মোবাইল নম্বর: ০১৯১৪৩০০৯১৭)

==০০০==

ফোরকান/মিজান/২০২০/১৯:০০ ঘন্টা/

প্রধান	:	ঢাকা	খুলনা	চট্টগ্রাম	রাজশাহী
সংবাদ কক্ষ	:	০২-৯৫৪০০১৯	০৪১-৭২০৭৯৯	০৩১-২৫২৫৫১	০৭২১-৭৭৪৩০৫
অফিস প্রধান	:	০২-৯৫৪৩০৯১	০৪১-৭২১৮৫১	০৩১-৭২৩৫১৭	০৭২১-৭৭২৩৬৯
ফ্যাক্স	:	০২-৯৫৪০৫৫৩	০৪১-৭২০৮৫৩	০৩১-৭১০১০২	০৭২১-৭৭২৩৬৯
ই-মেইল	:	piddhaka@gmail.com	khulnapid@gmail.com	pidctg@gmail.com	pidraj@gmail.com

The Financial Express

২১ এপ্রিল, ২০২০

Online campaign launched to help returnee female workers: ILO

Migrant rights organisations recently launched an online campaign for providing emergency support to the returnee female workers, who are in a vulnerable situation because of COVID-19 pandemic.

Anirban Survivor Voice and Bhalobashi Bangladesh, platforms of migrant workers, jointly took the initiative for assisting the returnee female workers, said Mohammad Harun Al Rashid, coordinator of Bhalobashi Bangladesh.

He said a large number of Bangladeshi female workers returned home from different countries over the last few years due to various factors, like - workplace harassments, denial of due wage, and cheating by manpower recruiters. They were struggling to survive after coming back to the country.

But currently their condition has become more vulnerable following countrywide lockdown, enfeorced by the government to prevent the coronavirus outbreak.

“We have taken the initiative, considering such an adverse condition of the female workers,” he added.

On the other hand, Al Amin Noyon, president of Anirban Survivors Voice, said they are receiving a notable number of calls from returnee female workers since the platform was launched on April 17. They give Tk 1,500 to each woman for meeting up two weeks’ expenses.

He urged solvent people to donate for the workers, as they could arrange fund for only 20 women. People who want to donate can call the number 01712197854.

According to the welfare desk at Hazrat Shahjalal International Airport and rights activists, at least 10,000 female workers returned home from different Middle-East countries in last four years.

Of them, 1,500 domestic helps returned from Saudi Arabia alone in 2019. During the January-February period of this year 350 women were sent home from the country.

arafat_ara@hotmail.com

The Financial Express

Published: April 21, 2020

Migrant deportation: First batch from ME to arrive this week

More workers in the pipeline

AP file photo used for representation

The first flight carrying deported Bangladeshis will arrive by this week from Kuwait by a special flight of the Kuwait Airlines.

More than 10,000 undocumented and convicted Bangladeshi workers are in the queue to be deported from different countries hit by the coronavirus outbreak, officials said.

"The first batch of the deportees from Kuwait will arrive by this week unless there is any change of plan," foreign minister Dr AK Abdul Momen told the FE on Monday.

Kuwait has sent a list of 337 convicted and undocumented Bangladeshis in the first phase, officials of the foreign and expatriate welfare ministries said.

Initially, there was a list of 147 Bangladeshi workers in Kuwait, who are scheduled to be deported in the first flight, but the number will be changed, said the officials.

The Kuwait government is bearing the expenses for the deportation flights.

A couple of days ago, some Bangladeshi workers along with Umrah pilgrims, were deported from Saudi Arabia.

The foreign minister said other countries are also deporting Bangladeshi workers, who are staying there illegally.

According to the Ministry of Overseas Employment, the United Arab Emirates (UAE) will send back 209 and Malaysia will deport 455 Bangladeshis shortly in the first phase, followed by more.

The Maldives also wants to send back several hundred undocumented Bangladeshis.

According to unofficial sources, the number will be around 15,000 in the primary phase.

Many of them are convicted for various crimes. Saudi Arabia, Kuwait and Bahrain have released nearly 1,000 Bangladeshis from jail to ease pressure amid the outbreak of corona pandemic.

Saudi Arabia, Qatar, Bahrain and Oman will also deport Bangladeshis, but they are yet to finalise the list of deportees.

Expatriates' welfare and overseas employment minister Imran Ahmed said that the government had asked them to repatriate Bangladeshi workers keeping the local quarantine facility in mind.

"We cannot receive more people than our capacity" he said, adding that because quarantine is mandatory for all the returnees.

He said the exact number of workers to be deported from the Middle East cannot be ascertained yet.

Responding to a question, he said though the deportation will have a negative impact on the remittances inflow, the country has to take them back since they are the people of this land.

The foreign minister dismissed the notion that deportation was "a diplomatic failure" on the Bangladesh side.

These countries are sending illegal workers of other countries like Pakistan and India as well.

Instead, Bangladesh has been "successful" in pursuing these countries to send back Bangladeshi workers in limited number and in phases.

Dr Momen pointed out that most of these workers went there by illegal means.

"And our expatriate welfare ministry has no record of most of them," he said.

Dr Ahmed Munirus Salehi, additional secretary of the expatriates' welfare ministry, said that initially, Kuwait intended to send 147 Bangladeshi workers, but last Saturday the ministry came to know that the number would be revised

Earlier, they had provided a list of 147 for the first flight and 190 for the second flight, he added.

He, however, said that none of these countries will deport any Bangladeshi worker, who contracted the virus.

After their arrival, they will be sent to quarantine facilities, which have been established in several places near the airport.

The Armed Forces Division and the Department of Health Services will supervise the quarantine process.

The home ministry officials said those who were convicted in the Middle East for various crimes will have to fulfil the rest of their jail terms upon return home.

mirmostafiz@yahoo.com

বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

এপ্রিল ২৩, ২০২০

অর্থনীতিতে করোনার প্রভাব আমাদের করণীয়

সৈয়দ আব্দুল হামিদ

করোনার প্রভাবে বিশ্ব অর্থনীতি আজ অবরুদ্ধ। ধেয়ে আসছে মহামন্দা। আশঙ্কা করা হচ্ছে, এ মহামন্দার মাত্রা ১৯২০ সালের মহামন্দা থেকেও ভয়াবহ হতে পারে। বিশ্বের বড় বড় ও শক্তিশালী অর্থনীতির দেশের সরকারপ্রধানদের কপালে দুশ্চিন্তার কালো ছাপ স্পষ্ট। এটা যতটা কভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যার এবং এর ফলে মৃত্যুহারের ঊর্ধমুখীর জন্য, ঠিক ততটাই অর্থনীতিতে মহামন্দার আশঙ্কা নিয়ে। এ দুশ্চিন্তায় জার্মান অর্থমন্ত্রী থমাস শেফার আত্মহত্যা করেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। দুশ্চিন্তা বাংলাদেশের মতো মধ্যম আয়ের অর্থনীতির জন্যও কম নয়, বরং বহুমুখী। করোনা মোকাবেলার প্রচলিত লকডাউন থিসিস অনুসরণ করার ফলে বলা চলে কৃষি

উৎপাদন ছাড়া পুরো অর্থনীতি আজ অবরুদ্ধ। ফলে একদিকে যেমন অর্থনীতিতে ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে, অন্যদিকে নিম্ন আয়ের খেটে খাওয়া কয়েক কোটি মানুষের আহারের চরম অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

অনেক অর্থনীতিবিদ ও সমাজতত্ত্ববিদের মতে, এ মুহূর্তে অর্থনৈতিক ক্ষতির হিসাবনিকাশের চেয়ে মানবসভ্যতার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য করোনা মোকাবেলায় বেশি জোর দেয়া উচিত। অর্থনীতিবিদদের মতে, আগামী দু-তিন মাসের মধ্যে করোনা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারলে দু-এক বছরের মধ্যে দেশের অর্থনীতিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব। তবুও যুক্তরাষ্ট্রসহ কিছু দেশের সরকার অর্থনৈতিক ক্ষতি পুষিয়ে উঠতে এরই মধ্যে বড় অংকের প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ সরকারও বড় অংকের (প্রায় ৯৫ হাজার কোটি টাকা) প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। এ প্যাকেজ অর্থনীতিতে কতটুকু গতি ফিরিয়ে আনতে পারবে, তা একদিকে নির্ভর করবে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি মোট ক্ষতির পরিমাণের ওপর। অন্যদিকে তা নির্ভর করবে প্রণোদনা প্যাকেজের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ওপর। এ নিবন্ধে ২০১৮-১৯ সালের নমিনাল জিডিপির ভিত্তিতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে স্বল্পমেয়াদি বা চলতি ক্ষতির পরিমাণ কত হবে তা হিসাব করার একটা প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এ হিসাবটি একদিকে যেমন সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের যথেষ্ট কিনা, তা নিরূপণ করতে সাহায্য করবে। অন্যদিকে প্রণোদনা প্যাকেজের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ওপর জোর দেয়ার তাগিদও অনুভূত হবে।

আমরা জানি যে বাংলাদেশের অর্থনীতির তিনটি বড় খাত হচ্ছে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাত। প্রতিটি খাতের কয়েকটি উপখাত আছে। কৃষির প্রধান উপখাতগুলো হলো, শস্য উৎপাদন, প্রাণিসম্পদ ও মত্স্য সম্পদ। স্বল্পমেয়াদে এসব উপখাতে উৎপাদন না কমলেও দেশী ও বিদেশী অর্থনীতিগুলো অবরুদ্ধ থাকার কারণে এসব উপখাতের উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্যের ওপর নিম্নমুখী প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। ফলে অর্থনীতিতে প্রতিদিন প্রায় ২০০ কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে।

শিল্প খাতে, বিশেষ করে উৎপাদন ও নির্মাণ খাতে ক্ষতির মাত্রা প্রকট আকার ধারণ করেছে। এ খাতে প্রতিদিনের অনুমিত ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১ হাজার ১৩১ কোটি টাকা। অর্থনৈতিক ক্ষতি সবচেয়ে প্রকট আকার ধারণ করেছে সেবা খাতে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী বেচাকেনা এবং জরুরি সেবা ব্যতীত এ খাত মূলত অবরুদ্ধ। সব ধরনের যোগাযোগ (সড়ক, রেল, নৌ ও আকাশপথ), পর্যটন, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট, রিয়েল এস্টেটসহ সব প্রকার সেবা একেবারেই বন্ধ। স্বাস্থ্য খাতের বেসরকারি অংশটিতেও এক প্রকার অচল অবস্থা বিরাজ করছে। সব মিলিয়ে সেবা খাতে প্রতিদিনের অনুমিত চলতি ক্ষতির পরিমাণ কমপক্ষে ২ হাজার কোটি টাকা।

তাই প্রতিদিন কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে গড়ে মোট অনুমিত চলতি ক্ষতির পরিমাণ কমপক্ষে ৩ হাজার ৩০০ কোটি টাকা। প্রতিদিনের এই চলতি ক্ষতির পরিমাণ লকডাউন অবস্থার মেয়াদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে, যা এ মুহূর্তে হিসাব করা সম্ভব হয়নি। ২৬ মার্চ থেকে ২৫

এপ্রিল পর্যন্ত ৩১ দিনের অবরুদ্ধ অবস্থায় অনুমিত ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াবে কমপক্ষে ১ লাখ ২ হাজার ৩০০ কোটি টাকা। যেহেতু পুরো এপ্রিল মাসকে করোনার ভয়াবহতা হিসেবে আশঙ্কা করা হচ্ছে, তাই ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত লকডাউন অব্যাহত থাকলে এ ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ১ লাখ ১৮ হাজার ৮০০ কোটি টাকা। চীন, ইতালি, যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে বলা চলে, লকডাউন অবস্থা পুরো মে মাস এমনকি জুনেও অব্যাহত রাখার প্রয়োজন হতে পারে। যদি তাই হয়, তাহলে মে মাস শেষে অনুমিত চলতি ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াবে ২ লাখ ১৭ হাজার ৮০০ কোটি টাকা; যা গত অর্থবছরের মোট দেশীয় উৎপাদনের প্রায় ৯ শতাংশ।

মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির পরিমাণ এ মুহূর্তে হিসাব করা সম্ভব না হলেও তা আঁচ করা অসম্ভব নয়। অবরুদ্ধকাল দীর্ঘস্থায়ী হলে বেশির ভাগ ছোটখাটো ব্যবসা এবং ক্ষুদ্র উৎপাদন প্রতিষ্ঠান সহজেই ঘুরে দাঁড়াতে পারবে না। ফলে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ও ফরোয়ার্ড লিংকেজ চেইন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যার ফল সামগ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে ব্যাহত করবে। ধারণা করা হচ্ছে, কার্যকরী ভ্যাকসিন উদ্ভাবন এবং এর ব্যাপক ব্যবহার ছাড়া গুটি বসন্তের মতো বিশ্বব্যাপী রোগটি নির্মূল করা সম্ভব নয়। তাই করোনার কার্যকরী ভ্যাকসিন উদ্ভাবন এবং বিশ্বব্যাপী এর ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত অন্য দেশগুলো আমাদের দেশ থেকে শ্রমিক নেয়া বন্ধ রাখতে পারে। ফলে বাংলাদেশের রেমিট্যান্সপ্রবাহ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, যা বর্তমানে অনেকটা দৃশ্যমান। বিশ্ববাজারে তৈরি পোশাকের চাহিদা অনেকাংশে কমে যেতে পারে। ফলে বাংলাদেশের রফতানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্প আরো বেশি প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবে। এ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

আমরা আশা করি, মে মাস শেষে অর্থনীতি ধাপে ধাপে উন্মুক্ত করা সম্ভব হবে এবং সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্থনীতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে শুরু করবে। যদি মে মাসের পরেও অর্থনীতি উন্মুক্ত করা সম্ভব না হয় তাহলে রাজস্ব আদায় ও জিডিপির প্রবৃদ্ধিসহ সামগ্রিক অর্থনীতিতে এর ব্যাপক প্রভাব পড়বে, যা কাটিয়ে ওঠা অনেক কঠিন হতে পারে। ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার উপায়গুলো তাই আগে থেকেই খুঁজতে হবে।

করোনা প্রতিরোধে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক বারবার সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, হাঁচি-কাশিজনিত শুদ্ধাচার মেনে চলাসহ শারিরিক দূরত্বের নীতিমালার ওপর জোর দেয়ার মূল কারণ দুটি—(১) একসঙ্গে অনেক মানুষ আক্রান্ত হওয়া প্রতিরোধ করে স্ব-স্ব দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার করোনা মোকাবেলার ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং (২) ভ্যাকসিন ও প্রতিষেধক তৈরি করার জন্য যে সময় দরকার, সেই পর্যন্ত আক্রান্তের হারকে সহনীয় মাত্রায় রাখা। উন্নত বিশ্বের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে শারিরিক দূরত্ব বজায় রাখা সহজতর হওয়ার পরেও দেখা যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রসহ উন্নত দেশগুলোয় কভিড-১৯-এর রোগীর সংখ্যা হু-হু করে বেড়ে যাচ্ছে। তাই করোনা মোকাবেলায় সাধারণ লকডাউন পদ্ধতি কতটুকু কার্যকর, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। ধারণা করা হচ্ছে, এসব দেশ লকডাউন শুরু করতে ধীর নীতি অনুসরণ করেছে। তবে শুরুতেই লকডাউন, অ্যাগ্রেসিভ টেস্ট

এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, আইসল্যান্ড ও জার্মানি এক্ষেত্রে বেশ সফল হয়েছে।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতায় দীর্ঘমেয়াদে কার্যকরীভাবে শারিরিক দূরত্ব বজায় রাখা খুব কঠিন। উন্নত বিশ্বের সরকার ও জনগণের আর্থিক সক্ষমতা থাকায় অবরুদ্ধ অবস্থায় মানুষের মধ্যে খাবারের জন্য হাহাকার তেমন নেই। করোনা মহামারী মোকাবেলায় উন্নত বিশ্বের তুলনায় এক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক অসুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। বাংলাদেশের সরকারকে করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য বহুমুখী পদক্ষেপ নিতে হচ্ছে। একদিকে যেমন জনগণকে শারিরিক দূরত্বে উদ্‌বুদ্ধ করার জন্য আর্মি, পুলিশ, বিডিআরসহ সব আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে এবং করোনা টেস্টের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ কভিড-১৯ ম্যানেজমেন্টের জন্য বিনিয়োগ করতে হচ্ছে, অন্যদিকে কয়েক কোটি শ্রমজীবী মানুষের আহার প্রদানের জন্যও চিন্তা করতে হচ্ছে। সঠিক পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী সময়মতো শ্রমজীবী মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছতে না পারলে তারা জীবিকার তাগিদে ঘরের বাইরে বের হবে, যার লক্ষণ স্পষ্ট। ফলে জনগণ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হতে পারে। এমনকি আমাদের সেনাবাহিনীর গৌরবোজ্জ্বল মর্যাদাও প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে।

তাই বাংলাদেশকে এ মুহূর্তে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণের কথা ভাবতে হবে। করোনা মোকাবেলায় প্রচলিত ধারণার বাইরে অন্য কোনো কার্যকরী উপায় আছে কিনা, তা এখনো পরীক্ষিত নয়। তবে করোনা মোকাবেলা ও অর্থনৈতিক ক্ষতি কমিয়ে আনতে সর্বস্তরে লকডাউনের পরিবর্তে হটস্পটভিত্তিক লকডাউন এবং সবাইকে বাধ্যতামূলকভাবে মাস্ক ব্যবহারের ওপর অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিসহ বেশকিছু গবেষণা জোর দিয়েছে। আমরা আশা করি, মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ নাগাদ বাংলাদেশে করোনার হটস্পটগুলো চিহ্নিত হয়ে যাবে। তাই সারা দেশে বর্তমান প্রচলিত লকডাউনের পরিবর্তে কভিড-১৯-এর রোগীর সংখ্যা চিহ্নিত হওয়ার ভিত্তিতে ছোট ছোট এলাকাকেন্দ্রিক (যেমন ইউনিয়ন বা উপজেলা) লকডাউন করা যেতে পারে। তাছাড়া সবার জন্য দেশে যতদিন করোনার প্রভাব থাকবে, ততদিন বাড়ির বাইরে অবস্থানের সময় বাধ্যতামূলকভাবে মাস্ক ব্যবহারের ওপরও জোর দেয়া প্রয়োজন। জনগণের মধ্যে করোনা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কেরালার মতো স্লোগান (শারীরিক দূরত্ব ও সামাজিক সংহতি বজায় রাখা) প্রচারে জোর দেয়া উচিত।

আমাদের মনে রাখা দরকার, বাংলাদেশে বোরো মৌসুমের ধান কাটা আসন্ন। করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সারা দেশ অবরুদ্ধ থাকার ফলে ধান কাটার কৃষি শ্রমিক পাওয়া দুঃসাধ্য। সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জসহ আমাদের শস্যভাণ্ডারগুলোয় সমস্যা আরো প্রকট। মৌসুমি ঝড়-বৃষ্টি শুরু না হওয়ায় প্রাকৃতিকভাবে এখন পর্যন্ত ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। যতদূর জানা যায়, এ মৌসুমে বোরোর ফলনও ভালো হয়েছে। উল্লেখ্য, কৃষি শ্রমিকের অভাবে কৃষকরা সময়মতো ফসল তুলতে না পারলে দেশ চরম খাদ্য সংকটে পড়বে, যা মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হয়ে উঠবে।

তাই ধান কাটার কাজ কীভাবে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যায়, তার জন্য আশু সিদ্ধান্ত জরুরি। প্রয়োজনে সরকারি ব্যবস্থাপনায় উত্তরবঙ্গ বা অন্যান্য স্থান থেকে কৃষি শ্রমিক এনে এসব এলাকার ধান কাটার কাজ সম্পন্ন করা যেতে পারে। তবে শ্রমিক নির্বাচনের আগে কভিড-১৯-এ আক্রান্ত কিনা, তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে। ধান কাটার কাজ সম্পন্ন করার সময় শারীরিক দূরত্বসহ মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় এসব শ্রমিকের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে থাকার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট জেলাগুলোর জেলা প্রশাসকদের নেতৃত্বে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও কৃষি কর্মকর্তারা সার্বিক কাজ তদারক করতে পারেন।

সৈয়দ আব্দুল হামিদ: অধ্যাপক

স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশনার ৫৩ বছর
সংবাদ
বাংলাদেশের মুখপত্র

২৩ এপ্রিল ২০২০

মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত শ্রমিকদের চাকরি বহাল রাখার আহ্বান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

সংবাদ : করোনা পরিস্থিতিতে মধ্যপ্রাচ্যের যেসব দেশগুলোতে মুসলিম অভিবাসী শ্রমিক কাজ করছেন তাদের চাকরি বহাল রাখার জন্য ইসলামি সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন। করোনাভাইরাস মোকাবিলায় ওআইসির এক বিশেষ বৈঠকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

সৌদি আরবের সভাপতিত্বে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কোভিড-১৯ মহামারি নিয়ে বাংলাদেশ, তুরস্ক, সৌদি আরব, গাম্বিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও নাইজার- এই ছয়টি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বা উপযুক্ত প্রতিনিধি ও ওআইসি মহাসচিবের অংশগ্রহণে নির্বাহী কমিটির এই বিশেষ বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অভিবাসী শ্রমিকদের চাকরি বহাল থাকলে করোনায় সৃষ্ট বেকারত্বের কারণে হওয়া ক্ষতি কমানো ও সামাজিক সমতা বজায় রাখা সম্ভব হবে। এই মহামারির প্রকোপ না কমা পর্যন্ত মুসলিম অভিবাসীদের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান এবং তাদের চাকরি রক্ষার ব্যবস্থা করার জন্যে মানবাধিকার সংগঠনগুলোকে নিয়ে কাজ করতে ওআইসি সচিবালয়কে পরামর্শ দেয় বাংলাদেশ। চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং সরঞ্জামাদি নিয়ে যেসব গবেষণা প্রতিষ্ঠান কাজ করে তাদের করপোরেট

প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একত্রিত করে এই মুহূর্তে অতি প্রয়োজনীয় জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জামাদি তৈরির কাজে লাগাতে ওআইসি সচিবালয় এবং এর অঙ্গসংগঠনগুলোকে আহ্বান জানায় বাংলাদেশ।

এছাড়া প্রয়োজনীয় সম্পদ বণ্টনের মাধ্যমে এই মহামারির সময়ে বিশ্বব্যাপী যেসব মুসলিম শরণার্থী রয়েছে, তাদের দেখভালের বিষয়টির নিশ্চয়তার জন্য বাংলাদেশ সদস্য দেশগুলোর সমন্বিত প্রয়াসের ওপর গুরুত্বারোপ করে। সভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন সদস্য রাষ্ট্রগুলোর স্বেচ্ছা অনুদানের মাধ্যমে একটি কোভিড-১৯ রেসপন্স ও রিকোভারি তহবিল গঠনের প্রস্তাব রাখেন।

ওআইসির ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক গ্রুপ কোভিড-১৯ মোকাবিলায় সম্প্রতি ২৩০ কোটি ডলারের আর্থিক সহায়তার ঘোষণা দেয়। এছাড়া ওআইসির আরেকটি সংস্থা ইসলামিক সলিডারিটি তহবিল সদস্য রাষ্ট্রগুলো, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত সদস্য দেশগুলোকে তাদের স্বাস্থ্য খাতে সক্ষমতা বাড়াতে একটি আলাদা হিসাব খুলেছে। ওআইসি সচিবালয়ের আওতায় এসবের একটি সমন্বয় ব্যবস্থা তৈরির জন্য সভায় আলোচনা হয়।

বৈঠকে বিরোধপূর্ণ এলাকায় বিবদমান প্রতিপক্ষগুলোকে অস্ত্রবিরতির মাধ্যমে খাদ্য ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করার জন্য ওআইসি নির্বাহী কমিটি আহ্বান জানায় এবং সংশি¬ষ্ট যুদ্ধাহত দেশগুলোতে খাদ্য সহায়তা প্রদানে মানবাধিকার কর্মীদের অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়া কোভিড-১৯ ও এর পরবর্তী অবস্থা মোকাবিলার জন্য ওআইসির নির্বাহী কমিটি বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ-সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, দ্বিপাক্ষিক, বহুপাক্ষিক সংস্থাকে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ঋণ মওকুফসহ সহজ শর্তে ঋণ পাওয়ার বন্দোবস্ত করার জন্য ভেবে দেখতে আহ্বান জানায়।

সমকাল

২৪ এপ্রিল ২০২০

রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির ৭ বছর

করোনার ছোবলে করুণ অবস্থায় আহত শ্রমিকরা

আবু হেনা মুহিব: সাভারের মজিদপুরের পান-বিড়ির ছোট্ট দোকানি আবু কালাম। রানা প্লাজা ধসে একটি পা হারান। কাটা বাঁ পায়ে কৃত্রিম অঙ্গ লাগানো। যতটুকু সম্ভব ওই পায়ে চাপ কম দিয়ে কোনো রকমে দোকানে উঠে বসেন তিনি। বাকি সব কাজ করে দেন স্ত্রী সোনিয়া। দুই ছেলে, এক মেয়ে নিয়ে কালামের পাঁচজনের সংসার কোনো রকমে চলছিল; কিন্তু এখন আর চলছে না। করোনার ছোবলে গোটা পরিবারটি এখন এলোমেলো। দোকান খুলতে দেয় না পুলিশ। ত্রাণ নিয়ে কাড়াকাড়ি করার শারীরিক অবস্থা নেই তার। স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরাও কারও কাছে হাত পাততে নারাজ। ফলে খেয়ে না খেয়ে দিন কাটছে। সমকালকে

আবু কালাম বলেন, 'ভাই কীভাবে বেঁচে আছি আল্লাহ ছাড়া কেউ বুঝবে না।'

এ রকম আহত আড়াই হাজার শ্রমিক পরিবারের প্রায় একই অবস্থা। শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে এ রকম শোচনীয় দুরবস্থার কথা জানা গেছে। শ্রমিক নেতাদের মতে, প্রায় দুই মাস ধরে বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসের প্রভাবে অনেক সমর্থ পরিবারই বিপদে পড়েছে। সেখানে পঙ্গু বেকারদের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। ত্রাণ পেতেও এখন এক রকম দৌড়ছুট করতে হয়। সেখানে পঙ্গু শরীর নিয়ে তারা কতটুকুই করতে পারে। রানা প্লাজা ধসের সাত বছরের মাথায় এসে করোনা প্রার্দুভাবে এ রকম করুণ পরিণতির মুখে পড়েছে আড়াই হাজার পরিবার।

জানতে চাইলে জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী লীগের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম সমকালকে বলেন, প্রতিদিনই আহতদের অনেকেই তাদের ত্রাণ সহায়তার জন্য ফোন করছেন। রানা প্লাজায় আহতদের এই দুর্যোগকালে ত্রাণ সহযোগিতা দেওয়ার কথা বিজিএমইএর। কিন্তু তাদের এ ধরনের কোনো উদ্যোগ নেই। বিদেশি ক্রেতাদেরও এ নিয়ে নূযনতম কোনো সাড়া নেই। ফলে পরিবার-পরিজন নিয়ে অত্যন্ত মানবেতর জীবনযাপন করছেন রানা প্লাজার আহত শ্রমিকরা।

সাত বছর আগে রানা প্লাজা ধসে আহতদের পুনর্বাসনে ট্রাস্ট ফর ইনজুরড ওয়ার্কার্স মেডিকেল কেয়ার ইনক্লুডিং রানা প্লাজা ওয়ার্কার্সের (টিআইডব্লিউএমসি) সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা গেছে, আহতদের চিকিৎসার বাইরে অন্য কোনো খাতে খরচ করার এখতিয়ার তাদেরও নেই। টিআইডব্লিউএমসির সমন্বয়ক কৃষ্ণ সেন গতকাল সমকালকে বলেন, প্রতিদিনই আহত শ্রমিকদের কাছ থেকে ফোন পাচ্ছেন তারা। এখন আর কেউ চিকিৎসার জন্য ফোন করছেন না। সবার একই দাবি, ত্রাণ সহায়তা। কিন্তু তারা কিছু করতে পারছেন না। তিনি বলেন, করার মতো কিছু টাকা তাদের হাতে আছে। তবে এই তহবিল যে নীতিমালার অধীনে গঠন করা হয়েছে এবং ব্যয় প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা হয়েছে, তার বাইরে তারা যেতে পারছেন না। তিনি জানান, জনতা ব্যাংকে এখনও রানা প্লাজায় আহতদের চিকিৎসা বাবদ আট কোটি টাকা মেয়াদি সঞ্চয় (এফডিআর) জমা আছে। একই অ্যাকাউন্টে তাজরীন ফ্যাশনস কারখানার শ্রমিকদেরও চিকিৎসা বাবদ এক কোটি ২৫ লাখ টাকা এফডিআর আছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) উদ্যোগে আরও অর্থ আসার কথা রয়েছে। তিনি স্বীকার করেন, করোনাভাইরাসের কারণে সত্যিই আহতদের পরিবার অনেক কষ্টে আছে।

টিআইডব্লিউএমসির বাইরে ব্র্যাক ইউএসের অর্থে গুরুতর আহত ১১০ জনের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। সাভার সিআরপির মাধ্যমে এসব আহতের সর্বোচ্চ চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। প্রকল্পের ব্যবস্থাপক রেজাউল করিম গতকাল সমকালকে জানান, রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় আহতদের চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন তারা। জানা গেছে, আর দুই মাস পর আগামী জুনে এ প্রকল্পটি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সাত বছরের মেয়াদের প্রকল্পটি আর সম্প্রসারণ হচ্ছে না।

২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল রাজধানীর অদূরে সাভারে রানা প্লাজা নামে একটি বহুতল ভবন ধসে পড়ে। এতে ভবনের পাঁচ পোশাক কারখানার এক হাজার ১৩৮ শ্রমিক প্রাণ হারান। আহত হন আড়াই হাজার। এ দুর্ঘটনাকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম শিল্প দুর্ঘটনা হিসেবে মনে করা হয়।

তিন দিনের কর্মসূচি : রানা ট্র্যাজেডির বর্ষপূর্তি উপলক্ষে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে। তবে করোনার কারণে সব কর্মসূচিই অনলাইনের মাধ্যমে পালন করা হবে। তিন দিনব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করেছে গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতি। গতকাল সংগঠনের ফেসবুক পেজে লাইভে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এ কর্মসূচি শুরু হয়। এতে কথা বলেন সংগঠনের সভা প্রধান তাসলিমা আখতার। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে আজ শুক্রবার দিনব্যাপী রানা প্লাজার ঘটনায় নিহতদের ছবি এবং বিভিন্ন দাবি-দাওয়া হাতে স্বজনসহ সবাই মিলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছবি পোস্ট দেওয়া। সকাল ১১টা ১ মিনিটে নীরবতা পালন। বিকেল ৪টায় মতবিনিময় সভা। এ ছাড়া ২৫ এপ্রিল দু'দিনব্যাপী অনলাইন ছবির প্রদর্শনী পূর্ণ বেতন চাই। অন্যান্য সংগঠনের পক্ষ থেকেও আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী
এপ্রিল ২৪, ২০২০

অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে অভিবাসী শ্রমিকদের বৈধতা দিতে যাচ্ছে ইতালি

বণিক বার্তা অনলাইন: কভিড-১৯ প্রকোপে বিপর্যস্ত ইতালি। এই সংকট পরবর্তী অর্থনীতি পুনরুদ্ধার কৌশলের অংশ হিসেবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অভিবাসী কর্মীকে বৈধতা দিতে যাচ্ছে দেশটির সরকার।

ইতালির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লুসিয়ানা ল্যামোরগেস সংসদের নিম্নকক্ষের কনস্টিটিউশনাল অ্যাফেয়ার্স কমিটির শুনানিতে বলেন, অভিবাসী কর্মীদের বৈধতা দেয়ার ব্যাপারে তার অবস্থান ইতিবাচক। তিনি এ ব্যাপারে খোলাখুলি কথা বলতে চান। তবে ৬ লাখ অভিবাসীকে বৈধতা দেয়ার ব্যাপারে যে কথা উঠেছে সেই সংখ্যাটি সঠিক নয়। এটি নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা নাও হতে পারে। যা হবে প্রয়োজন ও আইনের মধ্যে থেকেই।

অনিয়মিত অভিবাসী শ্রমিকদের বৈধতার প্রস্তাব দিয়েছেন যে কয়জন রাজনীতিক ও মন্ত্রী তার মধ্যে অন্যতম কৃষিমন্ত্রী তেরেসা বেলানোভা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমি বেলানোভার সঙ্গে কথা বলেছি। আমরা এ বিষয়ে একসঙ্গে কাজ করছি। সঠিক সময়েই আমরা উপযুক্ত সিদ্ধান্তটি নেব। এই মুহূর্তে এমন কিছু হতে যাচ্ছে না। অন্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে এ ব্যাপারে এখনো সুনির্দিষ্ট আলোচনা হয়নি।

করোনা মোকাবিলায় ইতালির জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার পাশাপাশি কৃষি খাতে উন্নয়ন ও করোনা পরবর্তীতে খাদ্যসংকট যাতে না হয় সে জন্য দেশের রাজনীতিবিকরা অবৈধ অভিবাসীদের

বৈধতা দেয়ার কথা বিবেচনার জন্য সরকারকে পরামর্শ দিচ্ছেন। বিশেষ করে, কৃষি খাতে শ্রমিক সংকট সমাধানে ইতালি সরকার কয়েক সপ্তাহ ধরেই আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

এ নিয়ে কয়েক দিন ধরে ইতালির প্রখ্যাত লা রিপাবলিকাসহ বেশ কয়েকটি দৈনিক এ নিয়ে প্রতিবেদন ও সাক্ষাৎকার প্রকাশ করছে।

গত শনিবার (১৮ এপ্রিল) দেশটির সরকারের একটি সূত্র জানায়, প্রায় ৬ লাখ অবৈধ অভিবাসীকে বৈধতা দেয়ার প্রক্রিয়ার ঘোষণা খুব শিগগিরই আসছে। এরই মধ্যে এ প্রক্রিয়া নিয়ে ১৬ পৃষ্ঠার একটি খসড়া নীতি প্রস্তুত করা হয়েছে।

ইতালির কৃষিমন্ত্রী তেরেসা বেলানোভা সংসদে এক আলোচনায় বলেন, প্রাণঘাতি করোনায় ইতালির অর্থনৈতিক চাকা অচল হয়ে পড়ছে। এদিকে ইতালির কৃষিখাতে ব্যাপক ধস নেমেছে। এই মুহূর্তে ইতালির কৃষিখাতের উন্নয়নে অনেক জনশক্তি প্রয়োজন।

এছাড়া কোভিড-১৯ এর প্রভাবে এব ছর বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে জনশক্তি আমদানি করা সম্ভব না। এই অবস্থায় যদি কৃষিখাতে জনশক্তি নিয়োগ করা না হয় তাহলে ভবিষ্যতে ইতালিকে খাদ্য সঙ্কটে পড়তে হবে।

ইতালির অবস্থানরত অবৈধ অভিবাসীদের বৈধ করে বিভিন্ন খাতে কাজ করার সুযোগ দেয়া উচিত বলে মত দেন তিনি।

অভিবাসীদের বৈধতার ঘোষণা এলে বিশেষ করে ইতালিতে অবস্থানরত বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী উপকৃত হবে বলে আশা করা যায়। ইতালির বিভিন্ন শহরে দুই লাখের বেশি বাংলাদেশীর বসবাস। অবশ্য এর মধ্যে কতোজন অবৈধ তার সঠিক পরিসংখ্যান নেই। তারপরও ধারণা করা হয়, তাদের সংখ্যা হবে প্রায় ৬০ হাজার।

কালের কণ্ঠ

২৪ এপ্রিল ২০২০

তারল্য সরবরাহ বাড়াতে উদ্যোগ
বড় ও সেবা শিল্পে ১৫ হাজার কোটি টাকার পুনরর্থায়ন তহবিল

নিজস্ব প্রতিবেদক : বড় ও সেবা শিল্পের জন্য প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ৩০ হাজার কোটি টাকার ঋণ তহবিলের ৫০ শতাংশ অর্থের জোগান দেবে বাংলাদেশ ব্যাংক। এ লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিজস্ব উৎস থেকে ১৫ হাজার কোটি টাকার একটি পুনরর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে। এ তহবিলের নাম দেওয়া হয়েছে ‘বৃহৎ শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঋণ সুবিধা প্রদানের পুনরর্থায়ন স্কিম’।

৪ শতাংশ সুদে এই তহবিল পাবে ব্যাংকগুলো, যা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আরোপিত হবে। গতকাল বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ থেকে এসংক্রান্ত সার্কুলার জারি করা হয়েছে।

করোনাভাইরাসের অর্থনৈতিক ক্ষতি মোকাবেলায় বড় ও সেবা শিল্পের জন্য চলতি মূলধন ঋণ জোগানে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ৩০ হাজার কোটি টাকার তহবিলের ব্যবহার নিয়ে গত ১২ এপ্রিল সার্কুলার জারি করে বাংলাদেশ ব্যাংক। ওই সার্কুলারে বলা হয়েছিল, এ তহবিলের পুরোটাই বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজস্ব উৎস থেকে বিতরণ করতে হবে। তবে অনেক ব্যাংক তারল্য সংকটে থাকায় এখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিজস্ব উৎস থেকে ১৫ হাজার কোটি টাকার তহবিল জোগান দিতে এই পুনরর্থায়ন স্কিম গঠন করা হলো। এর ফলে বাকি ১৫ হাজার কোটি টাকা ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজস্ব উৎস থেকেই বিতরণ করতে হবে।

বৃহস্পতিবারের সার্কুলারে বলা হয়েছে, আর্থিক সহায়তা প্যাকেজে তারল্য সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে বড় ও সেবা শিল্পে চলতি মূলধন জোগানে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ৩০ হাজার টাকার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ১৫ হাজার কোটি টাকার পুনরর্থায়ন স্কিম গঠন করা হয়েছে। এ তহবিলের মেয়াদ হবে তিন বছর। প্রতিটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এসংক্রান্ত আগের সার্কুলার অনুযায়ী বরাদ্দকৃত তহবিলের বিপরীতে ৫০ শতাংশ অর্থ এই স্কিমের আওতায় পুনরর্থায়ন সুবিধা নিতে পারবেন। এর আওতায় পুনরর্থায়ন গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে একটি অংশগ্রহণমূলক চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। এর আওতায় পুনরর্থায়নকৃত অর্থ উদ্দেশ্যবহির্ভূত অন্য কোনো খাতে ব্যবহার করা হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সে পরিমাণ অর্থের ওপর নির্ধারিত সুদহারের অতিরিক্ত ২ শতাংশ সুদ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে এককালীন আদায় করতে পারবে।

গত ১২ এপ্রিলের সার্কুলার অনুযায়ী, যেসব শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠান করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শুধু সেসব প্রতিষ্ঠানই এর আওতায় সুবিধা পাবে। কোনো খেলাপি গ্রহীতা এ তহবিলের ঋণ পাবেন না। এ ছাড়া যেসব প্রতিষ্ঠানের ঋণ মন্দ ঋণে পরিণত হওয়ায় এরই মধ্যে তিনবারের বেশি পুনঃ তফসিল সুবিধা নিয়েছেন, তাঁরাও এই প্যাকেজের সুবিধা পাবেন না। এ তহবিল থেকে ব্যাংকের মাধ্যমে উদ্যোক্তারা ৯ শতাংশ সুদে ঋণ নিতে পারবেন। তবে তাঁদের ৪.৫ শতাংশ সুদ পরিশোধ করতে হবে, বাকি ৪.৫ শতাংশ সুদ সরকার ভর্তুকি হিসেবে দেবে।

কালের কণ্ঠ

২৪ এপ্রিল ২০২০

বিশ্লেষণ

শিল্প-কারখানা খোলা রেখেই লকডাউনের কৌশল নিতে হবে

ড. শাহীন আকতার কনসালট্যান্ট ও গবেষণা সহযোগী, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি, ইংল্যান্ড

একজন অর্থনীতিবিদ হিসেবে আমার ভাবনায় যে বিষয় ঘুরে ফিরে আসছে তা হলো করোনার এই সংকটপূর্ণ সময় ও এ থেকে উত্তরণের পর কিভাবে অনাহারী মানুষের মৃত্যু ঠেকানো যাবে? দেশের উৎপাদন এবং সরবরাহ ব্যবস্থায় বিপুল ক্ষয়ক্ষতি বিবেচনায় নিয়েই আমাদের লকডাউনে থাকতে হচ্ছে।

তুলনামূলকভাবে দরিদ্র মানুষদের বরাবরই মৌলিক চাহিদা পূরণে হিমশিম খেতে হয়। করোনাভাইরাসের প্রভাবে অতি দরিদ্র মানুষের সংখ্যা আরো বাড়বে, যারা অনাহারে-অর্ধাহারে দিন যাপন করবে। এরই মধ্যে জাতিসংঘ আসন্ন দুর্ভিক্ষের ব্যাপারে সতর্কবাণী দিয়েছে। তাহলে প্রশ্ন আসে—এই দুর্যোগে আমাদের করণীয় কী? কিভাবে আমরা টিকে থাকব?

উত্তরে বলতে হয়, উপায় অবশ্যই আছে। আমরা নিজেরা সচেতন থেকে এই ভাইরাস ছড়ানো প্রতিরোধ করতে পারি। কিন্তু একই সঙ্গে উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রাখলে শারীরিক ও মানসিকভাবে এই রোগের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইটাও জোরদার হবে। এবং ব্যাপকভাবে ক্ষুধা ছড়ানো রোধ করা সম্ভব হবে। আমি মনে করি এখনই চলমান লকডাউন কৌশল নিয়ে আলোচনা করা দরকার, যাতে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া যায়।

আমি চিকিৎসক নই তবে আমি দেখেছি দুর্বল শরীরের অধিকারীরা বাদে স্বাস্থ্যবানরা ভালোভাবেই করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলা করছে। এ কারণে মৃত্যুহারও কম।

এখন সুস্বাস্থ্যের অধিকারীরাও লকডাউনে আছেন কারণ যেকারোর মাধ্যমেই করোনাভাইরাস ছড়াতে পারে। এ জন্যই আমাদের লকডাউন কৌশল নিয়ে আরো ভাবতে হবে যেন স্বাস্থ্যবানরা করোনাভাইরাস মোকাবেলা করে পুরোদমে কাজ করতে পারেন।

একটাই উপায় হতে পারে তা হলো— শিল্প-কারখানা সচল রেখে লকডাউন কৌশল করা গেলে ভবিষ্যতের বড় অর্থনৈতিক বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হবে। পরীক্ষামূলকভাবে সেই চেষ্টা করা যেতে পারে। শিল্প শ্রমিকদের লকডাউনে থেকে কাজের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। শিল্পোদ্যোক্তারা এ বিষয়টি ভেবে দেখতে পারেন। আপনারা স্বাস্থ্যবান লোকদের কাজে ডাকতে পারেন সেই সঙ্গে তাঁদের পরামর্শ দিতে পারেন কিভাবে এই ভাইরাস মোকাবেলা করে তাঁরা কাজ করতে পারবেন। এর ফলে অর্থনীতির চাকা সামনে এগোবে।

কালের কণ্ঠ

২৪ এপ্রিল ২০২০

প্রবাসীদের সঞ্চয় বন্ডের টাকা পরিশোধের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক: সীমিত ব্যাংকিং কার্যক্রমের মধ্যেই প্রবাসীদের সঞ্চয় বন্ড মেয়াদপূর্তির আগে ও পরে নগদায়ন এবং মুনাফা পরিশোধের নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। সাধারণ ছুটির মধ্যে এত দিন ব্যাংকের বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম সীমিত পরিসরে অব্যাহত থাকলেও এনআরবি বন্ডের টাকা পরিশোধের বিষয়ে আলাদাভাবে কোনো নির্দেশনা ছিল না। গতকাল বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে এসংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

জানা যায়, প্রবাসীদের উপার্জিত রেমিট্যান্সের অর্থ বিনিয়োগে আনতে তিন ধরনের বন্ড চালু করা হয়। এগুলো হলো ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড ও ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড। এই তিন ধরনের বন্ডেই মিলছে আকর্ষণীয় সুদের হারসহ বিভিন্ন সুবিধা। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, আগে থেকেই মেয়াদ পূর্তি সাপেক্ষে জাতীয় সঞ্চয়পত্র এবং কুপনের অর্থ পরিশোধের কার্যক্রম চালু রয়েছে। তবে মাঝেমধ্যে সমস্যায় পড়ছেন বন্ডের বিনিয়োগকারীরা। তাই মেয়াদপূর্তির আগে অথবা মেয়াদপূর্তির পর এনআরবি বন্ড নগদায়ন ও কুপন প্রদানসংক্রান্ত কার্যক্রম চালু রাখার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

কালের কণ্ঠ

২৪ এপ্রিল ২০২০

শ্রমজীবী পরিবারে ক্ষুধার কষ্ট

রবিদাস সম্প্রদায়ের মানুষের দুর্দিন

৫২ বছর বয়সী মানিক দাস রবিদাস (চর্মকার) সম্প্রদায়ের মানুষ। বংশপরম্পরায় এই পেশায় আছেন। স্ত্রী ও তিন ছেলেকে নিয়ে পাঁচ সদস্যের পরিবার তাঁর। বাড়ি নীলফামারীর সৈয়দপুর শহরের হাতিখানা মহল্লায়।

জানা গেছে, মানিক দাস সৈয়দপুর শহরের বিমানবন্দর সড়কের ট্রাফিক পুলিশ বক্সের পাশে জুতা-স্যান্ডেল সেলাইয়ের কাজ করেন। রেলওয়ের লাইন ঘেঁষে অস্থায়ী দোকান বসিয়ে সারা দিন কাজ করে যে যৎসামান্য আয়রোজগার হয়, তা দিয়ে চলে পাঁচ সদস্যের পরিবার। তার ওপর বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ তিনি। এর মধ্যে মানিক দাস আবার ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়েছেন। ভুগছেন প্রেসার ও হৃদরোগেও। এসব রোগবালাইয়ের জন্য চিকিৎসক নিয়মিত ওষুধ সেবনের পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু প্রতিদিনের উপার্জিত অর্থে তাঁর পরিবারের সদস্যদের দুই বেলা খাবারই ঠিকমতো জোটে না। তাই নিয়মিত ওষুধ সেবন করা হয়ে ওঠে না তাঁর। তাতে দিন দিন তাঁর

অসুস্থতা আরো বাড়ছে। তার পরও পরিবারের সদস্যদের মুখে আহার তুলে দিতে শরীরের সঙ্গে অনেকটাই লড়াই করে চলছিলেন মানিক দাস। কিন্তু চলমান করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে চরম বিপাকে পড়েছে তাঁর পরিবার।

গোটা নীলফামারী জেলা তথা সৈয়দপুর শহরে এখন লকডাউন চলছে। সব ধরনের দোকানপাট, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, কলকারখানা বন্ধ। সে কারণে কাজকর্মও নেই। মানিক দাসের মতো এ পেশায় জড়িত সুদর্শন দাস, গণেশ দাস, চরণ দাসসহ সবাই এখন বেকার।

গতকাল বুধবার শহরের হাতিখানা এলাকার বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, একটি জীর্ণশীর্ণ ঘরে পরিবার নিয়ে বসবাস করেন মানিক দাস। তিন শতকের একটি বাড়িতে তিন ভাই পরিবার নিয়ে থাকেন। মানিক বলেন, রবিদাস সম্প্রদায়ের লোকজন ভূমিহীন হওয়ায় চাল-ডালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সব কিছুই কিনে খেতে হয়। সারা দিন শহরের বিভিন্ন স্থানে জুতা-স্যান্ডেল পলিশ ও মেরামতের কাজ করে যে টাকা আয় হতো, তা দিয়ে কোনোমতে সংসার চলত। কিন্তু বর্তমানে দিনে এক বেলাও ঠিকমতো খাবার মিলছে না। গত শুক্রবার কালের কণ্ঠ শুভসংঘের পক্ষ থেকে তাঁদের সম্প্রদায়ের ২০ পরিবারকে বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। এর পর থেকে আর কেউ তাঁদের সহায়তা দেয়নি। এ অবস্থায় অবর্ণনীয় দুর্ভোগে পড়েছেন তাঁরা।

সৈয়দপুরে রবিদাস (চর্মকার) সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন নিয়ে কাজ করছে বেসরকারি উন্নয়ন গবেষণা সংস্থা রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ। প্রতিষ্ঠানটির আঞ্চলিক সমন্বয়কারী মো. মতিউর রহমান মতি বলেন, রবিদাস সম্প্রদায়ের লোকজন কোনোমতে সংসার চালায়। কিন্তু বর্তমানে এই সম্প্রদায়ের মানুষগুলো চরম আর্থিক ও খাদ্যসংকটে পড়েছে।

মতিউর রহমান মতি আরো বলেন, এ অবস্থায় সরকারের রেশন কার্ড থেকে শুরু করে সব ধরনের নাগরিকসেবায় রবিদাস সম্প্রদায়ের শতভাগ মানুষকে সংযুক্ত করা দরকার। তিনি রবিদাস সম্প্রদায়ের লোকজনের অনলাইনভিত্তিক তালিকা এবং অনলাইন স্লিপের ব্যবস্থা করে ত্রাণ বিতরণ ও সার্বিক কার্যক্রম মনিটরের ব্যবস্থা নেওয়া দরকার বলে মত প্রকাশ করেন।

প্রথম আলো
২৪ এপ্রিল ২০২০

করোনার ক্ষতি

শিল্প ও সেবা খাতের জন্য ৩০ হাজার কোটি টাকার প্যাকেজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা: করোনাভাইরাসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সেবা খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোকে ৩০ হাজার কোটি টাকা ঋণ দিতে প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ সরকার। ব্যাংকগুলোর নিজস্ব উৎস থেকেই এ ঋণ দিতে হবে। গতকাল বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ব্যাংক এই ঋণের অর্থ জোগান দিতে ১৫ হাজার কোটি টাকার আবর্তনশীল পুনঃ অর্থায়ন তহবিল গঠন করেছে।

এর ফলে ব্যাংকগুলো এ তহবিল থেকে ৪ শতাংশ সুদে অর্থ নিয়ে গ্রাহকদের ৯ শতাংশ সুদে ঋণ দিতে পারবে। এতে ব্যাংকগুলো তারল্যসংকটে পড়ার যে আশঙ্কা করছিল, তা অনেকটা লাঘব হবে।

নীতিমালা অনুযায়ী, একটি ব্যাংক যে পরিমাণ অর্থ ক্ষতিগ্রস্ত বড় শিল্প ও সেবা খাতের প্রতিষ্ঠানকে দেবে, ঠিক তার অর্ধেক এই তহবিল থেকে নিতে পারবে। এ ঋণের মেয়াদ হবে তিন বছর এবং সুদের হার ৪ শতাংশ। ঋণের সুদ ত্রিমাসিক ভিত্তিতে আরোপিত হবে। এ জন্য আগ্রহী ব্যাংকগুলোকে বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে অংশগ্রহণমূলক চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে।

এর আগে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নীতিমালা দিয়ে জানিয়েছিল, করোনাভাইরাসের প্রকোপে অর্থনৈতিক ক্ষত মোকাবিলায় সরকার যে প্রণোদনা ঘোষণা করেছে, ঋণখেলাপিরা সেই তহবিল থেকে ঋণ নিতে পারবে না। শুধু ঋণখেলাপি নয়, তিনবারের বেশি ঋণ পুনঃ তফসিল করেছেন, এমন ব্যবসায়ীরাও এ তহবিল থেকে ঋণ পাবেন না। এ শর্ত দিয়ে শিল্প ও সেবা খাতের ৩০ হাজার কোটি টাকার চলতি মূলধন তহবিলের এ নীতিমালা জারি করেছিল। এ ঋণের মেয়াদ হবে তিন বছর, তবে সরকার প্রথম বছরে সুদ হিসেবে অর্ধেক বা সাড়ে ৪ শতাংশ বহন করবে। ব্যাংকগুলো নিজস্ব তহবিল থেকে ঋণ নীতিমালা মেনে এ ঋণ দেবে।

প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে, করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে বাংলাদেশের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবন, শ্রমিক-কর্মচারীদের কাজে বহাল এবং উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে ব্যাংকিং–ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্প সুদে ঋণসুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ৫ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বা চলতি মূলধনসুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ৩০ হাজার কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করেন।

এই প্যাকেজের আওতায় ব্যাংকগুলো করোনাভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সেবা খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ঋণসুবিধা দেবে। চলতি মূলধন হিসেবে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সেবা খাতের প্রতিষ্ঠানের সুদের বোঝা সহনীয় করার জন্য এ প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। গ্রাহক পর্যায়ে সুদহার হবে ৯ শতাংশ। এর অর্ধেক বা সাড়ে ৪ শতাংশ সরকার সুদ ভর্তুকি দেবে।

নীতিমালা অনুযায়ী, এ ঋণ ব্যাংকগুলোর নিজস্ব ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী অনুমোদিত হতে হবে এবং প্রতিটি ঋণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ থেকে সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। সরকার যে সুদ প্রদান করবে, তা বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে দেওয়া হবে। এই তহবিল থেকে কোন ব্যাংক কত টাকা চলতি মূলধন পাবে, তা ওই ব্যাংকের ২০১৯ সালের এই দুই খাতে কী পরিমাণ ঋণ দিয়েছে, তার ওপর নির্ভর করবে।

এই প্যাকেজের মেয়াদ হবে তিন বছর। তবে কোনো গ্রাহক সর্বোচ্চ এক বছর সুদ ভর্তুকি পাবেন। যেসব প্রতিষ্ঠান করোনাভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, শুধু তারাই এই সুবিধার আওতাভুক্ত

হবে। যেসব ব্যবসায়ী এখনো ব্যাংক থেকে কোনো ঋণসুবিধা নেননি কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত, তাঁরাও এ তহবিল থেকে ঋণ নিতে পারবেন। এ জন্য তাঁদের আর্থিক বিবরণীর রেটিং ন্যূনতম মার্জিনাল বা প্রান্তিক হতে হবে। যেসব প্রতিষ্ঠান ঋণসুবিধা পাবে, তারা ওই প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তা ব্যবহার করবে। ব্যবসা সম্প্রসারণ বা নতুন কোনো ব্যবসার জন্য এই ঋণ ব্যবহার করা যাবে না।

একটি প্রতিষ্ঠান তহবিল থেকে কী পরিমাণ ঋণ পাবে, তা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। যেসব প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে ব্যাংক থেকে চলতি মূলধন সুবিধা নিয়েছে, তার ৩০ শতাংশের বেশি এই তহবিল থেকে নিতে পারবে না।

ব্যাংকগুলোর কাছে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান আবেদন করলে, যেসব প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত, তারা আগে এই ঋণসুবিধা পাবে। পরবর্তী বছরে ধারাবাহিকভাবে অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ সুবিধা দিতে হবে। একক গ্রাহক ঋণসীমা লঙ্ঘন করে কাউকে বেশি ঋণ দেওয়া যাবে না। এ ঋণ আদায়ের সব দায়দায়িত্ব ব্যাংকের। যদি টাকা আদায় করতে না পারে, তা যথাযথ মানে শ্রেণীকরণ করে প্রভিশন বা নিরাপত্তা সঞ্চিতি সংরক্ষণ করতে হবে।

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে দেশের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রভাব উত্তরণে ৫ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬৭ হাজার ৭৫০ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করেন। এর মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সেবা খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য চলতি মূলধন বাবদ ৩০ হাজার কোটি টাকা ঋণসুবিধা প্রণয়ন একটি। এ ঋণের সুদ ৯ শতাংশ, এর অর্ধেক সরকার ভর্তুকি হিসেবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে দেবে।

প্রথম আলো

২৪ এপ্রিল ২০২০

হাওরে ধান কাটতে কৃষকের পাশে নানা শ্রেণি–পেশার মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদক, সুনামগঞ্জ: হাওরে এখন চলছে বোরো ধান কাটার মৌসুম। করোনাভাইরাসে স্থবির এই সময়ে একদিকে ধানকাটা শ্রমিকের সংকট, অন্যদিকে আগাম বন্যার বার্তায় কৃষকেরা তাঁদের জমির ধান গোলায় তোলা নিয়ে চিন্তিত। এ অবস্থায় ছাত্র-শিক্ষক, স্কাউটস, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, পুলিশ, সমাজকর্মী, রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী থেকে শুরু করে সাংসদ—সবাই এখন হাওরে যাচ্ছেন। ধান কাটায় উৎসাহ দিচ্ছেন কৃষকদের। জমিতে নেমে কৃষকদের ধানও কেটে দিচ্ছেন তাঁরা।

কৃষি ও কৃষকের সহযোগিতায় প্রশাসনের নানা উদ্যোগের পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের পক্ষ থেকে কৃষকের পাশে দাঁড়ানোর বিষয়টিকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। টিআইবির সুনামগঞ্জ সচেতন নাগরিক কমিটির (সনাক) সভাপতি ধূর্জটি কুমার বসু বলেন, 'গত কয়েক দিন থেকেই বিষয়টি লক্ষ করছি। হাওরে নানা শ্রেণি–পেশার লোকজন যাচ্ছেন। এতে নিশ্চয়ই আমাদের কৃষক ভাইয়েরা উৎসাহ পাবেন। তাঁরা কে কতটুকু ধান কাটলেন সেটার চেয়ে বড় হলো তাঁরা হাওরে গেছেন, কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এটি অত্যন্ত ভালো দিক। আমাদের নিজেদের স্বার্থেই কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে হবে। কৃষকেরা না হাসলে আমরা হাসতে পারব না।'

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, সুনামগঞ্জের হাওরে এবার বোরো ধানের আবাদ হয়েছে ২ লাখ ১৯ হাজার ৩০০ হেক্টর জমিতে। ধানের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১৪ লাখ মেট্রিক টন। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত জেলায় গড়ে ৩৩ শতাংশ ধান কাটা হয়েছে। হাওরের পুরো ধান কাটতে আরও ১৫ থেকে ২০ দিন সময় লাগবে।

সুনামগঞ্জের হাওরে এখন কৃষকের মনে ভয় একটাই, সেটা হলো আগাম বন্যা। হাওর এলাকায় থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলছে, সুনামগঞ্জের উজানে ভারতের মেঘালয়ে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে। ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত বৃষ্টি হবে। তাই যেকোনো সময় হাওরে ঢল নেমে বন্যা হতে পারে। তলিয়ে যেতে পারে বোরো ধান। এই আশঙ্কায় কৃষকেরা যে যেভাবে পারছেন, জমির ধান কাটছেন। কেউ কেউ আধাপাকা ধানও কেটে ফেলছেন।

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত হাওরের ধান কাটতে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে বেকার হয়ে পড়া শ্রমজীবী মানুষদের ধান কাটায় যুক্ত করা হচ্ছে। উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ত্রাণের বিনিময়ে ধান কাটানোর। এ অবস্থায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক–শিক্ষার্থীসহ নানা পেশার লোকজন কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরা হাওরে ধান কাটছেন। কৃষকদের সাহস জোগাচ্ছেন। ধান কাটায় অংশ নিচ্ছেন সরকারি কর্মকর্তারাও। হাওরে ধান কাটায় অংশ নিতে এবং কৃষকদের সহযোগিতা করতে কৃষক লীগের পক্ষ থেকে বিভিন্ন উপজেলায় ধান কাটা হচ্ছে। এ জন্য কেন্দ্রীয় কৃষক লীগের পক্ষ থেকে সিলেটে বিভাগের জন্য গঠিত কমিটির আহ্বায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সংগঠনের সাবেক কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক শামীমা শাহরিয়ারকে। তিনি সুনামগঞ্জ ও সিলেট জেলার সংরক্ষিত নারী আসনের সাংসদ এবং সুনামগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য।

সাংসদ শামীমা শাহরিয়ার বলেন, গত মঙ্গলবার থেকে তাঁরা সুনামগঞ্জের বিভিন্ন উপজেলায় হাওরে কৃষকদের ধান কেটে দিচ্ছেন। তিনি নিজে জামালগঞ্জ, সদর ও তাহিরপুর উপজেলায় উপস্থিত থেকে নেতা-কর্মীদের এ কাজে উৎসাহ দিয়েছেন। প্রতিটি উপজেলায় ধান কাটার জন্য কমিটি করা হয়েছে। একটি হট লাইন চালু করা হয়েছে সংগঠনের পক্ষ থেকে। এই নম্বরে যোগাযোগ করলে তাঁরা ধান কেটে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। হাওরের পুরো ফসল তোলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা মাঠে থাকবেন।

জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক খায়রুল হুদা বলেন, তাঁরাও গত মঙ্গলবার প্রথমে সদর উপজেলার দেখার হাওরে কৃষকের ধান কেটে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। এখন বিভিন্ন উপজেলায় প্রতিদিনই নেতা-কর্মীরা ধান কাটায় অংশ নিচ্ছেন। এ ছাড়া দল বেঁধে বিভিন্ন উপজেলায় হাওরে

ধান কাটায় অংশ নিচ্ছেন জেলা ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। তাঁরা প্রতিদিনই কোনো না কোনো হাওরে ধান কাটছেন। ধান কাটায় অংশ নিয়েছেন জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা-কর্মীরাও।

জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি দীপঙ্কর কান্তি দে ও সাধারণ সম্পাদক আশিকুর রহমান বলেন, তাঁরা সংগঠনের কেন্দ্রীয় নির্দেশনায় হাওরে ধান কাটায় নেমেছেন। জেলা প্রতিটি উপজেলায় তাদের নেতা-কর্মীরা কৃষকদের ধান কাটা সহায়তা করছেন। তাঁরা নিজেরাও মাঠে আছেন।

ছাত্রদলের নেতা–কর্মীদের জেলার তাহিরপুর ও জামালগঞ্জ উপজেলার হাওরে বৃহস্পতিবার ধান কাটতে দেখা গেছে। জেলা ছাত্র ইউনিয়নের নেতা-কর্মীরা কয়েক দিন থেকে তাহিরপুর উপজেলায় কৃষকদের ধান কাটায় সহযোগিতা করছেন।

এ ছাড়া মাঠে ঘুরেছেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম. এনামুল কবিরও। তিনি বলেন, হাওরে এই সময়টায় এমনিতেই কৃষক পরিবারের সবাই মাঠে থাকেন। ধান কাটা, মাড়াই ও শুকানোর কাজ করেন। এবার পরিস্থিতি ভিন্ন, রয়েছে বন্যার আশঙ্কা। তাই সবাইকে মাঠে নামতে হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী হাওরে কৃষকদের ধান কাটার বিষয়ে খোঁজখবর রাখছেন।

সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আবদুল আহাদ বলেন, 'আমরা সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছি কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। সুনামগঞ্জের মানুষ সেটাই করছেন। সবাই মিলে চেষ্টা করলে অবশ্যই দ্রুত ধান কাটা সম্ভব হবে। আর ধান গোলায় তুলতে পারলেই হাওরে কৃষকের মুখে হাসি ফুটবে।'

দৈনিক ইত্তেফাক
২৫ এপ্রিল, ২০২০

ওমান থেকে দেশে ফিরলেন ২৮৮ বাংলাদেশি শ্রমিক

ইত্তেফাক রিপোর্ট: **নতুন করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট সংকটের মধ্যেই ওমান থেকে দেশে ফিরলেন ২৮৮ প্রবাসী বাংলাদেশি শ্রমিক।**

শুক্রবার সন্ধ্যায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান তারা। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে পৌঁছানোর পর বিমানবন্দরে তাদের মেডিক্যাল চেকআপ হয়। যাদের সঙ্গে কোভিড-১৯ নেগেটিভ সার্টিফিকেট আছে তাদের বাসায় পাঠানো হবে। আর যাদের নেই তাদের সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের (এএফডি) ব্যবস্থাপনায় ১৪ দিনের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে পাঠানে হয়।

মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা বাংলাদেশি শ্রমিকদের এটি দ্বিতীয় ফ্লাইট। এর আগে সৌদি আরব থেকে ১৫ এপ্রিল ৩৬৬ বাংলাদেশি ফিরে আসেন।

সমকাল

২৫ এপ্রিল, ২০২০

৩০ হাজার পদ খালি স্বাস্থ্য বিভাগে
করোনা মোকাবিলায় শুধু চিকিৎসক নার্স নয় স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগও জরুরি

রাজবংশী রায়: করোনা পরিস্থিতি নিয়ে গত বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত বুলেটিনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক নতুন করে দুই হাজার চিকিৎসক ও ছয় হাজার নার্স নিয়োগের কথা বলেন। করোনা চিকিৎসা দিতে গিয়ে চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা তুলে ধরে তিনি বলেন, নতুন নতুন হাসপাতাল প্রস্তুত করা হচ্ছে। এ ছাড়া কিছু চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত হয়েছেন, অনেককে কোয়ারেন্টাইনে যেতে হয়েছে। এ কারণে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় আরও দুই হাজার চিকিৎসক ও ছয় হাজার নার্স নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে।

এদিকে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এ ঘোষণায় চিকিৎসক ও নার্সদের মধ্যে আশার আলো সঞ্চারিত হলেও বেকার অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর মধ্যে হতাশা ভর করেছে। অথচ স্বাস্থ্য খাতে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট, ফার্মাসিস্ট, ওয়ার্ডবয়, নিরাপত্তাকর্মী, ড্রাইভার, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, আয়াসহ তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির ৩০ হাজার পদ শূন্য পড়ে আছে। আইনি জটিলতার কারণে বছরের পর বছর ধরে এসব পদে নিয়োগ দেওয়া যাচ্ছিল না। বছর দেড়েক আগে সেই বাধা দূর হলেও এখন পর্যন্ত তাদের নিয়োগ দেওয়া যায়নি।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির জনবল নিয়োগে একটি বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। সাড়ে সাত লাখের মতো আবেদন জমা পড়ে। কিন্তু নিয়োগ প্রক্রিয়া আর অগ্রসর হয়নি। মহামারি পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকার চাইলে দ্রুত এসব পদে নিয়োগ দেওয়া সম্ভব বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। তাদের অভিমত, চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা শুধু চিকিৎসক ও নার্স-নির্ভর নয়। এর সঙ্গে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট, ফার্মাসিস্ট, ওয়ার্ডবয়, নিরাপত্তাকর্মী, ড্রাইভার, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, আয়াসহ তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীরারও যুক্ত। মেডিকেল টেকনোলজিস্টের কাজ যেমন চিকিৎসক কিংবা নার্স করতে পারবেন না- একইভাবে পরিচ্ছন্নতাকর্মী ও ড্রাইভারের কাজও অন্যরা করতে পারবেন না। সুতরাং প্রত্যেকটি কাজের জন্য পৃথকভাবে জনবল নিয়োগের প্রয়োজন। এতে করে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি হাজার হাজার বেকার যুবকের ভাগ্য বিড়ম্বনারও অবসান হবে। গতকাল শুক্রবার পর্যন্ত সারাদেশে ২২১ চিকিৎসক, ৮৮ নার্স, টেকনোলজিস্টসহ ১৯১ স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত হয়েছেন বলে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ) নিশ্চিত করেছে। অর্থাৎ চিকিৎসক ও নার্সের বাইরে প্রায় সমসংখ্যক স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত হয়েছেন। একই সঙ্গে সংগঠনটি বলছে, আরও দেড় হাজারের বেশি চিকিৎসক-নার্সসহ স্বাস্থ্যকর্মী কোয়ারেন্টাইনে চলে গেছেন। এ অবস্থায় মহামারি মোকাবিলায় চিকিৎসক-নার্সের পাশাপাশি অন্যান্য জনবলেরও আনুপাতিকহারে নিয়োগ চান চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা। অন্যথায়

করোনা পরিস্থিতিতে কাঙ্ক্ষিত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। বিএমএর মহাসচিব ডা. ইহতেশামুল হক চৌধুরী সমকালকে বলেন, স্বাস্থ্যসেবায় চিকিৎসক, নার্সের পাশাপাশি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির জনবলও অত্যন্ত প্রয়োজন। করোনা শনাক্তকরণে ব্যাপকহারে নমুনা পরীক্ষার কথা বলা হচ্ছে। এই কাজটির জন্য প্রথমেই মেডিকেল টেকনোলজিস্ট প্রয়োজন। অথচ বছরের পর বছর ধরে তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে আছে। একইভাবে হাসপাতাল পরিচ্ছন্ন রাখতে পর্যাপ্ত পরিচ্ছন্নতাকর্মী ও আয়ার প্রয়োজন। এমএলএসএস, ড্রাইভার, নিরাপত্তাকর্মী থেকে প্রত্যেকটি জনবলই গুরুত্বপূর্ণ।

ডা. ইহতেশামুল হক চৌধুরী আরও বলেন, অ্যাডহক ভিত্তিতে চিকিৎসক নিয়োগের কথা শোনা যাচ্ছে। এটি অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এ ছাড়া অনৈতিক বাণিজ্যের সুযোগও সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং ৩৯তম বিশেষ বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রায় সাড়ে আট হাজার চিকিৎসকের মধ্য থেকেই মেধাক্রম অনুযায়ী নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। কারণ, তারা এরই মধ্যে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আছেন। তাদের নিয়োগ দেওয়া হলে দ্রুততম সময়ে কাজটি করা সম্ভব হবে।

৩৯তম বিসিএস উত্তীর্ণ চিকিৎসক রাফা বিনতে নূর সমকালকে বলেন, নতুন করে দুই হাজার চিকিৎসক নিয়োগের ঘোষণায় ৩৯তম বিসিএস উত্তীর্ণ চিকিৎসকদের মধ্যে আশার আলো সঞ্চার হয়েছে। মহামারির এই সময়ে সেখান থেকে মেধাক্রম অনুযায়ী চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়া হলে তারা কাজ করবেন।

বাংলাদেশ মেডিকেল টেকনোলজিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক মহাসচিব সেলিম মোল্লা সমকালকে বলেন, করোনা মোকাবিলায় মেডিকেল টেকনোলজিস্টরা সম্মুখসারির যোদ্ধা। তারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজটি করেন। তাদের এই কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করেই রোগী শনাক্ত হয়। এরপর চিকিৎসা শুরু হয়। তখন চিকিৎসক, নার্সসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর প্রয়োজন দেখা দেয়। করোনা মোকাবিলায় দুই হাজার চিকিৎসক এবং ছয় হাজার নার্স নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এটি অত্যন্ত ইতিবাচক। দুঃখজনক হলো, করোনাযুদ্ধের প্রথম সারির সৈনিক মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের নিয়োগের বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছে। আমাদের দাবি, পরিস্থিতি মোকাবিলায় ১৫ হাজার বেকার টেকনোলজিস্টকে অবিলম্বে নিয়োগ দেওয়া হোক। অন্যথায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে মারাত্মক জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপ-উপাচার্য ও বিএমএর সাবেক সভাপতি অধ্যাপক ডা. রশিদ-ই মাহবুব সমকালকে বলেন, আর কত সমালোচনা করব। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত কর্তাব্যক্তিরা একেক সময় একেক কথা বলেন, একেক ধরনের সিদ্ধান্ত নেন। দুই হাজার চিকিৎসক ও ছয় হাজার নার্স নিয়োগের সিদ্ধান্তের কথা মন্ত্রী জানালেন। স্বাস্থ্যসেবা কি শুধু চিকিৎসক, নার্স দিয়েই হবে? এর সঙ্গে অন্যান্য যেসব কর্মীর প্রয়োজন, তার কী হবে? চিকিৎসক-নার্সরা কি বাড়ি বাড়ি ঘুরে নমুনা সংগ্রহ করবেন, হাসপাতাল পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করবেন, ট্রলি বহন করবেন? তাহলে কেবল চিকিৎসক আর নার্স নিয়োগের কথা কেন বলা হচ্ছে। চিকিৎসক-নার্সের পাশাপাশি অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীও তো আক্রান্ত হচ্ছেন। তাদের সংখ্যাও কমে যাচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবা একটি সম্মিলিত প্রক্রিয়া। সুতরাং তাদের নিয়োগের বিষয়টিও ভাবতে হবে।

স্বাস্থ্য বিভাগে ৩০ হাজার পদ খালি :স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগে ২০ হাজার ৩৮৩টি এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে আট হাজার ৫৯টি নন-মেডিকেল তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীর পদ শূন্য রয়েছে। এর মধ্যে বরিশাল বিভাগের ৪০টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঁচ হাজার ৭০৩টি পদের বিপরীতে কাজ করছেন চার হাজার ২৭ জন। এই বিভাগে এক হাজার ৬৭৬টি পদ শূন্য রয়েছে। চট্টগ্রাম বিভাগের ৯৫টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চার হাজার ১৯০টি পদ খালি। ঢাকা বিভাগের ৯১টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ২০ হাজার ৯৮৭ পদের বিপরীতে কাজ করছেন ১৬ হাজার ৮২৫ জন। খুলনা বিভাগের ৬০ প্রতিষ্ঠানে দুই হাজার ৮৫৫টি, ময়মনসিংহে ৩৪ প্রতিষ্ঠানে এক হাজার ৪১০টি, রাজশাহীর ৬৫ প্রতিষ্ঠানে দুই হাজার ৫০৭টি, রংপুরে দুই হাজার ১৪৮টি এবং সিলেটে এক হাজার ৪৩৫টি পদ খালি রয়েছে। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতায় মেডিকেল কলেজ ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন দপ্তরে আরও আট হাজার ৫৯টি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীর পদ খালি পড়ে আছে।

যে কারণে আটকে ছিল নিয়োগ :স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, 'স্বাস্থ্য বিভাগীয় নন-মেডিকেল কর্মকর্তা এবং কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৮৫'-এর আওতায় নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হতো। সুপ্রিম কোর্টের এক রায়ে সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) আইন, ১৯৭৯ এবং সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ বাতিল হয়ে যায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল এবং ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ থেকে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত জারিকৃত নিয়োগ বিধিমালা বা অন্যান্য বিধিমালা অকার্যকর হয়ে পড়ে। ২০১৩ সালে ১৬৬টি অধ্যাদেশকে সংরক্ষণপূর্বক ওই সময়কালে জারিকৃত বিধিমালাগুলোকে নিয়ে দুটি আইন প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু ওই ১৬৬টি অধ্যাদেশের মধ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বর্ণিত নিয়োগ বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এ কারণে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় নন-মেডিকেল কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতি কার্যক্রম স্থগিত হয়ে যায়।

তবুও থমকে আছে নিয়োগ :স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ২০১৮ সালে ওই বিধিমালা সংশোধনের স্বাস্থ্য খাতে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির জনবল নিয়োগের বাধা কেটে যায়। পরের বছর নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করে মন্ত্রণালয়। এ জন্য বিভাগ ও জেলা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আবেদন আহ্বান করা হয়। সাড়ে সাত লাখের মতো আবেদন জমা পড়ে। ওই আবেদন যাচাই-বাছাইয়ের কাজ চলছিল। এরই মধ্যে করোনা পরিস্থিতির কারণে সবকিছু থমকে গেছে।

এ বিষয়ে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) হাবিবুর রহমান খান সমকালকে বলেন, করোনা পরিস্থিতির কারণে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির জনবল নিয়োগের কার্যক্রম স্থগিত হয়ে যায়। কারণ সাড়ে সাত লাখ আবেদনকারীর মধ্য থেকে আগে বাছাই করে পরীক্ষার আয়োজন করতে হবে। কিন্তু যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকায় পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হবে না। এ কারণে নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত রাখতে হয়েছে। তবে বিকল্প কী করা যায়, তা নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে। টেকনোলজিস্টদের মধ্যে যারা প্রেষণে কিংবা বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি আছেন, তাদের করোনা মোকাবিলার কার্যক্রমে যুক্ত করা যায় কিনা, সেটা ভাবা হচ্ছে।

চিকিৎসক নিয়োগের বিষয়ে হাবিবুর রহমান খান বলেন, ৩৯তম বিশেষ বিসিএস উত্তীর্ণ আট হাজারের ওপর চিকিৎসক রয়েছেন। সেখান থেকে মেধাক্রম অনুযায়ী নিয়োগ দেওয়া যায় কিনা,

তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা হচ্ছে। আবার অ্যাডহক ভিত্তিতে নিয়োগের বিষয়েও আলোচনা হচ্ছে। যে প্রক্রিয়াটি অধিকতর ভালো বিবেচিত হবে, সেটিই করা হবে।

বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

এপ্রিল ২৫, ২০২০

নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলোর রেমিট্যান্স কমবে ২০%

নিজস্ব প্রতিবেদক: নভেল করোনাভাইরাসের ব্যাপক বিস্তারের কারণে বড় ধরনের বিপর্যয়ে বৈশ্বিক অর্থনীতি। দেশে দেশে লকডাউনের কারণে বহু মানুষের উপার্জন বন্ধ হয়ে গেছে। অর্থনীতি সংকটে পড়ায় চাকরি ও ব্যবসা নিয়ে অনিশ্চয়তায় জনসাধারণ। একই দশায় দিনাতিপাত করছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত অভিবাসী শ্রমিকরাও। ফলে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোর জন্য রেমিট্যান্স আয়ের পথ সংকুচিত হয়ে আসছে। এ পরিস্থিতিতে বিশ্বব্যাংক আশঙ্কা করছে, চলতি বছর শেষে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোর রেমিট্যান্স আয় কমতে যাচ্ছে ২০ শতাংশ। 'কভিড-১৯ ক্রাইসিস: থ্রু এ মাইগ্রেশন লেন্স' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে এ আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বিদেশ থেকে মধ্যম ও নিম্ন আয়ের দেশগুলোয় শ্রমিকদের রেমিট্যান্স পাঠানোর পরিমাণ চলতি বছর ৪৪৫ বিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণে এসে ঠেকতে পারে। ২০১৯ সালে এর পরিমাণ ৫৫৪ বিলিয়ন ডলার। সে হিসাবে এসব দেশের রেমিট্যান্স আয় কমতে যাচ্ছে ২০ শতাংশ।

এ চিত্রের প্রতিফলন দেখা যাবে দক্ষিণ এশিয়ায় তিন শীর্ষ রেমিট্যান্স আহরণকারী দেশ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের আয়ের ক্ষেত্রেও। বিশ্বব্যাংক বলছে ২০২০ সালে ভারত ও পাকিস্তানের রেমিট্যান্স প্রবাহ ২৩ শতাংশ কমবে। অন্যদিকে বাংলাদেশে চলতি বছর রেমিট্যান্স আসতে পারে ১৪ বিলিয়ন ডলার।

নভেল করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে বিশ্বব্যাপী চলতি বছরের শুরু থেকেই অভিবাসন ও কর্মসংস্থান ব্যাপক হারে হ্রাস পেয়েছে। নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে মজুরির ওপরও। স্বাস্থ্যবীমাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ছেন অভিবাসী শ্রমিকরা। করোনার কারণে ভ্রমণে নিয়ন্ত্রণ আরোপের আগেই বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোয় বিদেশ থেকে প্রচুর শ্রমিক ফেরত এসেছেন। বিদেশের কর্মস্থলে কাজে যোগ দিতে পারছেন না তারা। আবার কোনো

কোনো ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের সরকার প্রবাসী শ্রমিকদের চলে যেতেও নির্দেশ দিয়েছে এরই মধ্যে।

নভেল করোনাভাইরাসের প্রভাবে চলতি এপ্রিলের প্রথম ১৬ দিনেই বাংলাদেশের রেমিট্যান্স ৩৮ দশমিক ৩৬ শতাংশ কমেছে। যদিও পবিত্র রমজান মাস ও ঈদুল ফিতরকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরই রেমিট্যান্স প্রবাহে বড় প্রবৃদ্ধি আসে। আর গত মার্চে রেমিট্যান্স কমেছে ১১ দশমিক ৭৭ শতাংশ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে, ২০১৯ সালের এপ্রিলে দেশে রেমিট্যান্স এসেছিল ১৪৩ কোটি ৪৩ লাখ ডলার। সে হিসাবে গড়ে ওই মাসের প্রথম ১৫ দিনে ৭১ কোটি ৭১ লাখ ডলার রেমিট্যান্স এসেছিল। চলতি এপ্রিলের প্রথম ১৬ দিনে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ৪৪ কোটি ২০ লাখ ডলার। এ হিসাবে চলতি এপ্রিলের প্রথম পক্ষেই বাংলাদেশের রেমিট্যান্স প্রবাহ ৩৮ দশমিক ৩৬ শতাংশ কমেছে।

২০১৯ সালের মার্চে দেশে রেমিট্যান্স এসেছিল ১৪৫ কোটি ৮৬ লাখ ডলার। চলতি বছরের মার্চে ১২৮ কোটি ৬৮ লাখ ডলার রেমিট্যান্স দেশে এসেছে। এ হিসাবে আগের বছরের তুলনায় ২০২০ সালের মার্চে ১৭ কোটি ১৮ লাখ ডলার রেমিট্যান্স কম এসেছে। মার্চে রেমিট্যান্স কমেছে ১১ দশমিক ৭৭ শতাংশ।

এর আগে চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আট মাসে রেমিট্যান্স বেড়েছিল আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২০ দশমিক ২০ শতাংশ। এ সময়ে দেশে রেমিট্যান্স এসেছিল ১ হাজার ২৪৯ কোটি ৮৫ লাখ ডলার। এর আগে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশে রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৯ দশমিক ৬০ শতাংশ। সে সময় দেশে মোট রেমিট্যান্স আসে ১ হাজার ৬৪১ কোটি ৯৬ লাখ ডলার। টাকার অংকে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ১ লাখ ৪১ হাজার ২০৮ কোটিতে।

বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স আসে সৌদি আরব থেকে। দেশটি থেকে গত অর্থবছরে রেমিট্যান্স এসেছিল ৩১১ কোটি ডলার। দেশে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আসে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে। তৃতীয় স্থানে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স আসে এমন শীর্ষ ২০টি দেশের তালিকায় থাকা অন্য দেশগুলো হলো কুয়েত, মালয়েশিয়া, যুক্তরাজ্য, ওমান, কাতার, ইতালি, বাহরাইন, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ আফ্রিকা, ফ্রান্স, লেবানন, জর্দান, দক্ষিণ কোরিয়া, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি ও জাপান।

নভেল করোনাভাইরাস সংক্রমণ শুরুর পর থেকেই বাংলাদেশের বৃহত্তম রেমিট্যান্স আয়ের উৎস প্রায় সব দেশেই লকডাউন চলছে। ওই সব দেশে বসবাসকারী বাংলাদেশীদের বড় অংশই বেকার হয়ে পড়েছেন। এ অবস্থায় নিজেদের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের সামর্থ্যই হারিয়েছেন প্রবাসীরা।

বাংলাদেশের রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রকৃত চিত্র পূর্বাভাসের চেয়েও খারাপ হাতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, নভেল করোনাভাইরাসের প্রভাবে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী এক কোটির বেশি বাংলাদেশীর অর্ধেকেরই এখন কোনো আয় নেই। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্থায়ী চাকরি করেন, এমন প্রবাসীর সংখ্যাও খুব বেশি নয়। ফলে বিদ্যমান দুর্যোগ শেষ হলেও বহু বাংলাদেশী কাজ পাবেন না। এ কারণে বাংলাদেশের রেমিট্যান্স প্রবাহ পূর্বাভাসের চেয়েও বেশি খারাপ হতে পারে।

ড. জাহিদ হোসেন বলেন, বাংলাদেশের শ্রমবাজারের বৃহৎ অংশ মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক। ওই সব দেশের অর্থনীতির ভিত্তিই হলো জ্বালানি তেল। বর্তমানে জ্বালানি তেলের দাম ইতিহাসের সর্বনিম্ন স্তরে। এতে সহসাই মধ্যপ্রাচ্যের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াবে এমন সম্ভাবনাও নেই। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে প্রবাসীদের নিজ নিজ দেশে টিকে থাকাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অন্যথায় বেকার প্রবাসীরা বাংলাদেশে ফিরে আসা শুরু হলে পরিস্থিতি ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছবে।

রেমিট্যান্স কমে যাওয়ার প্রভাব ভয়াবহ হতে পারে উল্লেখ করে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান বণিক বার্তাকে বলেন, এমন একটি অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্য সংকটের মধ্যে রেমিট্যান্সের ওপর নির্ভরশীল পরিবারগুলোর আয় উল্লেখযোগ্য হারে কমবে। এতে তাদের অন্যান্য যেসব দুর্দশা রয়েছে সেগুলো আরো জটিল হয়ে উঠবে। এরই মধ্যে রেমিট্যান্স কমে যাওয়ার প্রবণতা এটাই নির্দেশ করছে, যারা বিদেশে আছেন, তারাও কম আয় করছেন। হয়তো আয়ই নেই অনেকের। তাদের সঞ্চয়ও অনেক কম। আমাদের সামষ্টিক অর্থনীতির দিক থেকেও বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের রিজার্ভ, আমাদের আমদানি সক্ষমতা, আমাদের বিনিময় হার—এগুলোর ক্ষেত্রে রেমিট্যান্স একটা বড় ভূমিকা রাখে। সেখানেও একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

তিনি আরো বলেন, আমাদের শ্রমবাজার যে একটা স্বস্তি দিত, বছরে একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ দেশের বাইরে যেত, তার ওপরও একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে বোঝা যাচ্ছে। সবটা মিলিয়ে আমাদের অর্থনীতির ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক—দুই দিক থেকেই দুঃসংবাদই বলব আমি। এ পরিস্থিতি থেকে উঠে আসাটা কভিডের ওপর আংশিকভাবেই নির্ভর করবে। কারণ কভিড যে একটা ফুটপ্রিন্ট রেখে যাচ্ছে, সবাই যে বৈশ্বিক মন্দার আশঙ্কা করছে, সবটা মিলিয়ে আগের জায়গায় ফিরে যাওয়াটাও কঠিন হবে।

প্রথম আলো

২৬ এপ্রিল ২০২০

ওমান থেকে ফেরা ২৯১ শ্রমিককে নিয়ে চিন্তা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা: করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের মধ্যে গত দু সপ্তাহে (১৩-২৬ এপ্রিল) ১৪টি ফ্লাইটে দেশে ফিরেছেন প্রায় দুই হাজার বাংলাদেশি। এঁদের মধ্যে ওমান থেকে ২৯১ জন শ্রমিক ২৪ এপ্রিল রাতে ঢাকায় আসেন। এঁদের সবাই সেখানে কারাবন্দী ছিলেন। ওমান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কোয়ারেন্টিনে থাকার একটি মাত্র সনদের ভিত্তিতে ঢাকায় আসার পর এঁদের হোম কোয়ারেন্টিনে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে অসন্তুষ্ট বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)। তাদের মতে, এঁদের সবাইকে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে পাঠানো উচিত ছিল। তাই ভবিষ্যতে বিদেশফেরত বাংলাদেশিরা স্বাস্থ্য পরীক্ষার সনদ না আনলে তাঁদের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে পাঠানো বাধ্যতামূলক বলে জানান বেবিচক চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মফিদুর রহমান।

আজ রোববার তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘ওমান থেকে ফিরে আসা শ্রমিকেরা দেশটির স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের একটি গণ সনদ নিয়ে এসেছে। এর ভিত্তিতে এসব শ্রমিককে হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে। তাদের সবারই ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরীক্ষার সনদ দিয়ে পাঠানো উচিত ছিল। এভাবে গণ সনদ আনা হলে ভবিষ্যতে সবাইকে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে পাঠানো হবে। অসন্তোষ জানিয়ে আমরা (বেবিচক) এ ব্যাপারে একটি চিঠি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে দিয়েছি।’

বেবিচক চেয়ারম্যান বলেন, ‘চলতি মাসে বিদেশফেরত আরও অনেক বাংলাদেশি মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশ থেকে ফিরবেন। এঁদের বড় একটি অংশ শ্রমিক। আমরা জানি না, তাঁরা বিদেশে কী অবস্থায় ছিলেন। তাই শ্রমিক বা অন্য যাঁরাই হোন না কেন, বিদেশফেরত বাংলাদেশিদের স্বাস্থ্য সনদ আনতে হবে। না হলে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে তাঁদের থাকতে হবে। বিদেশি পাসপোর্টধারীদের স্বাস্থ্য সনদ না থাকলে বিমানবন্দর থেকে সরাসরি ফেরত পাঠানো হবে।’

২৪ এপ্রিল ওমান ফেরত বাংলাদেশিরা সবাই দেশটিতে কারাবন্দী ছিলেন বলে জানান বিমানবন্দরের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ শাহারিয়ার সাজ্জাদ। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘২৯১ জনের সবাই ভিসার মেয়াদ শেষ বা অবৈধভাবে থাকার কারণে ওমানের বিভিন্ন কারাগারে বন্দী ছিলেন। এমন অনেকে ছিলেন, যাঁরা সাত থেকে আট বছর কারাগারে ছিলেন। তবে ওমান স্বাস্থ্য অধিদপ্তর একটি চিঠিতে আমাদের জানিয়েছে, তাঁরা ১৪ দিন ওমানে কোয়ারেন্টিনে ছিলেন। কোয়ারেন্টিনে মেয়াদ শেষে এসব বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠানো হয়েছে। তাই তাঁদের দেশে আসার পর হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য আইইডিসিআরের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনের কাছে পাঠানো হয়েছে।’

বেবিচক ও বিমানবন্দর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, চলতি এপ্রিল মাসের ১ থেকে ২৬ এপ্রিল বিকেল পর্যন্ত বিভিন্ন দেশ থেকে ২২৯০ জন বাংলাদেশি ঢাকায় এসেছেন। এঁদের মধ্যে ১৫টি বিশেষ ফ্লাইটে ২১১২ জন বাংলাদেশি রয়েছেন। এঁদের অর্ধেকের বেশি শ্রমিক। বিশেষ ফ্লাইটে আসা ১৯৭৪ যাত্রীর মধ্যে ৪২৬ জনকে আশকোনা হজ ক্যাম্প ও ব্র্যাক ট্রেনিং সেন্টারে

প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে। তবে তাঁদের কারও শরীরে আজ পর্যন্ত করোনাভাইরাসের উপসর্গ দেখা যায়নি।

কালের কণ্ঠ

২৬ এপ্রিল, ২০২০

রানা প্লাজার ৫৭ শতাংশ শ্রমিক এখনো কর্মহীন

নিজস্ব প্রতিবেদক : রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ৫৭ শতাংশ এখনো কর্মহীন বলে জানিয়েছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ। গতকাল শনিবার 'সপ্তম বর্ষে রানা প্লাজা দুর্ঘটনা এবং কভিড-১৯' শীর্ষক একটি অনলাইন ডায়ালগে এ তথ্য উঠে আসে। ভয়াবহ রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির সাত বছর উপলক্ষে এক অনলাইন সংলাপের আয়োজন করে অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ। রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ২০০ জন পোশাক শ্রমিকের ওপর মোবাইল ফোন কলের মাধ্যমে পরিচালিত জরিপের তথ্য সংলাপের উপস্থাপন করা হয়।

জরিপে দেখা যায়, যেসব ভুক্তভোগী কর্মরত রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ১২ শতাংশই পোশাক কারখানায় কর্মরত। অন্যান্য বছরের জরিপের মতো এ বছরও দেখা যাচ্ছে যে রানা প্লাজা ঘটনার ভুক্তভোগীদের অধিকাংশই পোশাকশিল্পের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন এবং সেখান থেকেই তাঁদের জীবিকা নির্বাহ করছেন।

এ বছরের জরিপে পাওয়া যায়, গত কয়েক বছরের তুলনায় ১৪ শতাংশ পোশাক শ্রমিকের স্বাস্থ্যে অবনতি হচ্ছে। তাঁরা মূলত তীব্র মাথা ব্যথা, হাত-পায়ের ব্যথা ও অসাড়তা এবং মেরুদণ্ডের ব্যথাকে মূল সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অন্যদিকে ৫৮.৫ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন যে তাঁরা মোটামুটি সুস্থ আছেন এবং ২৭.৫ শতাংশ নিশ্চিত করেছেন যে তাঁরা পুরোপুরি সুস্থ আছেন।

বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

এপ্রিল ২৬, ২০২০

করোনায় রেমিট্যান্সপ্রবাহ কমার পূর্বাভাস

প্রবাসীদের চাকরি সুরক্ষায় কূটনৈতিক যোগাযোগ বাড়াতে হবে

সম্পাদকীয়

নভেল করোনাভাইরাসের প্রভাব দেশের অর্থনীতিতে এরই মধ্যে পড়তে শুরু করেছে। এ অবস্থায় সবচেয়ে বেশি নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে দেশের প্রধান রফতানি আয়ের খাত তৈরি পোশাক শিল্পে। বৈদেশিক বাণিজ্যে অচলাবস্থা সৃষ্টি হওয়ায় বিদেশ থেকে এ শিল্পের কাঁচামাল

আমদানি করা সম্ভব হচ্ছে না। সাধারণ ছুটির কারণে অধিকাংশ কারখানা বন্ধ। ফলে উৎপাদনে বড় ধরনের ধস নেমেছে। করোনার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকছে না আমাদের দেশের বৈদেশিক শ্রমবাজারও। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রফতানি আয়ের পাশাপাশি রেমিট্যান্সপ্রবাহে শুরু হয়েছে বড় ধরনের ছন্দপতন। বিষয়টি এখন রীতিমতো উদ্বেগজনক পর্যায়েই পৌঁছেছে। সাম্প্রতিক সময়ে দেশের অর্থনীতিতে একমাত্র রেমিট্যান্স সূচকই ছিল ঊর্ধ্বমুখী। প্রতি মাসেই গড়ে ১৫ শতাংশের ওপরে প্রবৃদ্ধি ছিল রেমিট্যান্সপ্রবাহে। কিন্তু করোনার প্রভাবে প্রবাসীরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ায় কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে রেমিট্যান্সপ্রবাহ। আগামী দিনে তা আরো ভয়াবহ রূপ নেবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। অনেক প্রবাসী দেশে ফিরে এসেছেন। যারা আছেন, তারাও কাজ করতে পারছেন না। দেশে পরিবার-পরিজনের কাছে অর্থ পাঠাচ্ছেন না। যত দিন যাচ্ছে, পরিস্থিতি ততই খারাপ হচ্ছে। এ অবস্থায় আগামী দিনগুলোয় রেমিট্যান্স আরো কমবে, এটি নিশ্চিত করে বলা যায়। বিশ্বব্যাংক পরিচালিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে আশঙ্কা করা হয়েছে, করোনার প্রভাবে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোর রেমিট্যান্স কমবে ২০ শতাংশ। বাংলাদেশও এ তালিকায় রয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের একমাত্র সচল রাস্তা ছিল রেমিট্যান্সপ্রবাহ। এমনিতেই আমাদের দেশের রফতানি আয় দীর্ঘদিন ধরে খারাপ অবস্থানে রয়েছে। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য ঘাটতি বাড়ছে। এর মধ্যে রেমিট্যান্সই ছিল একমাত্র ও শক্তিশালী অবলম্বন। কিন্তু করোনাসৃষ্ট পরিস্থিতিতে এখন রেমিট্যান্সপ্রবাহে বড় ধরনের অবনমন ঘটতে শুরু করেছে। ফলে চলতি হিসাবের ভারসাম্যসহ সামগ্রিক লেনদেনের ভারসাম্য ঋণাত্মক হয়ে পড়বে বলে আশঙ্কা জোরালো হচ্ছে। রেমিট্যান্সপ্রবাহ কমলে রিজার্ভের ওপরও চাপ বাড়বে। এ অবস্থায় বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের বিষয়ে সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়া সময়ের সবচেয়ে বড় দাবি।

দেশ থেকে যারা বিদেশে কাজের জন্য গেছেন, তাদের বেশির ভাগই নিম্নবিত্ত পরিবারের। তাদের রেমিট্যান্সের টাকায় ওই পরিবারগুলো চলে, যা আমাদের দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করছে। এখন যদি রেমিট্যান্স কমে তাহলে নিম্নবিত্তরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। পাশাপাশি দারিদ্র্যের হার বেড়ে যাবে। কেননা রেমিট্যান্স আমাদের সার্বিক অর্থনীতির চাহিদা পূরণে অন্যতম ভূমিকা পালন করে। তাই রেমিট্যান্স যখন কমে আসবে তখন দেশের সার্বিক প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হবে। রেমিট্যান্সপ্রবাহের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ আসে মধ্যপ্রাচ্য থেকে। ১১ দশমিক ৬৫ শতাংশ আসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। ইউরোপীয় দেশগুলো থেকে আসে ১২ দশমিক ৩৫ শতাংশ। দেশের প্রায় এক কোটি মানুষ বিদেশে অবস্থান করছে। এদের বড় একটি অংশ মধ্যপ্রাচ্যে থাকে। ইতালিতে বৈধ ও অবৈধভাবে থাকে প্রায় আড়াই লাখ। কিন্তু করোনায় কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে বেশির ভাগ মানুষ।

আশঙ্কা করা হচ্ছে করোনা-পরবর্তী কর্মসংস্থান হ্রাস পাবে এবং বেকারত্ব বাড়বে। প্রথমেই আঘাত আসবে প্রবাসী শ্রমিকদের ওপর। বাংলাদেশের প্রবাসীরা যেসব দেশে কাজ করেন, তার

প্রায় প্রতিটি দেশেই করোনার প্রভাবে অর্থনীতি সংকুচিত হয়েছে; যার প্রভাব দেশের জনশক্তি রফতানি বাজারে পড়বে বৈকি। এছাড়া বিদেশে অবস্থান করা অনেকের আয় কমবে, চাকরি হারানোর আশঙ্কাও রয়েছে। অনেককে দেশে ফেরত পাঠানোর তোড়জোড় চলবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে সক্রিয় হতে হবে প্রবাসীদের চাকরি ও কর্মসংস্থান রক্ষায়। চাকরি হারানোদের সংশ্লিষ্ট দেশে পুনর্বাসন বা নতুন চাকরি পেতে সহায়তা জোগানোর পাশাপাশি তাদের মৌলিক চাহিদার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। চলতি অর্থবছরের বাজেটে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠানোকে উৎসাহিত করতে ২ শতাংশ নগদ প্রণোদনার ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। এতে আনুষ্ঠানিক খাতে রেমিট্যান্সপ্রবাহ বেড়েও উঠছিল। কিন্তু করোনার কারণে তাতে ভাটা পড়েছে। আগামী অর্থবছরেও এটি অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। রেমিট্যান্সপ্রবাহ গ্রামীণ অর্থনীতিকেও চাঙ্গা রেখেছিল। এটি কমে এলে সেখানে কী ধরনের প্রভাব পড়বে এবং তা প্রতিরোধে করণীয় এখনই নির্ধারণ করতে হবে।

বর্তমানে বিশ্ব অর্থনীতির যে অবস্থা দাঁড়াচ্ছে, তাতে আগামী ছয় মাস বা এক বছরে এর উল্লেখযোগ্য উন্নতি হবে বলে মনে হচ্ছে না। এ পরিপ্রেক্ষিতে মহামারীতে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর সঙ্গে আমাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক বাড়াতে হবে। যাতে বেকার শ্রমিকরা দ্রুত কাজ পান। যেসব জটিলতা রয়েছে, তা সমাধান করতে সহায়তা করতে হবে। মধ্যপ্রাচ্যসহ অন্যান্য দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদারের মাধ্যমে দেশের জনশক্তি বাজার এবং সেখানে কর্মরত প্রবাসীদের চাকরি সুরক্ষায় ভারতসহ অন্যান্য দেশ যে তত্পরতা চালাচ্ছে, বাংলাদেশকেও তা অনুসরণ করতে হবে। দ্রুতই একটি অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি এবং তা বাস্তবায়ন করা আবশ্যক।

প্রথম আলো

২৭ এপ্রিল ২০২০

তৈরি পোশাকের বাজার হারালে ফেরত পাওয়া যাবে না

আহসান এইচ মনসুরআহসান এইচ মনসুর। পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশের (পিআরআইবি) নির্বাহী পরিচালক ও ব্র্যাক ব্যাংকের চেয়ারম্যান। লকডাউনের কারণে দেশের অর্থনীতি ও জনজীবন প্রায় স্থবির হয়ে পড়েছে। উত্তরণের উপায় নিয়ে প্রথম আলোর সঙ্গে কথা বলেছেন এই অর্থনীতিবিদ। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **সোহরাব হাসান**

প্রথম আলো: করোনার প্রাদুর্ভাবের মধ্যেই কিছু কিছু কারখানা খোলার

উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে তৈরি পোশাক কারখানা। বিষয়টি কীভাবে দেখছেন?

আহসান এইচ মনসুর: বেশির ভাগ দেশ শিল্পকারখানা খুলে দিচ্ছে। আমাদেরও খুলতে হবে। তবে দেখতে হবে আমরা কোন অবস্থায় আছি। এ কথা ঠিক যে করোনা পরিস্থিতি আমরা ঠিকভাবে সামাল দিতে পারিনি। আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা বাড়ছে। আবার তৈরি পোশাক খাতে আমাদের প্রতিযোগী চীন ও ভিয়েতনাম শিল্পকারখানা খুলে দিয়েছে। এ সময় আমরা বিদেশি ক্রেতাদের কাছ থেকে যে অর্ডার বা কার্যাদেশ পাব, সেটি কমই হবে। আগামী দু–তিন মাস ২০ শতাংশ হতে পারে। একটি হিসাবে এপ্রিলে ১৬ শতাংশ কার্যাদেশ এসেছে। মে মাসে ২০ শতাংশ। কিন্তু এসব কোনোভাবে হাতছাড়া করা যাবে না। কেননা একবার ছেড়ে দিলে ফেরত পাওয়া যাবে না। আমাদের অর্থ ও শ্রমিকদের কর্মসংস্থান দুটোরই প্রয়োজন আছে।

প্রথম আলো: তাহলে আপনি বলছেন, বিদেশি বাজার ধরে রাখতে কারখানা এখনই খুলে দেওয়া উচিত?

আহসান এইচ মনসুর: এই কার্যাদেশের ভিত্তিতে কারখানা খুলে দেওয়া যেতে পারে। এ জন্য সব শ্রমিককে এখনই কাজে লাগানোর প্রয়োজন নেই। যাঁরা আশপাশে আছেন, তঁাদের দিয়েই কারখানা চালু করতে হবে। যঁারা দূরে আছেন, তাঁদের আনার দরকার নেই। তবে এ ক্ষেত্রে সরকারের স্বাস্থ্যবিধি পুরোপুরি মেনে চলতে হবে। বিজিএমইএর একটি নীতিমালা করেছে, যাতে মোটামুটি সবকিছু আছে। এখন এই স্বাস্থ্যবিধি দৃঢ়ভাবে প্রতিপালন করতে হবে। অনেক দেশে সেটি করেছেও। শ্রমিকেরা কারখানায় একদিক দিয়ে ঢুকবেন, অন্যদিক দিয়ে বের হবেন। তঁাদের বসার ব্যবস্থাও করতে হবে দূরত্ব রেখে। যেহেতু সব শ্রমিককে কাজ লাগানো হচ্ছে না, সেহেতু দূরত্ব বজায় রেখে তাঁদের বসানোর কাজটি কঠিন হবে না। আমি মনে করি, কারখানা খোলার জন্য অন্তত এক সপ্তাহের প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল। প্রস্তুতি নিয়ে কারখানা চালু করলে ঝুঁকি থেকেই যাবে।

প্রথম আলো: স্বাস্থ্যবিধি মানা হচ্ছে কি না, সেটি কে তদারক করবে। সরকার না বিজিএমইএ?

আহসান এইচ মনসুর: সরকারের শিল্প ও শ্রম মন্ত্রণালয় আছে। তারা আইনি বিষয়টি দেখবে। বিজিএমইএ দেখবে সদস্য কারখানাগুলো তাদের নির্দেশিত নীতিমালা মানছে কি না। আবার করোনাভাইরাসের ঝুঁকিটা এত গুরুতর যে কারখানার মালিকদেরও সর্বোচ্চ সজাগ থাকতে হবে। কোনো কারখানায় সংক্রমণ দেখা দিলে এর মালিক- শ্রমিক উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

প্রথম আলো: কিন্তু এখন পর্যন্ত সব কারখানা শ্রমিকদের মজুরি পরিশোধ করেনি।

আহসান এইচ মনসুর: এটি দুঃখজনক। শ্রমিকদের মজুরি না পাওয়ার সমস্যা একটি পুরোনো সমস্যা। বিজিএমইএ বলেছে, ৭০টির মতো কারখানা মার্চ মাসের মজুরি দিতে পারেনি। বাকিগুলো দিয়েছে। সমস্যা হলো যেসব কারখানা বিজিএমইএর সদস্য নয়, সেসব কারখানার দায়িত্ব তারা নিতে চায় না। বিকেএমইএর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ২০১০ সালের দিকে আমরা প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে প্রতি ১০০ টাকা রপ্তানি আয় থেকে ১০ পয়সা হারে কেটে একটি তহবিল করা হোক। শ্রমিকেরা বিপদে পড়লে তা থেকে অর্থের জোগান দেওয়া যাবে। সরকারও সেই প্রস্তাবে রাজি ছিল। কিন্তু বিজিএমইএর আপত্তির কারণে সেটি হয়নি।

প্রথম আলো: লকডাউনের কারণে অধিকাংশ তৈরি পোশাক কারখানা ইতিমধ্যে লে–অফ ঘোষণা করা হয়েছে। এতে তো শ্রমিকেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

আহসান এইচ মনসুর: এখানে নীতি ও উদ্দেশ্যের মধ্যে বিরোধ আছে। মালিকেরা যুক্তি দেখাচ্ছেন, কারখানায় উৎপাদন বন্ধ আছে। এ অবস্থায় লে-অফ ঘোষণা না করে উপায় নেই। তাঁরা আইনসিদ্ধভাবেই এটি করেছেন। আবার শ্রমিকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, এটিও একটি সমস্যা। এই মুহূর্তে বড় জরুরি হলো অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রাখা। আর সে জন্য কারখানা চালু করার বিকল্প নেই। একজন কারখানামালিক আমাকে বললেন, তিনি ১৪ এপ্রিলই তাঁর কারখানার শ্রমিকদের মার্চের মজুরি সাড়ে ৪ কোটি টাকা পরিশোধ করেছেন। এ মাসে কারখানা বন্ধ। তিনি জানেন না আগামী মাসে কীভাবে মজুরি দেবেন। তাই গণমাধ্যমেরও উচিত হবে শ্রমিকদের পাশাপাশি মালিকদের সমস্যাটিও তুলে ধরা। উভয় পক্ষকে সমঝোতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। পুরো মজুরি পরিশোধ করে মালিক কারখানা বন্ধ করলেও তো শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

প্রথম আলো: লকডাউনের কারণে সবচেয়ে বিপদে পড়েছেন দরিদ্র মানুষ। তাঁরা বেকার হয়ে পড়েছেন। তাঁদের সহায়তায় সরকার যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে, তাকে কি যথেষ্ট মনে করেন?

আহসান এইচ মনসুর: গরিব মানুষের জন্য সরকার তেমন কিছু করেনি। ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ কিছুই নয়। ২০১৯ সালে দারিদ্র্যসীমার নিচের মানুষ ছিল ২০ শতাংশ। এই এক মাসে সেটি ৩০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এদের সংখ্যা ৫ কোটির কম হবে না। এই ৫ কোটি মানুষকে খাইয়ে বাঁচানোর ব্যবস্থা করতে হবে। ২০ লাখ টন চাল কিনে গরিবদের কাছে বিক্রি (১০ টাকা কেজি দরে) করলে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের লোকজন লাভবান হবেন। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের লোকজন লাভবান হবেন। পাকিস্তান প্রতিটি দরিদ্র পরিবারকে মাসে ১ হাজার ২০০ টাকা করে দিচ্ছে। আমাদেরও উচিত হবে খাদ্যের বদলে নগদ টাকা দেওয়া। এসএমএস করে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা বিকাশ নম্বরে পাঠাতে বলা হবে, সেই অ্যাকাউন্ট বা নম্বরে টাকা যাবে। এখানে দুর্নীতির সুযোগ কম। এতে সরকারের ২২–২৩ হাজার কোটি টাকা খরচ হবে। আর খাদ্যসহায়তা দিলে খাদ্য সংগ্রহ, তালিকা তৈরি, বিতরণ—তিন ধাপেই দুর্নীতি হবে। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক প্রতিটি পরিবারকে ৩ হাজার টাকা করে দিচ্ছে। সরকারের এ সহায়তা কর্মসূচিকে রাজনীতি ও দুর্নীতির ঊর্ধ্বে রাখতে হবে। সবার আগে মানুষকে খাইয়ে বাঁচাতে হবে।

প্রথম আলো: অর্থনীতির স্থবিরতা কাটাতে সরকার যেসব কর্মসূচি নিয়েছে, সে সম্পর্কে আপনার অভিমত?

আহসান এইচ মনসুর: অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকার যেসব কর্মসূচি নিয়েছে বা প্রণোদনা ঘোষণা করেছে, সেগুলো বাস্তবতার কাছাকাছি বলে মনে করি। তবে এখানে সমস্যা হলো আমলাতান্ত্রিক। সরকার একতরফাভাবে পরিপত্রগুলো জারি করেছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করেনি। ফলে ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে আপত্তি উঠেছে। প্রণোদনার ক্ষেত্রে বেশি শর্ত চাপিয়ে দিলে উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা আছে। সহায়তা গ্রহীতাবান্ধব হতে হবে। এসএমই বা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে সরকার ২০ হাজার কোটি টাকা দেওয়ার কথা বলেছে। কিন্তু এই খাত তো বিশাল। এর সঙ্গে বিপুলসংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান জড়িত। অতএব, প্রণোদনার অঙ্ক বাড়াতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রেও। এ খাতে

৩ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু আমি মনে করি, সরকার যদি অর্থনীতিকে চাঙা করতে চায়, তাহলে দুটোতেই বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

প্রথম আলো: আপনি বলেছিলেন, করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এখানে স্বাস্থ্যসেবাব্যবস্থার কোনো দুর্বলতা আছে বলে মনে করেন?

আহসান এইচ মনসুর: আমাদের স্বাস্থ্যসেবাব্যবস্থা যে খুবই নাজুক, করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে সেটি আবারও প্রমাণিত হলো। অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি, জনবল তিন ক্ষেত্রেই বেহাল পরিস্থিতি। আমরা কেন্দ্রীয়ভাবে অক্সিজেন সরবরাহ আছে, এ রকম একটি হাসপাতালও করতে পারিনি। সিলিন্ডার দিয়ে চালানো হচ্ছে। আমাদের দক্ষ চিকিৎসকেরও অভাব আছে। যেসব পরিবারের সদস্য করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁদের অভিজ্ঞতা ভয়ংকর। সরকার চীনের কাছে ১০০ চিকিৎসক ও ১০০ নার্স পাঠানোর অনুরোধ জানাতে পারত; যাঁরা এসে আমাদের চিকিৎসক ও নার্সদের প্রশিক্ষণ দিতেন। চীনের চিকিৎসক ও নার্সরা এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। বিদেশে আমরা দেখি চিকিৎসকেরা করোনা সংক্রমিত রোগীদের খুব কাছে যান। কিন্তু আমাদের এখানে চিকিৎসক ও নার্স রোগীর কাছে যেতেই ভয় পান। এ জন্য শুধু তাঁদের দায়ী করা যায় না। কারণ, স্বাস্থ্য বিভাগ চিকিৎসক ও নার্সদের সুরক্ষাও নিশ্চিত করতে পারেনি।

প্রথম আলো: আপনাকে ধন্যবাদ।

আহসান এইচ মনসুর: আপনাকেও ধন্যবাদ।

বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী
এপ্রিল ২৮, ২০২০

একের পর এক বন্ধ হচ্ছে পোশাক ক্রেতাপ্রতিষ্ঠান

তৈরি পোশাক খাতের যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ক্রেতা প্রতিষ্ঠান জেসি পেনি। লোকসানের ভারে দেউলিয়াত্বের পথে থাকা এ প্রতিষ্ঠানের বেশকিছু বিক্রয়কেন্দ্র বন্ধ হয়ে গেছে এরই মধ্যে। শুধু জেসি পেনি নয়, বিশ্বের বড় বড় অনেক ব্র্যান্ডও নাজুক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। দুই বছর ধরে একের এক বন্ধ হচ্ছে আউটলেট। সম্প্রতি কভিড-
১৯ বিপর্যয়ে অনেক ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎই যেখানে অনিশ্চিত, সেখানে ক্রেতা ধরে রাখতে করোনাভাইরাস সংক্রমণের এই পিক সময়ে বন্ধ কারখানা সচল হতে শুরু করেছে বাংলাদেশে।

পোশাক শিল্প মালিকদের প্রত্যাশা, শিগগিরই করোনাভাইরাস সংকট কেটে যাবে। তখন তাদের তৈরি পণ্যের চাহিদা আবার আগের জায়গায় ফিরে আসবে। যদিও বিশ্লেষকরা বলছেন, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ কমে এলেও বৈশ্বিক বাণিজ্য আগের অবস্থায় ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই। ব

রং করোনা-
পরবর্তী সময়ে বৈশ্বিক সরবরাহ চেইনে বড় পরিবর্তন আসতে পারে বলে মনে করছেন তারা।

পোশাক খাতের ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবসার পরিস্থিতি আগে থেকেই খারাপ ছিল। এর মধ্যেই নভেল করোনাভাইরাস নতুন বিপর্যয় নিয়ে আসে। সংক্রমণ ঠেকাতে একে একে লকডাউনে চ লে যায় এ খাতের রফতানি পণ্যের বড় গন্তব্য ইউরোপের দেশগুলো ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দীর্ঘ সম য় লকডাউনে থাকার পর এখন ধীরে ধীরে সচল হতে শুরু করেছে দেশগুলোর অর্থনীতি। কিন্তু আগে থেকেই নাজুক পরিস্থিতিতে থাকা ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানগুলো কভিড-১৯-
এর প্রভাব মোকাবেলা করে এক বছরও টিকে থাকতে পারবে কিনা, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দিহান বা জারবিশ্লেষকরা।

তাদের দাবি, করোনা-
পরবর্তী বৈশ্বিক সরবরাহ চেইন ধীরে ধীরে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরে যাবে। যেহেতু বৈশ্বিক লজিস্টিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে। এ অবস্থায় স্থানীয় উৎপাদন ব্যবস্থা উন্নয়নের পাশাপাশি প্রতি বেশী দেশগুলোতে উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আগ্রহী হতে পারে ক্রেতা দেশগুলো। এছাড়া প ণ্য উৎপাদনে সিউবোট, রোবটের মতো প্রযুক্তিগত উন্নয়নগুলোও আরো দ্রুতগতিতে এগিয়ে যা বে। সবদিক বিবেচনায় বাংলাদেশের রফতানিকারকরা যে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কভিড-১৯ এর প্রভাব মোকাবেলা করার কথা ভাবছেন তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। রফতানিকারকরা হয়তো ভা বছেন, সব আগের মতো ঠিক হয়ে যাবে, সরবরাহ চেইন ঠিক হয়ে যাবে আর বিপুল পরিমাণ পো শাক রফতানি করবেন রফতানিকারকরা। তারা হয়তো ভাবছেন, ভিয়েতনাম কারখানা খুলে দিয়ে ছে বা অন্য প্রতিযোগীরা খুলে দিলে তারা ক্রয়াদেশ ধরতে সমস্যায় পড়বেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো চাহিদা যতক্ষণ না পর্যন্ত ঠিক হবে ততক্ষণ এসব ভাবার যৌক্তিক প্রেক্ষাপট তৈরি হচ্ছে না। আর বৈশ্বিক সরবরাহ চেইনে যারা কাজ করছেন, তারা যদি গতানুগতিক ধারা থেকে সরে অন্যভাবে ভাবতে শুরু করেন তাহলে আগের কাঠামোতে অনেক কিছুই চলবে না।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউটের সিইও আলী আহমেদ বণিক বা র্তাকে বলেন, এখানে দুটো দিক, একটি হলো এটা ঠিক যে ক্রেতারা একের পর এক ব্যবসায় লো কসান গুনতে শুরু করেছিল। আমাদের এখানে কারখানাগুলো বন্ধ হয়েছে হঠা? করেই। কিন্তু নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য অর্থ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটা পর্যায়ে আইন-
শৃঙ্খলা পরিস্থিতিও নেতিবাচক হতে পারে। এটাও ঠিক যে সার্বিকভাবে দেখলে বৈসাদৃশ্য আছে। কিন্তু এটাও ঠিক অর্থনীতি সচল করতে একটা জায়গা থেকে শুরু তো করতেই হবে। পশ্চিমারা যেহেতু সচল হতে শুরু করেছে ফলে আমাদেরও ধীরে ধীরে সচল হতে হবে। আবার মহামারীর পরে কিন্তু দুর্ভিক্ষের আশঙ্কাও থেকে যাচ্ছে। তার পরও অর্থনীতির চাকা ঘোরানো শুরু করতে হ বে।

বিশেষজ্ঞরা এও জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র অনেক ক্ষেত্রেই নিজস্ব অবকাঠামো প্রস্তুত করছে। তারা সিউ-
বোটের ক্ষেত্রে বড় ধরনের বিনিয়োগ নিয়ে আসতে পারে। এমন উৎপাদন ব্যবস্থা তারা গড়ে তুল তে পারে, যাতে কোনো মানুষের ব্যবহার থাকবে না। পৃথিবীর ইতিহাস বলছে, বড় মহামারী কেটে যাওয়ার পর বড় ধরনের পরিবর্তনও আসতে শুরু করে। প্রযুক্তি থেকে শুরু করে সরবরাহ চেইন সবকিছুতে সেই পরিবর্তিত মানসিকতার প্রতিফলন দেখা যায়। স্প্যানিশ ফ্লু থেকে শুরু করে স ব বড় মহামারীর পরই নতুন নতুন বিষয় আবির্ভূত হয়েছিল।

কভিড-
১৯ প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়ার বেশ আগে ২০১৯ সালের অক্টোবরে পোশাক শিল্পের বৈশ্বিক ও স্থানীয় প্রেক্ষাপট নিয়ে সমীক্ষা করে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বহুজাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রাইসওয়াটারহাউ জকুপারস (পিডব্লিউসি)। ওই সমীক্ষায় বলা হয়, ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে দেউলিয়া হতে চেয়ে ছে ব্রাজিলের কিকো। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ব্র্যান্ডগুলোর মধ্যে ফেব্রুয়ারিতে বন-
টন, মার্চে সাউদার্ন গ্রোসার্স, এপ্রিলে নাইন ওয়েস্ট ওয়েস্ট, মে মাসে রকপোর্ট, আগস্টে বরুক স্টোন, অক্টোবরে সিয়ার্স ও নভেম্বরে ডেভিড'স ব্রাইডাল দেউলিয়া হতে চেয়ে আবেদন করে। আ র চলতি বছর দেউলিয়া হতে চাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বিউটি ব্র্যান্ডস, ফুল বিউটি ব্র্যান্ডস। সর্বশেষ যুক্তরাষ্ট্রে জেসি পেনি দেউলিয়া হতে চাইছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জা না গেছে।

এদিকে ম্যাকেঞ্জি অ্যান্ড কোম্পানির এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সাফল্য ধরে রাখতে বড় বাজারগু লোয় তৈরি পোশাক বিপণনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ারশোরিং ও অটোমেশনে বিনিয়োগ কর তে হবে। নিয়ারশোরিং হলো বাজারের নিকটবর্তী স্থানে পণ্য উৎপাদন। আর অটোমেশন হলো যান্ত্রিকীকরণ। প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছিল জরিপের ওপর ভিত্তি করে, যে জরিপে অংশ নি য়ে প্রশ্নের উত্তর দেন বড় কোম্পানিগুলোর শীর্ষ নির্বাহীরা।

তাদের মত অনুযায়ী, ২০২৫ সাল নাগাদ নিয়ারশোরিংয়ের দিকে ধাবিত হবে পোশাকের বৈশ্বিক সরবরাহ চেইন।

সরবরাহ চোইন নিয়ে বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি এমন হলেও বাংলাদেশের কারখানা মালিকরা পূর্ব প্রেক্ষা পট ভেবে নিয়ে কারখানা খুলতে শুরু করে দিয়েছেন। তাদের মূল লক্ষ্য ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ। য দিও অসমাপ্ত কাজ শেষ করা ও নতুন কাজ ধরার জন্যই স্বাস্থ্যবিধি মেনে কারখানা খুলছেন বলে দাবি করেছেন তারা।

ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপের (ইআরজি) নির্বাহী পরিচালক ড. সাজ্জাদ জহির বণিক বার্তাকে বলেন , অনেক ক্রেতা আগের ক্রয়াদেশ বাতিল-
স্থগিত করলেও এখন আবার সেগুলো নেবেন বলে সম্মতি দিয়েছেন, ফলে কারখানা সচল হওয়া

র একটা যৌক্তিকতা হয়তো আছে। তবে সংক্রমণ রোধে শ্রমিকের মৌলিক সুরক্ষা অবশ্যই নি শ্চিত করতে হবে। তা কারখানায় প্রবেশ থেকে শুরু করে অভ্যন্তরেও নিশ্চিত করতে হবে। কার খানাগুলোতে স্বাস্থ্য নজরদারিও নিশ্চিত করতে হবে, এক্ষেত্রে স্বচ্ছতাও রাখতে হবে। একটা বিষ য় উল্লেখ করা দরকার যে কারখানাগুলোয় স্বাস্থ্যগত সুরক্ষা করা এখন জনস্বাস্থ্য প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফলে সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজের সঙ্গে স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টির মিশ্রণ ঘটানোর ও প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি।

কারখানা খোলার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি মানার কথা বলা হলেও বাস্তব চিত্র ভিন্ন। এরই মধ্যে পোশাক কারখানার দুই-
একজন শ্রমিক করোনা আক্রান্ত হওয়ার তথ্য যেমন আছে, তেমনি একজন শ্রমিক করোনা আ ক্রান্ত হওয়ায় গতকাল থেকে ঘোড়াশালের ইউএমসি জুট মিল লকডাউন করার ঘটনাও ঘটেছে।

দুদিন ধরে পোশাক খাতের অনেক কারখানা সচল হয়েছে। কিন্তু মালিকদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অল্পসংখ্যক শ্রমিক দিয়ে ইউনিট চালু করার কথা থাকলেও একসঙ্গে অনেক শ্রমিক দিয়ে কার খানা চালুর তথ্য নিশ্চিত করেছে খোদ বিজিএমইএ, যার পরিপ্রেক্ষিতে সব সদস্যদের উদ্দেশ ক রে একটি সতর্কতামূলক নোটিসও দিয়েছে সংগঠনটি। সেখানে উল্লেখ করা হয়, একটি গ্রুপের কারখানায় একসঙ্গে চার হাজার শ্রমিক ডেকে আনার একপর্যায়ে স্বাস্থ্যনিরাপত্তা ইস্যুতে সেখানে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।

সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি নাজমা আক্তার বলেন, কিছু কারখানা লক ডাউনের মধ্যেও আংশিক সচল ছিল, সেগুলো এখন পূর্ণাঙ্গ সচল। অনেক বড় কারখানাও খোলা হয়েছে স্বাস্থ্যনিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত না করে। এ পরিবেশে শ্রমিকরা কীভাবে কাজ করছেন তা বিজিএমইএ নেতা, মালিক ও ক্রেতাদের কারখানায় উপস্থিত হয়ে দেখা উচিত।

শিল্প পুলিশের হিসাবে গতকাল সোমবার ছয় শিল্প এলাকায় সব খাত মিলিয়ে মোট ১ হাজার ৮২০ টি কারখানা সচল ছিল। এর মধ্যে ৯৪৭টি বস্ত্র ও পোশাক খাতের কারখানা, যার বিজিএমইএ সদ স্য ৭১৮টি, বিকেএমইএ সদস্য ১৫৭টি এবং ৭২টি বস্ত্র খাতের বিটিএমএ সদস্য কারখানা। সচল বস্ত্র ও পোশাক কারখানাগুলোর মধ্যে ৪৭৩টি খোলা হয় গত রোববার, সোমবার খুলেছে আরো ২ ৮৮টি।

প্রায় এক মাস বন্ধ থাকার পর ২৬ এপ্রিল থেকে খুলতে শুরু করেছে শ্রমঘন পোশাক শিল্পের কা রখানাগুলো। গ্রামফেরত শ্রমিকদের কাজে ফিরতে নিরুৎসাহিত করা হলেও গতকাল অনেক শ্র মিক কারখানায় যোগদানের উদ্দেশ্যে ঢাকার বাইরে থেকে শিল্প এলাকাগুলোতে এসেছেন। খোঁ জ নিয়ে জানা গেছে, বেশির ভাগ কারখানায় স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করা হচ্ছে না। আবার ধাপে ধা পে খোলার কথা থাকলেও একযোগে সব এলাকায়ই কারখানা খুলেছেন মালিকরা।

অথচ বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর পরিকল্পনা অনুযায়ী, কারখানা খোলার প্রথম ধাপে আজ ও আগামীকাল ঢাকা মহানগর এলাকার বিভিন্ন শিল্প-
কারখানা খোলার কথা। ২৮ থেকে ৩০ এপ্রিলের মধ্যে খুলবে আশুলিয়া, সাভার, ধামরাই ও মানিকগঞ্জ এলাকার বিভিন্ন শিল্প-
কারখানা। নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ ও কাঁচপুর এবং নরসিংদী এলাকার বিভিন্ন শিল্প-
কারখানা খোলার পরিকল্পনা ছিল ৩০ এপ্রিল। আগামী ২ ও ৩ মের মধ্যে গাজীপুর ও ময়মনসিংহ এলাকার শিল্প-
কারখানা খোলার কথা। এর বাইরে আজ থেকে নারায়ণগঞ্জ এলাকার নিটিং, ডায়িং কারখানাগুলো খুলে দেয়ার কথা জানিয়েছিল বিকেএমইএ। কিন্তু গত দুদিনে প্রায় সব এলাকায়ই কম-বেশি কারখানা খুলতে শুরু করেছে।

কর্মীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি থাকার পরও কারখানা কেন সচল হচ্ছে, সে বিষয়ে জানতে চাইলে একটি সমীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে জানিয়েছে বিজিএমইএ। সেই সমীক্ষায় মোট ৫৯৩ কারখানার কাছে সংগঠনটি জানতে চায় ২৬ মার্চ থেকে ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত কারখানার ক্রয়াদেশ সরবরাহ করার পূর্ব নির্ধারিত কোনো সময়সূচি ছিল কিনা। এ প্রশ্নের উত্তরে ৯৩ শতাংশ জানিয়েছে 'ছিল'। আবার মে মাসে কারখানা সচল করার মতো ক্রয়াদেশ আছে কিনা, এমন প্রশ্নের উত্তরে ৮৭ শতাংশ কারখানা বলেছে 'ক্রয়াদেশ আছে'। বাকি ১৩ শতাংশ বলেছে, মে মাসে কারখানা সচল করার মতো ক্রয়াদেশ নেই। ২৬ তারিখে কারখানা খুলতে চাইছেন কিনা, এমন প্রশ্নের উত্তরে ৬৫ শতাংশ কারখানা খোলার আগ্রহ জানিয়েছেন।

এদিকে গতকাল এক ভিডিও বার্তায় বিকেএমইএ প্রথম সহসভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, জীবন-
জীবিকার সন্ধানে আমাদের সচল হতে হবে। এলাকাভিত্তিক কারখানা খোলার তথ্য জানিয়ে স্বাস্থ্যবিধির বিষয়গুলো যতটুকু সম্ভব আমরা গ্রহণ করেছি বলেও ভিডিও বার্তায় দাবি করেন তিনি।

বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

এপ্রিল ২৮, ২০২০

১১ রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ভিডিও কনফারেন্স

প্রবাসী শ্রমিকদের বেতন-ভাতার বিষয়ে কূটনৈতিক তৎপরতা চালাবে বাংলাদেশ

মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থানরত প্রবাসী শ্রমিকদের ন্যায্য বেতন ও ভাতার বিষয়ে কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রাখবে বাংলাদেশ। গতকাল মধ্যপ্রাচ্যের ১১ রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে এ নির্দেশনা দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। পররাষ্ট্র

মন্ত্রণালয় থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, নভেল করোনাভাইরাসের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দুর্দশাগ্রস্ত প্রবাসীদের জন্য খাদ্য সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি প্রবাসী শ্রমিকরা যেন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আগের চাকরিতে পুনর্বহাল হতে পারেন, সেজন্য সব ধরনের কূটনৈতিক তৎপরতা গ্রহণের নির্দেশনা দিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। তিনি গতকাল মধ্যপ্রাচ্যের ১১ রাষ্ট্রদূত ও মিশনপ্রধানের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের সময় এ নির্দেশনা দেন।

সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, জর্ডান, লেবানন, ইরাক, ইরান, লিবিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন ও ওমানের রাষ্ট্রদূত ও মিশনপ্রধানরা এ কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রবাসী শ্রমিকদের কেউ যদি ফেরত আসেন, তবে যেন তারা ন্যায্য বেতন ও ভাতা পেতে পারেন সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রাখতে বলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

এ সময় তিনি বলেন, আমরা প্রবাসীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেবা দেব। এ সময় প্রবাসী বাংলাদেশীদের দুর্দশাগ্রস্ত প্রবাসীদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান তিনি। একই সঙ্গে সব প্রবাসীকে করোনা প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানান।

ভিডিও কনফারেন্সে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহিরয়ার আলম ও পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন উপস্থিত ছিলেন। এ সময় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশের সব বৈদেশিক মিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সতর্কতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

২৯ এপ্রিল, ২০২০

জনশক্তি রপ্তানিতে অচলাবস্থা

গভীর সংকটের আলামত

দেশজুড়ে লকডাউন ও দুনিয়াজুড়ে বিমান যোগাযোগ প্রায় বন্ধ থাকায় দেড় লাখ প্রবাসী আটকা পড়েছেন। দীর্ঘ চেষ্টার পর ভিসা এবং কাজ পেয়েও হাজার হাজার কর্মীর পক্ষে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এমনিতেই করোনাভাইরাস সংক্রমণের ভয়ে ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে কয়েক লাখ প্রবাসী দেশে ফিরেছেন। ফলে প্রবাসী আয়ের ক্ষেত্রে এ বছর বড় ধরনের ধকলের সম্মুখীন হবে বাংলাদেশ। দেড় লাখ প্রবাসী দেশে আটকা পড়ায় ক্ষতির মাত্রা

আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ প্রতিদিনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিদেশিদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করায় মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি রপ্তানি বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে ভিসা প্রস্তুত হওয়ার পরও প্রায় দেড় লাখ কর্মীর বিদেশে যাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এই সময়ে যারা দেশে ফিরেছেন তাদের যাওয়াও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার কারণে। তবে করোনাভাইরাসের এই সংকটকালে যাদের ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে তাদের মেয়াদ বাড়াতে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন পক্ষ থেকে। জনশক্তি রপ্তানিকারকদের সংগঠন বায়রার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, দেড় লাখ শ্রমিকের বিদেশ যাওয়া আটকে গেছে। প্রথমত, যাদের সমস্ত কার্যক্রম অর্থাৎ স্মার্টকার্ড, ইমিগ্রেশন, মেডিকেল সম্পন্ন হয়েছে তারা ফ্লাইট বন্ধ হওয়ার কারণে যেতে পারছেন না। দ্বিতীয়ত, যাদের ভিসা সম্পন্ন হলেই যেতে পারবেন এমন অনেকে আটকা পড়েছেন। যেসব শ্রমিকের চাহিদা ইস্যু করা হয়েছে সেগুলোর প্রস্তুত থেমে আছে। করোনাভাইরাসের প্রভাব দীর্ঘমেয়াদি হলে জনশক্তি রপ্তানি খাত সচল রাখা সম্ভব হবে কিনা সে সম্পর্কে তারা সংশয় প্রকাশ করেছেন। করোনাভাইরাসে তেলের দামে ধস নামায় মধ্যপ্রাচ্যে বিদেশি শ্রমিকদের চাহিদা হ্রাস পেতে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। এর ফলে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম বৃহৎ খাত জনশক্তি রপ্তানি প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে যেতে পারে। বিশেষত বিদেশে কর্মরতদের ২০ শতাংশও যদি দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হয়, তবে অর্থনীতিতে বিসংবাদ সৃষ্টি করবে; যা মোকাবিলায় এখন থেকেই সতর্ক থাকতে হবে।

বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

এপ্রিল ৩০, ২০২০

২০০০ চিকিৎসক ৫০০০ নার্স নিয়োগ চূড়ান্ত করে পিএসসির বিজ্ঞপ্তি

করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাব পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রীয় জরুরি প্রয়োজনে জনপ্রশাসনের চাহিদা অনুযায়ী দুই হাজার চিকিৎসক নিয়োগের চূড়ান্ত তালিকা দিয়ে আজ বৃহস্পতিবার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)।

করোনাভাইরাসে সংক্রমণের চিকিৎসার গতি বাড়াতে ৩৯তম বিশেষ বিসিএস থেকে এই চিকিৎসক নিয়োগ দেয়া হলো। পাশাপাশি ২০১৮ সালের নার্স নিয়োগ পরীক্ষার অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ৫ হাজার ৫৪ জন নার্স নিয়োগ দিয়েও তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

চিকিৎসকদের সংগঠন বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ) ৩৯তম বিশেষ বিসিএস থেকে নতুন চিকিৎসক নেয়ার পক্ষে মত দিয়ে সংশ্লিষ্ট দফতরগুলোতে চিঠি দিয়েছিল। এর আগে নন-ক্যাডার

মেডিকেল অফিসার ও সহকারী রেজিস্ট্রারের যে ৫৬৪টি নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছিল সেটিও আজ বাতিল করা হয়েছে।

করোনা সংক্রমণের চিকিৎসায় চিকিৎসক সংকটের কারণে আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা দিতে হিমশিম খাচ্ছে স্বাস্থ্য বিভাগ। এ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য নতুন দুই হাজার চিকিৎসক নিয়োগের কথা জানিয়েছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক। স্বাস্থ্যমন্ত্রী সে সময় বলেছিলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে নতুন দুই হাজার চিকিৎসক এবং ছয় হাজার নার্স আমরা নিয়োগের ব্যবস্থা করছি। আশা করি, এই নিয়োগের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা আরও জোরদার হবে।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

৩০ এপ্রিল, ২০২০

চরম দুর্দিনে ৭০ লাখ পরিবহন শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের টাকা কোথায়

বছরে আদায় হওয়া ২ হাজার কোটি টাকা লুটপাট, ভয়াবহ দুর্দিনে পাশে নেই শাজাহান খান, মসিউর রহমান রাঙ্গা, শিমুল বিশ্বাস, ওসমান আলীরা, শ্রমিকরা জনপ্রতি ১০ হাজার টাকা সহায়তা চাইলেও আইনি সুযোগ নেই বলছে শ্রম মন্ত্রণালয়

করোনাভাইরাস সংক্রমণে অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটছে সারা দেশের প্রায় ৭০ লাখ পরিবহন শ্রমিকের জীবন। অথচ এসব শ্রমিকের কাছ থেকে কল্যাণ তহবিলের নামে প্রতিদিন ৭০ টাকা করে চাঁদা আদায় করেছে মালিক সমিতি। সেই তহবিলে বছরে জমা হওয়া প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে। জানা গেছে, এই টাকার কোনো হিসাব নেই। বেপরোয়া চাঁদাবাজিতে জর্জরিত পরিবহন খাতের মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের নেতারা। তারা পরিবহন খাতের চাঁদাবাজিতে মিলেমিশে একাকার। ফলে শ্রমিকদের ভয়াবহ দুর্দিনেও পাশে নেই শাজাহান খান, মসিউর রহমান রাঙ্গা, শিমুল বিশ্বাস, ওসমান আলীর মতো পরিবহন খাতের নেতারা। জানা গেছে, সব মিলিয়ে সারা দেশের ৮ লাখের বেশি বাণিজ্যিক যানবাহন থেকে দৈনিক ৭০ টাকা হারে চাঁদা আদায় হয় মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের নামে। এ হিসাবে বছরে ২ হাজার কোটি টাকার বেশি চাঁদা আদায় হয়। এর বাইরে অঘোষিত বেনামিও অনেক চাঁদা আদায় হয়। এই রহস্যময় চাঁদার হিসাবও অজানা। ফলে করোনাভাইরাস পরিস্থিতির কারণে বেকার হয়ে যাওয়া শ্রমিকদের এখন ত্রাহি অবস্থা। শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের নামে প্রতিবছর হাজার হাজার কোটি টাকা চাঁদা আদায় হলেও করোনাভাইরাসের এই চরম দুর্দিনে শ্রমিকদের পাশে নেই নেতা নামধারীরা। জানা গেছে, যে ৭০ টাকা চাঁদা আদায় হয়, তা ভাগাভাগি করে নেন মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের নেতারা। এর মধ্যে ৪০ টাকা নেয় মালিক সমিতি আর ৩০ টাকা নেয় শ্রমিক ইউনিয়ন। মালিক সমিতিগুলো বহু ভাগে বিভক্ত হলেও মূল সংগঠনের কান্ডারি জাতীয় পার্টির মহাসচিব মসিউর রহমান রাঙ্গা, আওয়ামী লীগের নেতা ও ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইর পরিচালক খোন্দকার এনায়েত উল্যাহ। আর শ্রমিক সংগঠনগুলোর একক কর্তৃত্বে রয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য এবং সাবেক নৌপরিবহন মন্ত্রী শাজাহান খান। তার সঙ্গী বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বিশেষ সহকারী শিমুল বিশ্বাস

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক। ওই চাঁদার বাইরেও ঢাকাসহ বড় শহরগুলোতে গেটপাস (জিপি) নামে বিপুল অঙ্কের চাঁদা তোলা হয়। এ ছাড়া দূরপাল্লার সড়কপথে কেউ বাস নামাতে চাইলে মোটা অঙ্কের চাঁদা আদায় করে বিভিন্ন জেলা মালিক-শ্রমিক সমিতি।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির মহাসচিব মোজাম্মেল হক চৌধুরী অভিযোগ করে বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, কল্যাণ তহবিলের নামে চাঁদা তুলে সেই টাকা আত্মসাৎ করেছেন মালিক ও শ্রমিক নেতারা। এই অপকর্ম করেও শ্রমিকদের দুরবস্থায় পাশে নেই কেউ। এর পরও কিন্তু শ্রমিকরা গাড়ি পাহারা দিচ্ছেন। অথচ নেতারা পরিবহন খাতে ভয়াবহ লুটপাট করেছেন। এখন শ্রমিকরা মানবেতর জীবনযাপন করছেন। অনেক পরিবহন মালিকের হাজারো গাড়ি আছে। তারা অঢেল সম্পদের মালিক হলেও শ্রমিকদের জন্য কিছুই করছেন না। তারা সব সরকারের আমলেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশীদার। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আবদুল ওয়াদুদ নয়ন অভিযোগ তুলে বলেন, 'শ্রমিকরা এখন সবচেয়ে বেশি বেকায়দায় আছেন। এক জায়গার শ্রমিক এখন আরেক জায়গায় গাড়ি নিয়ে গিয়ে আটকা পড়েছেন। তাদের কেউ ত্রাণও দেয় না। এখন পর্যন্ত শ্রমিকদের সরকার সরাসরি কোনো ত্রাণ দেয়নি। দু-এক জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে আমাদের অনুরোধে দেওয়া হয়েছে। আর মালিক সমিতি ৭০ টাকা করে কল্যাণ তহবিলের নামে যে চাঁদা আদায় করত, তাও নিজেরাই লুটপাট করেছে।' বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের (টিইউসি) সাধারণ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান বলেন, 'পরিবহনসহ সব খাতের শ্রমিকদের অবস্থা খুবই দুঃখজনক। আগে রাস্তায় ভিক্ষুক ছিল না, কিন্তু করোনাভাইরাসের এই চরম দুর্দিনে বাড়ি বাড়ির সামনে ভিক্ষুকের আহাজারি। শ্রমিকরা এখন খুবই অসহায়। তাদের জন্য শ্রম মন্ত্রণালয়ের শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিল থেকে জনপ্রতি ১০ হাজার টাকা দেওয়ার প্রস্তাব করেছি।' তবে শ্রম মন্ত্রণালয়ের শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিলও করোনাভাইরাসের সংক্রমণে চরম অভাব-অনটনে থাকা পরিবহন শ্রমিকদের কাজে আসছে না। আইন অনুযায়ী, সারা দেশে সক্রিয় ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানে উৎপাদন কর্মকান্ডের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফার ৫ শতাংশ শ্রমিক কল্যাণে খরচ করতে হবে। আর লভ্যাংশের একটি নির্দিষ্ট অংশ সরকারের বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিলে জমা দিতে হবে। এ প্রক্রিয়ায় তহবিলে এখন ৪০০ কোটি টাকার বেশি জমা রয়েছে। আইনি বিধিবিধান না থাকায় করোনাভাইরাসের সময় শ্রমিকদের কল্যাণে ওই অর্থ খরচের সুযোগ নেই বলে জানিয়েছে শ্রম মন্ত্রণালয়। এ প্রসঙ্গে শ্রম মন্ত্রণালয়ের শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব ড. মো. রেজাউল করিম বলেন, করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে অনুদান দেওয়ার আইনি বিধিবিধান নেই। এই তহবিল থেকে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি দিক বিবেচনা করে শ্রমিকদের অর্থ প্রদান করা হয়। তবে চিকিৎসার জন্য কোনো শ্রমিক আবেদন করলে টাকা দেওয়া হবে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশে নিবন্ধিত যানবাহন আছে প্রায় ৪৪ লাখ। এসব পরিবহনের সঙ্গে প্রায় ৭০ লাখ শ্রমিক যুক্ত আছেন বলে

জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। ২৬ মার্চ থেকে সারা দেশে পরিবহন চলাচল বন্ধ। তবে কিছু পরিবহন চলাচল করছে। এর মধ্যে রয়েছে পণ্যবাহী যান, অল্পসংখ্যক ব্যক্তিগত গাড়ি ও মোটরসাইকেল। পরিবহন মালিক সমিতিগুলো বলছে, নজিরবিহীন এই পরিবহন সংকটে দৈনিক ক্ষতি হচ্ছে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা। সড়ক পরিবহন আইন অনুসারে, পরিবহন শ্রমিকদের নিয়োগপত্র দেওয়া বাধ্যতামূলক। আর তাদের বেতনও হওয়ার কথা মাসিক। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। বাস-ট্রাকের চালকদের প্রায় সবাই দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে চলেন। অল্প কিছু বড় কোম্পানি বাসচালকদের মাসিক বেতন দেয়। তবে তাদের মূল আয় হয় ট্রিপের (যাত্রা) ওপর। অন্য বাণিজ্যিক যানের শ্রমিকদেরও একই চিত্র।

জানা গেছে, দেশে পণ্য পরিবহনের যানবাহন আছে প্রায় সাড়ে ৩ লাখ। এর মধ্যে আছে ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান, ট্রেইলর, পিকআপ ভ্যান। আবার রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে যাত্রী পরিবহনের বাস-মিনিবাস আছে ৮০ হাজারের বেশি। পণ্যবাহী পরিবহনগুলোতে চালকসহ কমপক্ষে দুজন করে কর্মী থাকেন। আর যাত্রীবাহী যানে চালক, সহকারী ও ভাড়া আদায়ের জন্য তিনজন করে কর্মী কাজ করেন। এর বাইরে টিকিট বিক্রির কাউন্টারগুলোর কর্মী আছেন। দেশে ব্যক্তিগত গাড়ি ও মাইক্রোবাস আছে প্রায় সাড়ে ৫ লাখ। এর একটা অংশ সরকারি বিভিন্ন কার্যালয়ের। বাকিগুলো ব্যক্তিগত কাজের। কিছু আছে ভাড়ায় চালিত। ব্যক্তিগত গাড়ির চালকদের অনেকেই ছুটি দিয়েছেন। তারা চলতি মাসের বেতন পাবেন কিনা, সেটিও বড় উদ্বেগের বিষয়। অনেক ব্যক্তিগত গাড়ির মালিকরা চালক ছাঁটাই করছেন।